# ইতিহাসের পাতা থেকে

## প্রথম খণ্ড

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চেয়ার অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০০

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

লেজার কম্পোজ
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন
কলকাতা-৭

প্রকাশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

ড. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

*"তোমায় কিছু দেবো বলে চায় যে আমার মন,*
*নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন"*

# ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্র ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একাধিক ব্যক্তির হাত ধরে ভারতীয় জাতীয়তার সূচনাপর্ব থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ সরকারের নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ—এই আশি বছর সময়কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া অনেক কাহিনি ও সেসব কাহিনির বীর সেনানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নেতা-নেত্রীর টুকরো-টুকরো ছবি আঁকা হয়েছে 'ইতিহাসের পাতা থেকে' গ্রন্থটিতে। গ্রন্থকার অধ্যাপক আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় এ বছর তাঁর কর্মময় জীবনের আশি বছর পূর্ণ করেছেন। তাঁর জন্ম ২রা ডিসেম্বর ১৯২৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে 'আধুনিক ইতিহাস' বিষয়ে যথাসময়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রথম দু'এক বছর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কাটিয়ে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন এবং সেখান থেকেই যথাসময়ে অবসর নেন। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার সময় তিনি হয়ে ওঠেন সব অর্থেই একজন "জনপ্রিয়" অধ্যাপক। অধ্যক্ষের কাছে হয়ে ওঠেন অপরিহার্য সহকর্মী, আর ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় শিক্ষক। তাঁর উৎসাহ শুধু লেখাপড়ায় সীমিত থাকেনি। বিতর্কসভায় অংশ গ্রহণ, জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশগ্রহণ, এবং খেলাধুলার বিষয়ে আগ্রহ তাঁর বরাবর। আকাশবাণীতে ফুটবল খেলার ধারাবিবরণীও দিয়েছেন কয়েক বছর। তাঁর প্রথম প্রকাশনা "স্বাধীনতার রূপকার নেতাজি সুভাষ" গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় তাঁর জনস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর তথ্যনিষ্ঠা ও লেখার প্রসাদগুণ প্রশংসিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থ 'ইতিহাসের পাতা থেকে' একটু অন্য ধরনের ইতিহাসচর্চা। সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চার দুটি নতুন দিক দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, ইতিহাস গবেষণা শুধুমাত্র লেখ্যাগারে পাওয়া দলিল-দস্তাবেজভিত্তিক হবে না। মৌখিক সূত্র থেকেও ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা উচিত। এর নাম "ওর‍্যাল হিস্ট্রি"। দ্বিতীয়ত, অন্য একদল ইতিহাসবিদ্‌দের বক্তব্য ইতিহাস লেখার শৈলী সম্পর্কে। তাঁরা মনে করেন সুপাঠ্য গল্পের ভাষায় ইতিহাস লেখা উচিত, যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে ইতিহাস বোঝা সহজ হতে পারে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাতেই ইতিহাস লিখতে হবে এমন কোন কথা নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার এই দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের পাতা থেকে' গ্রন্থটিতে।

এই গ্রন্থের বিষয় বৈচিত্র্য এবং বর্ণনাভঙ্গি যে-কোন সহৃদয় পাঠকের প্রশংসা অর্জন করবে। গ্রন্থকার কর্মজীবনে পেশায় ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁর বাংলা ভাষার প্রকাশ ভঙ্গি, কল্পনা শক্তি ও কলমের জোর দেখে মনে হয় তিনি যেন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তাঁরা জানেন তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা। সুযোগ মতো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কোন কবিতার অংশ বিশেষ এই পরিণত বয়সেও অনায়াসেই তিনি বলে যেতে পারেন। স্মৃতি শক্তি তার আশি বছর বয়সেও খুব বেশি কমে যায়নি। নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুমধুর করার কাজে স্মৃতিশক্তি যে খুবই ফলপ্রসূ হয় তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে।

দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকলে যথেষ্ট শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও এমন তথ্যনিষ্ঠ শ্রদ্ধার ডালি সাজানো সহজসাধ্য হয় না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই তো সবকথা নয়। উদারনৈতিক রাজনীতি এবং সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতির গুরুত্বও একইসঙ্গে স্বীকার্য। দ্বিচক্রযান সাইকেল চালানোর কাজে সামনের চাকা ও পেছনের চাকা সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এই মৌলিক সত্যবোধ থেকেই গ্রন্থকার তাঁর অনন্য ভাষায় ইতিহাসচর্চায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রাসবিহারী বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, নজরুল ইসলাম, সন্তোষ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ দাশ, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও নৌ-বিদ্রোহের অখ্যাত সেনানিদের প্রতি। একজন ব্যক্তি অথবা একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও কিছু লোকজনের কথা তিনি তাঁর আলোচনায় এনেছেন যাঁদের কথা ইতিহাসের মামুলি গ্রন্থে স্থান পায়নি অথচ তাঁদের নিঃস্বার্থ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মূল্যবান এবং সে কারণে ইতিহাসের পাতায় এক কোণে তাঁদের স্থান দেওয়া উচিত।

পড়তে পড়তে বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেমে যেতে হয়, কারণ চোখের জলে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যায়। বিষয়বস্তু ও বর্ণনাশৈলী দুই-ই এজন্য দায়ী। তখন মনে হয়েছে এই ধরনের গ্রন্থ কাদের জন্য তিনি লিখেছেন? পণ্ডিত মানুষদের জন্য অথবা ছোটদের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর—তিনি লিখেছেন সবার জন্যই। যাঁরা অনেক কিছু পড়েছেন এবং জানেন তাঁরাও হঠাৎ হঠাৎ দু'একটি তথ্য পাবেন যা তাঁরা আগে জানতেন না। আর বিশেষ করে উপকৃত হবেন তরুণ-

তরুণী এবং কিশোর-কিশোরীর দল, যাঁদের মধ্যে ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে নেই কিন্তু নিজের দেশের সাম্প্রতিক অতীতকে জানার ইচ্ছে আছে। গ্রন্থটির পাতায় পাতায় জানা-অজানা নানান তথ্য সুচারুভাবে সাজিয়ে গ্রন্থকার এঁদের সবাইকে বিনম্র সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার স্মৃতিচাবণে এবং ইতিহাসের বিশ্লেষণে অংশ নেওয়ার জন্য। তাঁর আমন্ত্রণ আমরা সবাই সানন্দে গ্রহণ করলে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু অমূল্য তথ্য এবং কিছু এযাবৎ অজানা বিষয় জানতে পারবো, এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থকারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। যে কেউ গ্রন্থটি পরে যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ পাবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

# নিবেদন

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যই কোনো একজন ব্যক্তির চেষ্টায় আসেনি। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সহিংস ও অহিংস দু'রকম পথেই হেঁটেছিলেন। প্রথমদিকে রক্ষণশীল উদারনীতিক রাজনীতি এবং অন্তিমলগ্নে বামপন্থী সমাজবাদী রাজনীতি একই সঙ্গে কাজ করেছিল। এটাই সকল মুক্তমনের মানুষের এমনকি আধুনিক ঐতিহাসিকদেরও অভিমত। কিন্তু তবুও সশস্ত্র বিপ্লবীদের মৃত্যুভয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করে ফেলাটাই সেই সময়ের তো বটেই পরবর্তী প্রজন্মের দেশবাসীদেরও অভিভূত ও সম্মোহিত করে দিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছে শুনেই উল্লাসকর দত্ত গেয়ে উঠেছিলেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,<br>সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।"

মামলার রায় ঘোষণা করার পর বিচারক ক্ষুদিরামকে জিগ্যেস করেছিলেন তাঁর কি ভয় করছে? জবাব দিতে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, 'আমাব আবার ভয় করবে কেন? আমি যে গীতা পড়েছি।'

রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযানে রওনা হবার জন্য ট্যাক্সি ডেকে এনে নিকুঞ্জ সেন তো অবাক! দীনেশ একমনে বিশ্বকবির কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে আর তন্ময় হয়ে বাদল তা শুনছে। নিকুঞ্জবাবুর সাড়া পেয়ে হুঁশ হয় দুজনেরই। দীনেশ তখন বলে ওঠে—'Get up বাদল'। এবার তো যেতে হবে ভাই—"এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হলো শেষ।"

দীনেশ, কানাইলাল প্রভৃতি বেশ কয়েকজন Condemned Cell-এ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা অবস্থাতেই নিজেদের শরীরের ওজন বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি, এটাই ইতিহাস। এইভাবে তাঁরা বার বার প্রমাণ দিয়ে গেছেন—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাফল্য ইংরেজ শাসকদের মনে ভীতি বা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। বিশেষত এপ্রিল মাসটিকে তাঁরা শাসক শ্রেণীর চরম বিপদের মাস হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। কেননা, ইংরেজ শাসকদের পক্ষে অভিশপ্ত এই এপ্রিল মাসেই ঘটেছিল ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপ (৩০/৪/১৯০৮), চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ (১৮/৪/১৯৩০) এবং মেদিনীপুরের দুই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—জেমস পেডি (৭/৪/১৯৩১) ও আর. কে. ডগলাসের (৩০/৪/১৯৩২) পর

পর দু-বছর খুন হওয়া। তাই ভীত ও শঙ্কিত ইংরেজ মায়েরা তাঁদের সন্তানদের শান্ত করতেন বা ঘুম পাড়াতে গাইতেন—"Baby! sleep on, as another April has come." এই আতঙ্কই আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় এবং তা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রাম ও তিন আজাদি সেনানায়কদের লালকেল্লায় বিচার উপলক্ষে। অবশেষে নৌ-বিদ্রোহীদের হাতে পর্যুদস্ত হবার ঠিক পরের দিনই ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখেই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন ঘোষণা করেন যে, আগামী একমাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্য নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হবে। ওই ক্যাবিনেট মিশন ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে এগিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ্যাটলি সাহেব তাঁর কথা রেখেছিলেন। ২৩শে মার্চ ১৯৪৬ তারিখেই মিশনের সদস্যরা ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন।

এবার অন্য কথা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ বিশদ ইতিহাস না থাকায় প্রথমদিকে তো বুঝতেই পারছিলাম না কীভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনার ছবিটা বর্তমান প্রজন্মের ভারতীয়দের চোখের সামনে তুলে ধরব। শেষে বুঝলাম, অগ্নিযুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অসাধারণ কর্মকাণ্ড ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের ছবিটা যদি তুলে ধরতে পারি নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তবে তা আজকের প্রজন্মের ভারতীয়দের মন অবশ্যই স্পর্শ করবে। তাই ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিলাম কয়েকজন সেরা দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের কথা এবং আটটি আন্দোলনের কাহিনি। আর সেইজন্যই তো বইটির নামকরণ করলাম 'ইতিহাসের পাতা থেকে'। বইটির মাধ্যমে যেসব মণি-মুক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হল আশাকরি তা ব্যর্থ হবে না। আজকের প্রজন্মের দেশবাসীরা অবশ্যই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত বোধ করবেন।

প্রথমেই ঋণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন সুভাষচন্দ্র বসু চেয়ার অধ্যাপক ড. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়কে। আমার দুটি বই প্রকাশনার ক্ষেত্রেই তিনি যেভাবে সাহায্য করেছেন তার কোন তুলনাই হয় না। প্রথমবারের মতো এবারও তিনি ভূমিকায় আলোচ্য বইটি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত লিখে দিয়েছেন। আমি আমার এই দ্বিতীয় বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছি।

কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার অগ্রজপ্রতীম প্রবীণ সমাজসেবী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ নন্দীকে। বেশ কিছু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

কিন্তু একজন আমার পাশে না দাঁড়ালে বইটি শেষ করাই সম্ভব হত না। তিনি হলেন আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে পরম আত্মীয় শ্রীযুক্ত সমীর কুমার ঘোষ। আমাকে উৎসাহিত করা ছাড়াও পুরো বইটার প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছেন আর প্রয়োজন হলেই আমার লেখা কপি করে দিয়েছেন। এমনকি, প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজটাও তাঁর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এককথায় বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে Samir was a host in himself। এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে সাংবাদিক বন্ধু সন্তোষ মোদকের ঋণও আমি কোনদিনই অস্বীকার করতে পারব না।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়। তবুও উল্লেখ করতেই হবে যে, আমার বড়ো ভাগ্নে ইংল্যান্ড প্রবাসী শ্রীমান দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে যে সব বই কলকাতায় পাওয়া যায়নি সেইসব বই ইংল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করে আমায় পাঠিয়েছেন। সুতরাং অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমার এই গবেষণামূলক লেখাপড়ায় দেবব্রত-র ভূমিকা অসাধারণ।

বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছি আমার কন্যাসমা প্রিয় ছাত্রী শ্রীমতী দীপান্বিতা দাসের আন্তরিকতায়। কিছুটা শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও দীপা যেভাবে হাসিমুখে আমার চারটি লেখা কপি করে দিয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ঈশ্বর তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন এই প্রার্থনাই জানাই আমি করুণাময়ের পায়ে।

সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই মিত্রম্-এর শ্রী কে. মিত্রকে। কেননা 'স্বাধীনতার রূপকার নেতাজি সুভাষ' ও 'ইতিহাসের পাতা থেকে' বই-দুটি প্রকাশ করে তিনি অবশ্যই প্রমাণ দিলেন যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আদর্শের প্রতি তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, তা হল তাঁর নতুন লেখকদের সুযোগ দেওয়ার আগ্রহ। আমাকে তিনি প্রতিপদে যেভাবে সাহস জুগিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি অভিভূত। প্রশংসা করতেই হবে মিত্রম্-এর প্রতিটি কর্মীকে তাঁরা প্রত্যেকে আমার সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন।

অমর শহিদ যতীন দাশ আমাদের কলেজের (বঙ্গবাসী কলেজের) ছাত্র ছিলেন। সেজন্য আমরা গর্বিত। তাঁরা বাবা (বঙ্কিম বিহারী দাশ) ও ছোটো ভাইও (কিরণচন্দ্র দাশ) আমাদেরই ছাত্র ছিলেন। কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠানে যতীন দাশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়। তাই আমি (ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসেবে) কিরণচন্দ্র দাশের জীবদ্দশায় (১৯৬৪ সালে) তাঁর হাজরা রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দাদার সম্পর্কে, বিশেষত লাহোর সেন্ট্রাল জেলের শেষ ৫৩ দিনের কথা (২২/৭ থেকে ১৩/৯/২৯) জেনে এসেছিলাম। যতীন দাশের আবক্ষ মূর্তি

বসানো হয়েছে কলেজের ফটকে। আর প্রতি বছর ১৩ই সেপ্টেম্বর কলেজ বন্ধ থাকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে।

শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র সম্পর্কে জানতে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলাম সন্তোষ কুমাবের মেজো ভাগ্নে শ্রীযুক্ত রঞ্জন বসু ও ছোট ভাগ্নী শ্রীমতী কল্যাণী বসুর সঙ্গে তাঁদের ক্রিক রো-র বাড়িতে। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। উল্লাসকর দত্ত ও ভগৎ সিং সম্পর্কে কিছু বলতে না পারায় গভীর মর্মবেদনা বোধ করছি। যাঁদেরই সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলের উদ্দেশে বলতে চাই—"যে কেহ মোরে দিয়েছো সুখ, দিয়েছো তাঁরি পরিচয়, সবারে আমি নমি।" জয় হিন্দ। ইতি—

বিনয়াবনত
আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

# সূচি

এক

# ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৮ সালের তেসরা মার্চ-ভোরবেলা। তিন বন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসার জন্য 'সুলতান' নামের মেল স্টিমারে চাঁদপাল ঘাট থেকে ইংল্যান্ড রওনা হয়ে গেলেন। সেদিন তাঁদের তিনজনকে তুলে দিতে এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা এবং সেই সময়ের ধন্বন্তরীসদৃশ বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ করতেই হয় যে ওই তিনজন ছাত্রই পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত হলেও সুরেন্দ্রনাথই শুধু সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যখন কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

১১ এপ্রিল ১৮৬৮-তে তিনজনই ইংল্যান্ডে পৌঁছে উঠলেন গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডনের বাড়িতে। কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ ল্যাটিনের অধ্যাপক ইলির বাড়িতে চলে যান। সেখানেই শুরু হয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য নিরলস প্রস্তুতি। একই সঙ্গে আবার শুরু হয়ে যায় লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক হেনরি মরলোর কাছে ইংরেজি এবং ডাক্তার থিয়োডর গোল্ডস্টকের কাছে সংস্কৃতি শিক্ষাও শুরু হয়ে যায়।

১৮৬৯ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যথা সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩০। যার মধ্যে ভারতীয় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার। চার জনেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধালেন কমিশনাররা। তাঁদের মতে সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপাদ বাবাজির বয়স পরীক্ষা চলাকালীনই কুড়ি পার হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের দুজনের নাম তালিকায় রাখা গেল না। এই অন্যায়ের বিহিত করতে সুরেন্দ্রনাথ কালবিলম্ব না করে Queen's Bench-এ আপিল করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর প্রমুখেরা। সুরেন্দ্রনাথের কোষ্ঠী ও অন্যান্য কাগজপত্র খতিয়ে দেখে Queen's Bench-এর রুল জারি হল। যার ফলে কমিশনাররা সুরেন্দ্রনাথকে সিভিলিয়ানদের তালিকায় গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হলেন। আপিল না করেও চতুর্থ ভারতীয় প্রার্থী শ্রীপাদ বাবাজিও অনুমিত পেয়ে গেলেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের ব্যাপার হল এই যে, সুরেন্দ্রনাথের সাফল্যের কথাটা ওঁর বাবা ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জেনে যেতে পারলেন না। কারণ ঠিক আগের দিন তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে অমৃতলোকে চলে

যান মাত্র ৫১ বছর বয়সে। তারিখটা ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ সাল। তবে জয়ী হয়ে যেদিন সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফেরেন সেদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্রনাথের ছোটোভাই ব্যায়ামবিদ্ জিতেন্দ্রনাথ।

**বংশপরিচয় ঃ** ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর ৩৩ নং নিয়োগী পুকুর ওয়েস্ট লেনের বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও এক বোন। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, মেজো সুরেন্দ্রনাথ, সেজো উপেন্দ্রনাথ, চতুর্থ মহেন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম ও ছোটো জিতেন্দ্রনাথ। মায়ের নাম ছিল জগদম্বা দেবী। একমাত্র বোনের নাম ছিল শিবগৃহিণী দেবী। দেবেন্দ্রনাথের নাতনি প্রীতিলতা দেবী (চক্রবর্তী) আজও জীবিত আছেন।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীমণি বাগ্‌চি জানিয়েছেন যে, দুর্গাচরণ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর হেয়ার সাহেবের সুপারিশে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল দুর্গাচরণের। বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে ইংরেজি শেখাতেন।

পাঁচ বছর বয়সে সুরেন্দ্রনাথকে তালতলায় অবস্থিত এক পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। তারপর তাঁকে পটলডাঙ্গায় অবস্থিত বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে তাঁকে ডাভটন কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এটি একটি ইংরেজি স্কুল— পেরেন্টাল অ্যাকাডেমি। এই স্কুলে ভর্তি হয়ে সুরেন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেশ ভালোভাবে ইংরেজি ও ল্যাটিন শিখে ফেলেন এখানকার শিক্ষকদের শিক্ষা গুণে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এই স্কুল থেকেই তিনি ১৮৬৩ সালে পনেরো বছর বয়সে দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে এনট্রান্স (Entrance) পাস করেন। তারপর ১৮৬৮-তে ডাভটন কলেজ থেকেই বি. এ. পাস করেছিলেন।

## সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ ঃ অসাধারণ মনোবল ও মূল্যবোধের পরিচয়

মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিলেত যাবার আগেই সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথের এক জ্ঞাতি কাকা তাঁর মনিরামপুরের বাড়িতে ১৮৬৬ সালে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজো করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় ওই পূজানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তখন অন্য এক জ্ঞাতি শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে একটি বারো বছরের সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই মেয়েটি পিতৃহীনা। ওর বিধবা মায়ের পক্ষে কোনরকম পণ দেবার ক্ষমতা নেই। ওকে যদি বিবাহ করো তো এক বিধবাকে কন্যা দায় থেকে উদ্ধার করা হবে। সুরেন্দ্রনাথ কথাটা শোনা মাত্রই রাজি হয়ে যান এবং কথাবার্তা চালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু বিশেষভাবে বেঁকে বসেন তাঁর ঠাকুমা। তিনি শীঘ্রই একটি সুন্দরী পাত্রী পছন্দ করে ফেলেন যার বাবা সুরেন্দ্রনাথের বিলেতে থেকে পড়াশোনা করার খরচপত্র বহন করতেও রাজি ছিলেন। এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দেওয়া

হয় যে ঐ ধনী কন্যাকে বিবাহ না করলে তাঁকে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করলেন না। বলাবাহুল্য, দুর্গাচরণ পুত্রের এই রকম মানসিক দৃঢ়তা দেখে বরং খুশিই হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত মণিরামপুরের ঐ বিধবার কন্যা প্রয়াত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা চণ্ডীদাসী দেবীর সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

## কর্মস্থলে চক্রান্ত এবং শেষমেশ পদচ্যুতি

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীহট্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতা ও মর্যাদার সঙ্গে কাজ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত গড়ে ওঠে। চক্রান্ত গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ প্রথমত, নিজে সিভিলিয়ান হয়েও সুরেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ানদের ক্লাব, পার্টি বা খানা-পিনায় বড়ো একটা যোগ দিতেন না। দ্বিতীয়ত, অফিসিয়াল কাজকর্ম ছাড়া সুট, টাই ও প্যান্ট ইত্যাদি পরতেন না। বরং পরে থাকতেন প্রায় সব সময়ই—ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবি। তৃতীয়ত, তাঁর নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম ও স্পষ্টবাদিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভালো চোখে দেখতেন না। চতুর্থত, তাঁর ঠিক ওপরের সিভিলিয়ান অফিসারটি তাঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই যুধিষ্ঠির-ঘটনাটি ঐ ওপরওয়ালার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে সাসপেন্ড করেন এবং বিষয়টির তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে দেন। এবার বাস্তবে কী ঘটেছিল সেটাই দেখা যাক।

চক্রান্তটি ঘটানো হয়েছিল এইভাবে। যুধিষ্ঠির নামে এক ব্যক্তি নৌকো চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের অধীনে মামলাটি চলাকালীন সময়ে সে ফেরার না হওয়া সত্ত্বেও সে ফেরার হয়েছে লেখা একটা কাগজে চক্রান্তকারীরা সুরেন্দ্রনাথের অনবধানতার সুযোগে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়। বিষয়টি তাঁর ওপরওয়ালা সিভিলিয়ানটির নজরে এলে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সুরেন্দ্রনাথকে সাসপেন্ড করেন এবং বিষয়টির অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে দেন। কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানদের দ্বারা গঠিত ওই কমিশন বিচারের নামে প্রহসনের পর তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং মাত্র পঞ্চাশ টাকা অনুকম্পা-ভাতা মঞ্জুর করে সিভিল সার্ভিস থেকে অপসারিত করার সুপারিশ করেন। ঘটনাটির আকস্মিকতায় ভারতবাসী মাত্রই যেন শেলবিদ্ধ হয়ে যান। সুরেন্দ্রনাথ তখনই ইংল্যান্ডের আদালতের শরণাপন্ন হন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। যেহেতু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চাইছিলেন না যে সুরেন্দ্রনাথের মতো একজন নির্ভীক ও স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পুনঃপ্রবেশ করুন। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়বেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিভিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অজুহাতে তাঁকে সে সুযোগ দিতেও অস্বীকার করেন। শেষপর্যন্ত হতাশ ও দিশেহারা সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের জুন মাসে দেশে ফিরে আসেন। তবে ঐ চরম সংকটে তাঁকে রক্ষা করেন পিতৃবন্ধু ও দয়ার

সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানের বিদ্যাসাগর কলেজ) মাসিক দুশো টাকা বেতনে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিয়োগ করে। ঐ সময় থেকেই শুরু হয় সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃত কর্মজীবন ও দেশসেবা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত প্রথমে ১৮৭৫ সালে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা শুরু করলেও বছর তিনেকের মধ্যেই প্রিয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত ১৮৮৪-তে নিজেই রিপন কলেজ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৯১৩ সালে দিল্লির কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়ে দিল্লি চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছর কাল অত্যন্ত মর্যাদা ও সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতার কাজ করে গেছেন তিনি। অধ্যাপনা করার সময় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ওই সময়ের ছাত্র ও যুব-সমাজকে গভীর-ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐ সময় তিনি বেশ কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন।

## প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসভা

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের প্রিয়তম বন্ধু ও ভারতের প্রথম র‍্যাঙ্গলার ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার ছাত্র-সমাজকে একত্র করে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছাত্রসভা (Students Association) গড়ে তোলেন। ঐ সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাত্রসভায় ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। অধ্যাপনা শুরু করার পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই ওই ছাত্রসভায় ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। তাঁর 'শিখ শক্তির অভ্যুদয়', 'ম্যাৎসিনি ও গ্যারবল্ডির জীবনকাহিনী' এবং 'নব্য ইটালি' শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি যুব-সমাজের মনে দেশপ্রেমের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল। স্বদেশের অতীত সভ্যতা ও গৌরবের ছবিও যেন তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। এছাড়াও বিদেশের এবং বিশেষ করে ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি ভারতীয় ছাত্র ও যুব-সমাজের মনে অপূর্ব এক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন—"ওই সময় ইতালির কার্বোনারির আদর্শে বাংলায় একাধিক গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠেছিল। ওইসব গুপ্ত-সমিতিগুলির একটির কথা অন্য সমিতির পক্ষে জানা ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র ও যুবকদের মনে এমনি শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলেন যে ওই রকম পরস্পরবিচ্ছিন্ন একাধিক সমিতি নিজেদের অজান্তে তাঁকেই সভাপতি পদে বরণ করে নিয়েছিল।" এখানে মনে রাখা উচিত যে কার্বোনারির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ঐসব গুপ্ত-সমিতির সদস্যদের বুক-চেরা রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করতে হত।

## ভারত সভা, বেঙ্গলী পত্রিকা ও কারাদণ্ড

ঐ সময় দেশের জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত

হয়। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের Indian League সে প্রয়োজন মেটাতে পারেনি। তাই কলকাতার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির সক্রিয় সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই Indian Association বা ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারত সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে প্রাথমিক আলোচনা সভা আহূত হয়েছিল সেই সভা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে হারান। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি খবর পান যে বাগ্মী রেভা. কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় ভারত সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে সেই মুহূর্তেই তিনি সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন, বক্তৃতা করেন, ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনন্দমোহন বসুই প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি থেকেই প্রমাণ হয় সুরেন্দ্রনাথ এমনি কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন যে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃত্যুও তাঁকে সেদিন সভায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের মাধ্যমে চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ঐ সার্ভিসে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সিভিল সার্ভিসের ঊর্ধ্বতম বয়সসীমা একুশ থেকে উনিশে নামিয়ে দেন। তাই প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারত সভা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ঐ অন্যায় কাজ বা অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ভারত সভা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে (১৮৭৭) সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র উত্তর ভারত পরিক্রমা করে জনমত গঠনে উদ্যোগী হন। তারপরই ১৮৭৮-এর Vernacular Press Act ও Arms Act-এর বিরুদ্ধেও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ভারত সভা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও সর্বত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাস্বত্ব আইন, মাদকদ্রব্য আইন ও শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে ভারত সভা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আর বলার কোন অপেক্ষা রাখে না যে ওইসব কাজে সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন ভারত সভার প্রাণপুরুষ ও মধ্যমণি।

## 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ও কারাদণ্ড ভোগ

১৮৭৯ সালের পয়লা জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী" পত্রিকাটির স্বত্ব ক্রয় করে নিয়ে স্বয়ং পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করে দেন এবং অচিরে তা ভারত সভার মুখপাত্র হয়ে ওঠে। ১৮৮৩ সালের একটি ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জয় করে নিয়েছিলেন—হয়ে উঠেছিলেন—'মুকুটহীন সম্রাট' (uncrowned king)।

ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি জন ফ্রিসেন নরিস ব্যারিস্টারদের পরামর্শে হাইকোর্টের বারান্দায় শালগ্রামশিলা আনয়ন করায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে—*Brahmo Public Opinion*-এর সম্পাদক এবং চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ তাঁর পত্রিকায় কিছু মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর "বেঙ্গলী" পত্রিকায় বিষয়টির সমালোচনা করেন ১৮৮৩ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়ে যায় এক অতি দুঃখজনক মামলা।

দোসরা মে তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট পত্রিকাটির সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকর রামকুমার দে-র নামে রুল জারি করার অনুমতি দেন। পরের দিনই অর্থাৎ তেসরা মে (৩.৫.১৮৮৩) তারিখে তা কার্যকরী করা হয়। তাতে বলা হয় যে—"আদালতের অবমাননা করার অপরাধে কেন জেলে যাইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।"

শনিবার পাঁচই মে তারিখে মামলার রায় বের হবার কথা। সেদিন আদালত প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। আদালতের বাইরেও যেন জনসমুদ্র। বহু ছাত্রও এসে হাজির। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এসে হাজির পাইকপাড়ার ইন্দ্রচন্দ্র সেন একলক্ষ টাকা নিয়ে। উদ্দেশ্য হল যদি শাস্তি হয় মোটা টাকার জরিমানা তবে তখুনি টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে খালাস করে নিয়ে যাওয়া।

কোর্টের রায়ে সুরেন্দ্রনাথের দু-মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। আদালতের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল বিশাল জনসমুদ্র। সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হল Presidency Jail-এ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পত্রিকা *The Statesman* বিচারের নামে এই প্রহসনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। আর স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও কালো ব্যাজ ধারণ করে এই অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তি ঘটেছিল ঠিক দু-মাস পরে ১৮৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে। বাস্তবিকই সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভারত শাসনে আর এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

১৮৭৯ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী" পত্রিকার একাধারে মালিক ও সম্পাদক হয়ে যান। প্রথম প্রথম এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ১৯০০ সাল থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এখানে উল্লেখ করা অবশ্য উচিত হবে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর স্মৃতিকথায় কী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "বেঙ্গলী" কাগজ প্রথম সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ক্রমশ দৈনিক আকার ধারণ করে। তালতলার বাড়িতেই বেঙ্গলীর ছাপাখানা ছিল। প্রতি শনিবার ছাপা হইত, শুক্রবার রাত্রি জাগিয়া বেঙ্গলীর লেখা ও ছাপার সহায়তা করিয়াছি।" এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হবে যে, সমস্ত ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বেঙ্গলী-ই সর্বপ্রথম রয়টার-এর কাছ থেকে সংবাদ ক্রয় করত। এক বিদেশি সাংবাদিক এজন্যই সেই সময় বলেছিলেন—"*The Bengalee* may be regarded as the voice of India."

১৯৩২ সালে *বেঙ্গলী* বন্ধ হয়ে যায় অথবা হাত বদল হয়ে *The Star of India* এই নতুন নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এই খবরটি ঐ বছরেরই ১৭ অগাস্ট তারিখে *The Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (ডা.-শঙ্কর কুমার নাথ, 'জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় কংগ্রেস')। সুরেন্দ্রনাথ যখন জেলে তখনই বাংলায় জাতীয় কার্যনির্বাহের জন্য

একটি জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্তি পেলে জাতীয় ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে ভারত সভা একটা জাতীয় সম্মেলনের বা National Conference-এর আয়োজন করেন যাতে সুরেন্দ্রনাথই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৩-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, সিভিল সার্ভিস এবং বহু বিষয়ের আলোচনার পর কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পরের বছর ১৮৮৪-তে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারের জন্য উত্তর ভারত পরিক্রমা করে আসেন। আর ১৮৮৫-র ডিসেম্বরের শেষ দিকে দ্বিতীয়বারের জন্য জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এবার স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, সুবেন্দ্রনাথই ছিলেন দুটি জাতীয় সম্মেলনেরই মধ্যমণি ও প্রাণপুরুষ এবং স্বয়ং একাধিক প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ২৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন শেষ হওয়ার পরের দিনই অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর থেকেই বোম্বাইয়ে ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের ধারণা হয় যে বাংলার গণ-আন্দোলনকে খর্ব করতে এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম সারির বাঙালি নেতাদের এড়িয়ে চলার জন্য সুদূর বোম্বাইয়ে এমনভাবে হঠাৎ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা তো ভালোভাবেই জানেন যে জাতীয় কংগ্রেস কোনমতেই জনগণের মুখপাত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। আসলে প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ও তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও নবজাগ্রত ভারতীয় জনশক্তির মধ্যে দোভাষীব কাজ করার উপযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়েছিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে গান দিয়ে। এই অধিবেশনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হিউম সাহেব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথকে বাইরে রেখে কংগ্রেসের কাজকর্ম কখনোই ভালোভাবে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসে গ্রহণ করতেই হল এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জাতীয় সম্মেলনও (National Conference) জাতীয় কংগ্রেসে অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

জাতীয় কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর জাতীয় সম্মেলনকে আত্মসাৎ করে নেওয়া দেশ ও জনগণের দিক থেকে কী লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল সুন্দরভাবে বিচারবিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্বল করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে।"

অল্প কিছুদিন পরে বিপিনচন্দ্র পাল আবার লিখেছিলেন "মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯২০ সন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রজাশক্তির সত্যিকার মুখপাত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে।"

সে যাই হোক সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়ে নিজেকেই ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯১৮ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করার সময় পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে এসেছেন এবং বহু বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সাহায্য করেছেন। দু-দুবার ১৮৯৫-এর পুনা অধিবেশনে এবং ১৯০২-এর আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় যে গুণটি একান্ত প্রয়োজন সেই বাগ্মিতা শক্তি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শোনা যায় যে ১৮৯৫-এর পুনা কংগ্রেসে তিনি লিখিত সভাপতির ভাষণটি পাঠ না করে চারঘণ্টা ধরে একটানা বক্তৃতা করে শুনিয়েছিলেন। লিখিত ভাষণের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতার হুবহু মিল দেখে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য চালানোর জন্য ১৮৯০-এ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তারপর ১৮৯৭-এ ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যে ওয়েলবি কমিশন গঠিত হয়েছিল ঐ কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আবার তাঁকে ইংল্যান্ডে যেতে হয়েছিল। তিনি ঐ সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে ইংল্যান্ডের জনমতকে ভারতবাসীদের সপক্ষে আনতে প্রয়াসী ও বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন।

## বিরোধিতার রাজনীতি ঃ নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী মতবাদ

উনিশ শতকের শেষ দশকে বাঙালি তথা ভারতীয় মনীষীদের মনে একটা নতুন ভাবধারা বা চেতনার উদ্ভব হয়। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ইংরেজ শাসকদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি (policy of prayer and petition) দেশ শাসনে আত্মকর্তৃত্ব অর্জনের পথে কোনমতেই কার্যকরী হতে পারে না। এ বিষয়ে অরবিন্দ ঘোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই নিজের বক্তব্য সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তারপর তিলক, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পালও একই মতবাদ তাঁদের লেখা ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে বাঙালিদের মাথাতেই এই চিন্তাধারা সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল। সে জন্যেই তো লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঙালিদের চরম আঘাত দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ, তিলক, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো জাতীয় কংগ্রেসের প্রমুখ নেতারা "আবেদন-নিবেদনের"-নীতিকে রাজনৈতিক

ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কখনও ভিক্ষে করে পাওয়া যাবে না। সেজন্য দিতে হবে চরম মূল্য—মূল্য রক্তের। তাই লিখেছিলেন—

রত্নমাল্য আনবি যবে, মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তুই দেবীর আসন শূন্য ধূলায় পথেব ধারে?
রিক্ত হাতে চাসনে তারে সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।

এই চেতনা বা উপলব্ধির ফলেই জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা ধীরে ধীরে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। যাঁরা আবেদন-নিবেদনের নীতিতে তখনও পর্যন্ত আস্থাশীল রয়ে যান তাঁরা নরমপন্থী বা মডারেট নামে অভিহিত হতে থাকেন। আর যাঁরা ইংরেজ বিরোধিতার পথই শ্রেয় ও অধিকতব কার্যকরী পথ বলে মনে করতে থাকেন তাঁরা চরমপন্থী বা এক্সট্রিমিস্ট নামে পরিচিতি লাভ করেন।

**সুরাট অধিবেশন ঃ** ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। শেষে ১৯০৭-এ জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের সময় মতভেদ খোলাখুলি সংঘর্ষের রূপ নিলে ওই অধিবেশনই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পরবর্তী ৮/৯ বছরের জন্য জাতীয় কংগ্রেসে মডারেটদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অবশ্য ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে দুই শিবিরের পুনর্মিলন ঘটেছিল।

ঐ স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আবার বাংলায় বিপ্লববাদও আত্মপ্রকাশ করে যা ইতিহাসে "অগ্নিযুগ" নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। পদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করাই ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী সুরেন্দ্রনাথ অনিবার্যভাবেই মডারেট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। তবে নরমপন্থী দলভুক্ত হয়েও তিনি বিপ্লবীদের কোন কোন কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' সম্পাদক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"প্রফুল্ল চাকীকে পূর্ববঙ্গের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে মারিবার জন্য রংপুর হইতে আনানো হইয়াছিল। এই ফুলার বধ চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। এইজন্য বোমার নির্মাণ সময় হইতে ফুলারের ভারত ত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত। বোমা নির্মাণকালে শিমুলতলায় তাঁহাকে সব খবর দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই ভারতের প্রথম বোমা নির্মাণ।"

(ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৮/৪৯)।

### বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন

বাঙালিদের নবজাগ্রত চেতনা ও জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি নেতাদের প্রাধান্য খর্ব করতে এবং সর্বোপরি বাঙালিদের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট করতে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত

করেছেন ঃ (১) পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, এবং (২) পূর্ববঙ্গ ও আসাম। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ও ব্যামফিল্ড ফুলারকে দুটি নবগঠিত প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাঙালিদের সংহতি ও ঐক্য রক্ষার জন্য সারা বাংলায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং সমগ্র বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতার কথা সাম্রাজ্যবাদী সরকাবকে বুঝিয়ে দেন। লর্ড কার্জন তাঁর উদ্ধত উক্তিতে বলেছিলেন—বাঙালিদের পাঁজর ভেঙে দেওয়া হবে এবং জাতীয় কংগ্রেসকে শান্তিপূর্ণভাবে তার কবরে শুইয়ে দেওয়া হবে।

## কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ঔদ্ধত্য

কার্জনের স্পর্ধিত আচরণে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পৌরসভার স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বাঙালিরা এতই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে পার্টিশানের মতো 'settled fact' বা স্থিরীকৃত ঘটনাকে 'unsettled' বা বাতিল করানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। 'সুরেন্দ্রনাথ স্পর্ধিত কার্জনের উদ্দেশে বলেছিলেন, "I will unsettle the settled fact." 'বয়কট' বা বিলাতি পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশি ও স্বরাজই হয়েছিল এই স্বদেশি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। বলাবাহুল্য, বঙ্গভঙ্গ থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম এবং ভারতের আধুনিক জাতীয়তার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা। সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভ্রাতৃপ্রেম ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাখি-বন্ধন উৎসবের প্রচলন হয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখি-সংগীত ও অন্যান্য স্বদেশি সংগীত জনগণের মুখে মুখে গীত হয়ে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। স্বদেশি-দ্রব্য কেনার যেন এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। স্বদেশি-ভাণ্ডারের উদ্বোধন হয়। দেশি শিল্পের সমাদর এবং স্বদেশে প্রস্তুত জিনিসপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়েকটি স্বদেশি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা ও গঠনমূলক সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে 'ডন সোসাইটি'-কে ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ('National Council of Education') গড়ে ওঠে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও অপূর্ব বাগ্মিতাশক্তি দেশবাসীদের সম্মোহিত করে তোলে। দেশবাসী তাঁকে এসময় সুরেন্দ্রনাথ না বলে Surrender Not বলে ডাকতে শুরু করে।

## বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন

**অশ্বিনীকুমার দত্তের বরিশালে স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনা অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ১৯০৬ সালের ১৩ এপ্রিল সেখানে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক ওই সময় ওখানে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের আদেশে 'বন্দে মাতরম্'**

ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বরিশালের শ্রদ্ধেয় নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁর আঠারো বছরের কিশোর পুত্র চিত্তরঞ্জনকে নির্দেশ দেন সে যেন প্রকাশ্য রাজপথে, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে ঐ অন্যায় আদেশ অমান্য করে। কিশোর চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে থাকায় পুলিশ তাকে অবিরত লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন করে একটা পুকুরে ফেলে দিয়ে যায়। উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত জনতা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ওখানকার রাজা বাহাদুরের হাভেলি থেকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে একটা শোভাযাত্রা বের করে। কিন্তু মাঝপথে ক্ষিপ্ত ও হিংস্র পুলিশি আক্রমণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় আটক করা হয় এবং চারশো টাকা জরিমানা করা হয়।

সম্মেলনে যোগ দিতে সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাংলার প্রথম সারির নেতা ও মনীষীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং সরকারের দমননীতি ও পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে সভাপতি জনাব এ. রসুল দ্বিতীয় দিনে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সম্মেলনের ওপর যবনিকা টেনে দেন।

## এমপায়ার প্রেস কনফারেন্স (১৯০৯-এর ও সুরেন্দ্রনাথ)

১৯০৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ লন্ডনে অনুষ্ঠিত এমপায়ার প্রেস কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঐ সুযোগে ব্রিটেনের অধিবাসীদের কাছে বঙ্গভঙ্গ ও তার দরুন উদ্ভূত দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও আন্দোলনের কথা গভীর আবেগের সঙ্গে উপস্থাপন করে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সপক্ষে ইংল্যান্ডে একটা শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডবাসীদের বলেছিলেন যে আইনানুগ আন্দোলনের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মর্লে-মিন্টো সংস্কারসৃষ্ট নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদপ্রার্থী হননি যেহেতু বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন বিষয়ে ব্রিটিশ-শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরপর থেকে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। অবশেষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ রাজসিংহাসন আরোহণ করার পর ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে ভারতে এলে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য দিল্লিতে যে দরবার হয় সেই দরবারে তিনি বঙ্গভঙ্গ রহিত করে পুনরায় বাংলাকে একটি প্রদেশে পরিণত করার আদেশ দেন এবং মর্লে সাহেবের 'settled fact' unsettled বা বাতিল হয়ে যায়।

## সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) পরবর্তী রাজনীতি

চরমপন্থীবর্জিত খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন যথারীতি প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহে প্রতি বছরই বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হতে

থাকে। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার সকল ভারতবাসীর মনঃপূত না হলেও মডারেটদের তুষ্ট করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ-শাসকদের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করবেন না বলে সংস্কারসৃষ্ট শাসন পরিষদের সদস্য প্রার্থী না হয়ে সুরেন্দ্রনাথ লন্ডনে অনুষ্ঠিত এমপায়ার প্রেস কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইংল্যান্ডের পথে রওনা হয়ে যান। অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিতের আদেশ ঘোষণা করার পর সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে দিল্লির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে দিল্লি চলে যান।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা আবার কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠেন। ব্রিটেনের শত্রু জার্মানির পক্ষে যোগ দিয়ে দেশ স্বাধীন করার পথ সুগম করা হয়ে দাঁড়ায় বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ঐ সময় ভারতবর্ষের শাসন-কাঠামোতে যাতে সত্যিকারের গণতন্ত্রের সূচনা হয় সেই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে অ্যানি বেশান্ত 'হোমরুল লিগ' প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্য তিলক ১৯০৮ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ছয় বছরের জন্য সুদূর মান্দালয়ে নির্বাসিত থাকার পর মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে সোৎসাহে হোমরুল আন্দোলনে যোগ দেন। এদিকে ১৯১৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে যায়।

## ভারত-সচিব মন্টেগুর ঐতিহাসিক ঘোষণা (১৯১৭)

এই ঐতিহাসিক ঘোষণায় ভারত-সচিব মন্টেগু ভারতবাসীদের জন্য কিছুটা শাসন-কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেন। তারপরই তিনি ভারতে এসে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে একসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এদিকে আবার ১৯১৮ সালেই মডারেট দল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একটা স্বতন্ত্র দল গঠন করেন যার নাম All India Liberal Federation বা নিখিল ভারত উদারনৈতিক সংঘ।

১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্রিটেনে গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে মন্টেগু সংস্কার সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তারপর দেশে ফিরে দেশবাসীদেরও মন্টেগু সংস্কার গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিন্তু এখন আর দেশবাসীরা তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত করেন না।

বাস্তবে কিন্তু ব্রিটেন দুমুখো নীতি গ্রহণ করেছিল। মন্টেগু সংস্কারের মাধ্যমে কিছুটা শাসন-কর্তৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্য এবং বিশেষত বিপ্লবীদের দমন করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিপীড়নের হাতিয়ার রাওলাট আইন (Rowlatt Act) পাস করিয়ে নেয়। অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটে যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। প্রতিবাদে গান্ধীজি সরকারকে অসহযোগ

আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব জানিয়ে দেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভার্সাই সন্ধির অন্তর্গত সেভার্সের সন্ধির মাধ্যমে তুরস্ককে ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা দেখে ভারতবর্ষের মুসলমানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান দু-সম্প্রদায়ই মিলিতভাবে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়।

১৯২১ সালে মন্টেগু সংস্কার-নির্দেশিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় নির্বাচন থেকে সরে থাকে। এরপর বাংলার গভর্নর রোনাল্ডসের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য-বিভাগের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। তার আগেই অবশ্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে (Knighthood) ভূষিত করেছিল।

## কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য

১৮৭৬ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার কিছুকাল পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল নির্বাচিত সদস্যরূপে জনগণের সেবা করেছিলেন। লর্ড কার্জন ১৮৯৯ সালে কর্পোরেশনের ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়ার প্রতিবাদে ২৮ জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। পরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি কর্পোরেশনকে পুরোপুরি লোকায়ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য একটি আইন নবগঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, বর্তমানের কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁরই সৃষ্টি। চিকিৎসা বিভাগেও তিনি কতকগুলি অত্যন্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এছাড়াও ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের বাধাগুলি তিনি দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

## শেষজীবন ও মূল্যায়ন

তিন বছর পরে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য দল নির্বাচনে অংশ নেয় এবং সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সমর্থন জানায়। নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-ই জয়ী হন। বলাবাহুল্য, প্রথম থেকে মধ্যজীবন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন তিন বছরের মন্ত্রিত্বকালে সে সবই হারিয়ে বসেছিলেন। আসলে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজের জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে তিনি কোনদিনই আগ্রহান্বিত ছিলেন না। নিজের মতে ও আদর্শে কতখানি নিষ্ঠা থাকলে এমন দৃঢ়তা সম্ভব তা তো সহজেই অনুমান করা যায়। তাই নির্বাচনে পরাজিত হয়েই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। নানাভাবে তাঁকে চরম হেনস্থাও হতে হয়েছিল দেশবাসীর কাছে। তবে এরপর আর বেশিদিন তিনি জীবিতও ছিলেন না। ১৯২৫ সালের ৭ অগাস্ট শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরিশেষে, বিপিনচন্দ্র পাল (১৯১০ সালে) সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক স্যার সুরেন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে রেখে যেতে চাই আমার অন্তর উজাড় করা শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রণাম অর্ঘ্য।

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন ঃ "সুরেন্দ্রনাথের অশেষ প্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি যে কাজটি করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবন যেভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনোই সেভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটি করিয়াছেন সে কাজ অপর কেহ করেন নাই এবং করিতে পারিতেনও না।"

## তথ্যসূত্র

১. শ্রীমণি বাগ্‌চি, *জীবনীগ্রন্থ-সুবেন্দ্রনাথ*।
২. শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস*।

# দুই

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও লোকমান্য তিলক

মনে পড়ছে ১৯০৮ সালের ২২ জুলাই তারিখটার কথা। বোম্বাই হাইকোর্টে সেদিন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। দিনের আলো হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। কিন্তু তবুও শুনানি শেষ হল না। বিচারপতি Advocate General-কে বললেন—"যদি সারা রাত ধরে শুনানি চলে তবুও তিনি শুনানি চালিয়ে যাবেন। এ মামলা শেষ করতেই হবে। তিন-তিনটে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত এই আসামি ব্রিটিশের পয়লা নম্বরের শত্রু।" অবশেষে তাই হল। শেষপর্যন্ত রাত ৯টা কুড়ি মিনিটের সময় বিচারপতি তাঁর রায় ঘোষণা করলেন। আসামিকে ছয় বছরের জন্য সুদূর মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হল। পরক্ষণেই আসামির দিকে ফিরে বিচারপতি জিগ্যেস করলেন—"কিছু বলার আছে আপনার?" ক্ষণজন্মা গ্রিক দার্শনিক সক্রেতিসের মতো পরম নির্লিপ্ততায় আসামি জবাব দিলেন—"কিছুমাত্র না। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আমার যদি কিছুটা নির্যাতন সহ্য করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়ে থাকে তো আমি অবশ্যই খুশি।"

ব্রিটিশের পয়লা নম্বরের শত্রু এই আসামিই তো লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। ভারত সচিব Edwin Montague-র মতে সেই সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী নেতা। তিলকের ঘোর সমালোচক সাংবাদিক-ঐতিহাসিক Valentine Chirol-এর মতে—'Father of Indian unrest.' গান্ধীজি তো বলেইছিলেন—"He will go down to the generations yet unborn as the maker of modern India"; আর কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছে তিলক ছিলেন—'মুকুটহীন সম্রাট'।

## বংশপরিচয়, কৈশোর ও শিক্ষাদীক্ষা

জন্মলগ্ন ১৮৫৬ সালের ২৩ জুলাই। সুতরাং বলা যায় যে সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক এক বছর আগে মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে রত্নগিরিতে তাঁর জন্ম। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান তিলকের ধমনীতে ছিল পেশবা বংশের রক্ত। মাত্র দশ বছর বয়সে মা এবং ষোল বছর বয়সে স্কুল-শিক্ষক বাবাকে হারালেও বাবার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন গণিত ও সংস্কৃতে গভীর অনুরাগ। পুনার ডেকান কলেজ (Deccan College) থেকে ১৮৭৭ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বি. এ. পাস করেছিলেন।

কিশোর বয়স থেকেই তাঁর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠত বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-র কথা—যিনি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। গভীরভাবে তাঁকে আকর্ষণ করত পুনা সার্বজনিক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

গণেশ বাসুদেব যোশীর কাহিনি যাঁর কাছে স্বদেশ ছিল—'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তিলক কোনদিনই ভুলতে পারেননি বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলঙ্কারের নিবন্ধগুলি—যেগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা।

## রাজনৈতিক মতাদর্শ

একাধারে সুপণ্ডিত, সুলেখক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক তিলক অধ্যাপনা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও তিনি ছিলেন একান্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শেরও চারটি মূল সূত্র ছিল। প্রথমত, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই ভবিষৎ ভারতের ভিত গড়তে হবে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনই নয়, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েই ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। প্রয়োজনে জাপান, রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ডের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। তৃতীয়ত, নিছক শাসনতান্ত্রিক সংস্কারই নয়, পূর্ণ স্বরাজই হওয়া উচিত কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। চতুর্থত, গণচেতনা জাগ্রত করে রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এককথায় তিলক ছিলেন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের জনক। বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনসত্তার জীবন্ত বিগ্রহ ছত্রপতি শিবাজির আদর্শে দেশবাসীদের দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তিলক। তিনি আরও চেয়েছিলেন ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি দেশবাসীদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলে তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে।

গ্রীসের দৃষ্টান্ত—প্রাচীনকালে বহু নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত গ্রীকদের মধ্যে জাতীয় সংহতি (bonds of union) সুদৃঢ় করার জন্য নানা ধরনের খেলাধুলো (অলিম্পিক, নিম্যান, পাইথিয়ান, ইসথ্‌মিয়ান গেমস) ও নানা আঞ্চলিক উৎসবের আয়োজন করা হত। সেই রকম তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসী চরমপন্থীরাও জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানা ধরনের উৎসব আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। গজাসুর-হন্তা গণেশ যেন ম্লেচ্ছ ব্রিটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ওইসব উৎসবের অঙ্গ ছিল নানা ধরনের মেলা। একদল নানা সাজে সজ্জিত হয়ে নাচত। অন্যান্য দলগুলো প্রদর্শন করত শারীরিক কৌশল, লাঠি খেলা, তরবারি-চালনা, সংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা। কীচক-বধ নামে যে পালাটি দেখানো হত তা দেখে কারোরই বুঝতে অসুবিধা হত না যে কার্জনই হল কীচক। বলা-বাহুল্য, গুপ্ত সমিতিগুলি ওইসব উৎসবের আড়ালে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে নিত। এজন্যই তো অধ্যাপক ওলপার্ট বলেছেন যে, "এভাবেই ভারতবর্ষে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল।"

**গণেশ উৎসব (১৮৯৩) :** তিলক জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টির জন্য 'গণপতি উৎসব' এবং শিবাজির জীবনাদর্শ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'শিবাজি উৎসব' (১৮৯৫) এমনভাবে প্রচলন করেছিলেন যে উৎসব দুটি অচিরে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। তাই তো প্রথম দিকে মুসলমানরা পর্যন্ত দূরে সরে থাকতে পারেনি। এমনকি, এ পর্যন্ত যাঁরা অনেকেই কংগ্রেস কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেননি তাঁরা পর্যন্ত দলে দলে এগিয়ে এসেছিলেন ওই দুটি উৎসবে যোগ দিতে। 'গণপতি উৎসব' অবশ্য মহারাষ্ট্রে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তিলক এটিকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি স্বদেশি বক্তৃতা, শোভাযাত্রা, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতির প্রচলন করেন। ফলে এটি একটি জাতীয় উৎসবের রূপ ধারণ করেছিল। সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে একাত্মবোধের জাগরণ সৃষ্টিই ছিল তিলকের একমাত্র উদ্দেশ্য। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে 'গণপতি উৎসবের' মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই সার্থকতা লাভ করেছিল।

**শিবাজি উৎসব :** ১৮৯৫ সালের ১৫ মার্চ তিলক 'শিবাজি উৎসবের' উদ্বোধন করেন। রায়গড়ে ছত্রপতি শিবাজির স্মৃতিসৌধের শোচনীয় অবস্থার প্রতিবাদে সরকারি বিরোধিতা সত্ত্বেও তিলক এই উৎসবের সূচনা করেন। তিলক চেয়েছিলেন শিবাজির জীবনাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। ওই সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই 'শিবাজি উৎসবও' ক্রমশ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে এবং দেশবাসীদের দেশাত্মবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। তাঁর ওই ভবিষ্যদ্বাণী পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯০২ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম শিবাজি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এবং এরই অনিবার্য পরিপূরক হিসেবে বাংলার বেশ কিছু মফঃস্বল শহরে উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ১৯০৪ সালে কলকাতায় সবচেয়ে সফল দ্বিতীয় শিবাজি উৎসবের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঠনঠনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত পান্তির মাঠে (যে মাঠের ওপর পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেলটি গড়ে উঠেছে)। যোগ দিয়েছিলেন বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নাটোরের মহারাজা প্রমুখ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন তিলক, লাজপত রায় ও মহারাষ্ট্রের আর এক প্রভাবশালী নেতা খাপার্দে। ওই উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ—'শিবাজি উৎসব'—নামে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটি তাঁকে আবৃত্তি করে শোনাতে হয়েছিল দর্শকদের অনুরোধে—

> তোমারে চিনেছি আজ, চিনেছি চিনেছি হে রাজন,
> তুমি মহারাজ।
> তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন—
> দাঁড়াইবে আজ।

## ১৮৯৬-এর দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৭-এর প্লেগ এবং 'কেশরী' পত্রিকা

১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিলক তাঁর *কেশরী* পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় দুর্ভিক্ষ রোধে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করলেন। তাছাড়া, প্রতি সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন—"রাজস্ব দেওয়া সর্বত্র বন্ধ থাকবে। অন্তত এক বছর তো রাজস্ব দেওয়া হবেই না।" ১৮৭৬ সালের সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের পর ব্রিটিশ-রাজ 'Famine Relief Code' প্রণয়ন করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ওই আইন কোথাও প্রয়োগ করা হত না। ফলে ওই আইনটি বই-এর পাতায় নিবদ্ধ ছিল। তিলক জনসাধারণকে ওই আইনে প্রদত্ত অধিকারগুলো সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। যে-কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে তিনি জনগণকে আহ্বান জানান। আরও বলেছিলেন, এই জাতীয় দুর্ভিক্ষ যদি ইংল্যান্ডে ঘটতো আর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের এখানকার ভাইসরয়ের মতো নিষ্ক্রিয় থাকতেন তবে তাঁর সরকারের পতন ঘটতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না।

**'কেশরী' পত্রিকা :** গণপতি উৎসব ও শিবাজি উৎসব ছাড়াও এ প্রসঙ্গে 'কেশরী' পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। জনসাধারণকে জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহিত করার জন্য তিলক 'কেশরী' নামে একটি মরাঠি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতা ও মহাভারতের আদর্শ প্রচার, দেশাত্মবোধের জাগরণ ও যুব সম্প্রদায়কে জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ওই 'কেশরী' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এক বিপদের সময় আবার আর এক বিপদ। ১৮৯৬ সালের ওই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রায় হাত ধরে সেবার মহারাষ্ট্রে দেখা দিয়েছিল বিউবনিক প্লেগ। ঠিক সময়টা ছিল ১৮৯৭ সাল। ওই বছরেই পুনায় শিবাজি উৎসবে তিলক এক অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দেশের কল্যাণের জন্য শিবাজি আফজল খানকে হত্যা করে যে কোন রকম অন্যায় করেননি—এটিই তিলক তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল : "স্বাধীনতা রক্ষায় হত্যা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই শামিল।"

ঠিক এই বক্তৃতার দশদিনের মধ্যেই পুনার কালেক্টার র‍্যান্ড সাহেব ও তাঁর সহকারী লেফটেন্যান্ট আয়ারর্স্ট চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে নিহত হন। ওই দুই ইংরেজ প্লেগ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। কিন্তু প্লেগ প্রতিরোধের নামে তাঁরা জনসাধারণ এবং বিশেষত মহিলাদের ওপর নানা রকমের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিলকের শিবাজি উৎসবের ভাষণ এই হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে এই অজুহাতে তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর বিচারের প্রহসনের পর তাঁকে আঠারো মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"সকল ভারতবাসী আজ অশ্রুসিক্ত। জেলের অভ্যন্তরে তাঁর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আমার সমস্ত সহানুভূতি ও আবেগ। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তিলক সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ।"

দাদাভাই নওরোজি বলেছিলেন, তিলককে এইভাবে সাজা দেওয়ার মতো গুরুতর ভুল আর হয়নি। বাস্তবিকই এই কারাদণ্ড তিলককে জনমানসে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরম শ্রদ্ধায় দেশবাসী তাঁকে 'লোকমান্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

**১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস ঃ** ১৯০৭ সালের সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। নরমপন্থীরা ইংরেজবিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন তাদের কার্যসূচি থেকে প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। চরমপন্থীরা কিন্তু ওই আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অধিবেশনের কাজে তিলক বারবার বাধা দিতে থাকায় নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে তিলকের অনুগামী চরমপন্থী নেতাদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। সভামণ্ডপ ছোটোখাটো একটা রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। কিছু নরমপন্থী নেতাদের অনুগামীরা তিলকের দিকে চেয়ার ছুড়তে উদ্যত হয়। এক পাটি চটি জুতোও তিলককে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল। তবে সেটি অবশ্য লাগে দুই নরমপন্থী নেতা—ফিরোজ শাহ মেহতা ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে। শেষপর্যন্ত চরমপন্থীরা তিলকের নেতৃত্বে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েক বছরের জন্য নরমপন্থীদের দখলে চলে যায়।

**আদর্শগত বিরোধ ঃ** উনিশ শতকের শেষ ভাগে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় আদর্শগত বিরোধ। নরমপন্থীরা ছিলেন ইংরেজ শাসকদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা চাইতেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার লাভ করা। তাদের হাতিয়ার ছিল 'আবেদন-নিবেদনের নীতি'। কিন্তু চরমপন্থীরা 'আবেদন-নিবেদনের নীতিকে' রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করতেন। ঠিক যা মনে করতেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও। তাইতো কবি ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

মিছে কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কার(ও) নীর,
নিবেদন আর আবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।

(চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, *কবি স্মরণে*, পৃঃ ১৪)

দেখাই গেছে যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি কবির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আশীর্বাদ। তাইতো রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত লোকমান্য তিলকের জন্য বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতিতে যোগ দিতে কলকাতায় চলে আসায় তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে কবি লিখেছিলেন—অরবিন্দ। রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আর পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের আপস-বিরোধী মতবাদকে স্বীকৃতি জানাতে সুভাষচন্দ্রকেই দেশ নায়কের পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আসলে চরমপন্থীরা চাইতেন সক্রিয় জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে 'পূর্ণ স্বরাজ' ছিনিয়ে নেওয়া। নরমপন্থী বা মডারেটদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কথা বোঝাতে গিয়ে লাজপত রায় সরাসরি লিখেছিলেন—"কুড়ি বছর ধবে যে আন্দোলন তাঁরা করেছিলেন সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সুবিচার আদায়ের জন্য তা প্রায় বিফল হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন রুটি, পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো।"

(বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পৃঃ ৯৭)

## গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না, আদর্শগত বিরোধ?

কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের উদ্ভব এবং নরমপন্থীদের সঙ্গে তাদের বিরোধের মধ্যে কোন আদর্শগত ভিত্তিই দেখতে পাননি। তাঁদের মতে এই সংঘাত ছিল কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত দুটি গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের লড়াই। কিন্তু অধ্যাপক সুমিত সরকার এ প্রসঙ্গে একেবারেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে যে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে অবশ্যই আদর্শগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

## মুজাফফরপুরের ঘটনা ও হিংসার প্রসার

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু বোমা ছুড়লে ভুলক্রমে দুই ইংরেজ মহিলা মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মিস কেনেডি প্রাণ হারান। এছাড়াও ওই সময় ভারতের বহু জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ও নানা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলেছিল। এ প্রসঙ্গে তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের স্বরাজ না দেবে ততদিন ওই রকম বোমা নিক্ষেপ চলতেই থাকবে। ফলে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দীর্ঘ ছয় বছরের জন্য মান্দালয়ের জেলে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসিত অবস্থাতেই জেলে থাকাকালীন তিনি দুটি বই লেখেন—*The Arctic Home of the Vedas* এবং *গীতা রহস্য*। বই দুটি তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।

## নির্বাসিত জীবনের পরবর্তীকাল

১৯১৪ সালে তিলকের নির্বাসিত জীবনের অবসানের পর তিলক ও তাঁর অনুগামী চরমপন্থীরা আবার কংগ্রেসে প্রবেশের অধিকার পায় এবং বলাবাহুল্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিতে চরমপন্থীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

**হোমরুল আন্দোলন :** ১৯১৬ সালে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিবাদের যেমন একদিকে অবসান ঘটল অন্যদিকে তেমনি আবার জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে

তুলতে দুটি হোমরুল লিগের প্রতিষ্ঠা হল। একটিতে নেতৃত্ব দিলেন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্রগুলি ছিল—মাদ্রাজ, কানপুর, এলাহাবাদ ও বেনারস। দ্বিতীয়টি গড়ে ওঠে তিলকের নেতৃত্বে প্রধানত বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। তিলক-পরিচালিত হোমরুল আন্দোলন মধ্যপ্রদেশেও কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিলকের বাণী "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" জনগণকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের খড়্গ-হস্ত আবার নেমে এল তিলকের মাথার ওপরে। তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হল। এবারে কারাদণ্ড ছাড়াও ধার্য হল বিশ হাজার টাকার জরিমানা। একাধারে জরিমানা ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিলককে মামলা চালানোর জন্য অর্থ সাহায্য দিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিলকের প্রতি সরকারের ব্যবহারে জনসাধারণের মনে গভীর ঘৃণা সঞ্চারিত হয় এবং হোমরুল আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

হোমরুল আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং তিলক ও বেশান্তের জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সদস্য এক গোপন প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, "পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। জনগণের ওপর নরমপন্থীদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ, এবং তিলক ও বেশান্তের প্রতি জনগণের সমর্থন অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক।" ওই জটিল পরিস্থিতিতে ওই সদস্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো সুপারিশ জানিয়েছিলেন। ওই সুপারিশেরই অনিবার্য ফল ভুল হিসেবে ১৯১৭ সালের ২০ অগাস্ট তৎকালীন ভারত-সচিব এডুইন মন্টেগু ঘোষণা করেছিলেন যে, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।" ওই মন্টেগু ঘোষণারই অনিবার্য পরিপূরক হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন।

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্যে সংগ্রামের প্রয়োজন। মডারেটরা আবেদন-নিবেদন বা রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে যে অধিকারগুলি আদায়ের চেষ্টা করছেন তা কোন দিনই সফল হবে না। বাস্তবিকই লাজপত রায়ের কথাই ঠিক যে, বিশ বছর ধরে নরমপন্থীরা রুটি চেয়ে পেয়ে এসেছেন পাথরের টুকরো। তার বেশি আর কিছুই তারা আশা করতে পারেন না। আসলে তিলক দেশবাসীদের জাপান, রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ডের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলতেন। তিনি আরও বলতেন, বছরে তিন দিন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন করে এবং মাঝে মাঝে ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে স্বরাজ লাভের পথে এতটুকুও এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

## উদারপন্থী হিন্দু নেতৃত্ব ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ

রানাডে-প্রভাবিত উদারপন্থী হিন্দুরা গণপতি উৎসবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করত। তাঁদের মতে এই উৎসবের পেছনে ছিল সনাতন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। তিলক কিন্তু গ্রীস

ও রোমের প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই এ সবের জবাব দেন। জোরালো যুক্তির মাধ্যমেই তিলক অলিম্পিক, পাইথিয়ান, নিমান ও ইসথ্মিয়ান প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের উপমা দিয়ে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্যের কথা বলেন। তিলক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে জাতীয় জাগরণের অংশীদার করার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতন করেন। বলাবাহুল্য, তিলক রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গীভূত করে তাকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন।

শিবাজি উৎসব তো পরিষ্কারভাবেই রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল। এই উৎসবের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে জনগণকে উজ্জীবিত করে তোলা হয়। জোরালো যুক্তির দ্বারা তিলক বাস্তবিকই রানাডে অনুগামীদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে ওই দুটি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে লাঠিখেলা ও তরবারি চালনা, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতির মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা ফুটে ওঠে। তিলকের কাছে শিবাজি ও স্বরাজ কথা দুটি প্রায় সমার্থক ছিল। বাস্তবিকই গণপতি উৎসব ও শিবাজি উৎসবের মাধ্যমে তিলক জনসাধারণের মধ্যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ—গীতা ও মহাভারতের প্রচার করতে মরাঠি ভাষায় প্রকাশিত *কেশরী* পত্রিকাটি ছিল তিলকের হাতিয়ার। আসলে যুব-সম্প্রদায়কে জাতীয় সংগ্রামে শামিল করাই ছিল ওই *কেশরী* পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

## রজনীপাম দত্ত ও তাঁর গ্রন্থ *India Today*

রজনীপাম দত্ত হিন্দুধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট তিলকের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে তাঁর বিখ্যাত *India Today* বইটিতে লিখেছেন যে চরমপন্থী মতবাদ সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকেই সংহত করেছিল।

কিন্তু রজনীপাম দত্তের অভিমতকে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সমালোচকরা মনে করেন যে তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারা একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। আসলে তাঁরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির ওপরই বরাবর জোর দিয়েছেন। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে, ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে ধর্ম ও অতীত ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে চরমপন্থী নেতারা জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক মেহরোত্রা মনে করেন চরমপন্থী আন্দোলনের দ্বৈত চরিত্র ছিল। প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলে এই চরমপন্থী মতবাদ ছিল রক্ষণশীল। আবার গণআন্দোলনে বিশ্বাসী ও সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তা ছিল বৈপ্লবিকও।

**মূল্যায়ন ঃ** শেষমেশ সফল না হলেও জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তীকালে চরমপন্থী মতবাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই চরমপন্থী মতবাদের প্রভাবেই দীর্ঘ দিনের জড়তা ও অবসাদ দূর হয়ে যায় এবং ভারতবাসীর জীবনে গণচেতনার উন্মেষ ঘটে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। স্বয়ং গান্ধীজিই বলেছিলেন, তিলকের নেতৃত্বে সৃষ্ট চরমপন্থী মতবাদ ভারতবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে তাদেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাস্তবিকই তিলকের আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

তিলক সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছিলেন যে, "তিনি ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জনক এবং স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ।" ওই সময় আর কোন নেতাই তিলকের মতো আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারেননি। গান্ধীজি আরও বলেছিলেন যে, "He will go down to the generations yet unborn as a maker of modern India"। তাছাড়াও কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছে তিনি ছিলেন 'মুকুটহীন সম্রাট'।

মনে পড়ছে সেই ভয়ংকর দিনটার কথা—পয়লা অগাস্ট, ১৯২০ সাল। লোকমান্যের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের বুকে নেমে এসেছিল ঘোর অমানিশার গভীর অন্ধকার। আর প্রায় আর্তনাদের সুরে গান্ধীজি বলে উঠেছিলেন—"My greatest bulwark is gone today"—আমার সবচেয়ে বড়ো ভরসাস্থল আজ চলে গেল। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে লোকমান্য তিলকই ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ও প্রাচীনতম নায়ক।

ইংল্যান্ডে যখন তিলক খুবই ব্যস্ত তখন তাঁর নিজের দেশেই অতি-গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটে চলেছিল। এর মধ্যে সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ওই সংকটকালে তিলকের অনুপস্থিতিতে দেশের নেতৃত্ব চলে যায় গান্ধীজির হাতে। কিন্তু ১৯১৮ সালের শেষভাগ পর্যন্ত তিলকই ছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'মুকুটহীন সম্রাট'। তাইতো ইংরেজ ঐতিহাসিক-সাংবাদিক এবং তিলকের কঠোর সমালোচক ভালেন্টাইন চিরোল তিলককেই বলেছেন 'Father of Indian unrest'।

## তিন

# রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যে-আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবিকে পারে আমারে ধরিতে।

(উদ্ধৃতি ঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, *কবি স্মরণে*)

তবুতো আমাদের কবিকে খুঁজতে হবে, আর খুঁজতে হবে তাঁকে তাঁর কথার মধ্যে, তাঁর রচনায়, তাঁর কাজে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতুলচন্দ্র গুপ্ত এক জায়গায় বলেন—"মানুষের যা-কিছু মহৎ তাঁর পূজা পেয়েছে। যা-কিছু হীন, তাঁকে বেদনা দিয়েছে। ............ প্রাচীন যেখানে বড়ো কোন নবীন তাঁর মনের শ্রেষ্ঠত্ববোধকে টলাতে পারেনি। নবীন যেখানে সত্য, কোন প্রাচীনের মোহ তা গ্রহণ করতে তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। সমস্ত মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ও মহত্ত্বের তিনি ছিলেন প্রতীক। একাধারে এই মহাকবি ও মহামানব বাস্তবে দেখা না দিলে কল্পনায় সম্ভব হত না।" (উদ্ধৃতি ঃ *কবি স্মরণে*) রবীন্দ্রনাথের জীবন এক বিরাট মহাভারত। আমরা এখানে তাঁর দেশপ্রেমের কথাই শুধু স্মরণ করব।

### সাধারণ মানুষের কবি

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সাধারণ মানুষের কবি হিসেবে পরিচিত হতে চাইতেন। তাই লিখেছিলেন—

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আর বার —
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক;
আমি তোমাদেরই লোক—
আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়।

কবিকে বাস্তবিকই অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হয় যখন দেখি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি কীভাবে কলম ছেড়ে পথে নেমে পড়েছিলেন— দেশবাসীদের নেতৃত্ব দিতে—আর অনুপ্রাণিত করতে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে পরাধীনতার গ্লানি কবিকে কতদূর ব্যাকুল ও বিচলিত করেছিল।

## স্বাদেশিকের সভা

'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন—"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাম—'স্বাদেশিকের সভা'। ঠনঠনিয়া অঞ্চলের একটা পোড়ো বাড়ীর একটা অন্ধকার ঘরে সভা বসত। ওই ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর একটা মড়ার মাথা রাখা থাকত। তার দুটো চোখের দুটো গর্তে দুটো মোমবাতি জ্বলতো।"

"ঋত্বিক রাজনারায়ণ বসু একখানি লাল চেলি পরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর তাঁর সামনে একটা শপথ বাক্যের নিচে সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম স্বাক্ষর করতে হ'তো বুক-চেরা রক্ত দিয়ে।" শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ওই স্বাদেশিকের সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

**হিন্দুমেলা ঃ** ১৮৬৭-তে ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলা'। নবগোপাল মিত্র—যিনি 'ন্যাশানাল' নবগোপাল নামেই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ছিলেন হিন্দুমেলার সর্বময় কর্তৃত্বে নিয়োজিত। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম। হিন্দুমেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশীয় শিল্প ও ব্যায়াম প্রদর্শিত এবং গুণীজন সমাদৃত হইতেন।" কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রতি বছর ওই মেলায় যোগ দিতেন—স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন—গান গাইতেন। একবার তাঁকে ওই মেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখে কবি নবীনচন্দ্র সেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে বলেন "আমি মেলায় এক অপূর্ব নবযুবককে দেখলাম। কালে সে অবশ্যই এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হবে।" তা শুনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছিলেন—"কে রবিঠাকুর বুঝি? ও তো ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা-মিঠে আঁব।"

## জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫। বোম্বাইয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সভাপতির আসনে বাঙালি ব্যারিস্টার—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। উপস্থিত বাঙালির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। চব্বিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আর দেখেশুনে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছে ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কৈ রে বাঙ্গালী কৈ?

## জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন

**১৮৮৬-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল কবিকণ্ঠের গান দিয়ে। গানটি ছিল—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।"**

পরেও কবি বহু অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদনের নীতি'কে বরাবরই ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করতেন। ঠিক যা মনে করতেন চরমপন্থী নেতারা—তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিন পাল প্রমুখেরা। তাই তো ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

মিছে কথার বাঁধুনী, কাঁদুনীর পালা,
চোখে নাহি কার(ও) নীর,—
নিবেদন আর আবেদনের থালা,—
ব'হে ব'হে নতশির।

আত্মশক্তির দ্বারা ভেতর থেকে দেশকে সৃষ্টি করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূল কথা। তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কখনও ভিক্ষে করে পাওয়া যাবে না। তার জন্য দিতে হবে পরম মূল্য। সে মূল্য রক্তের। তাই তো কবির কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে—

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা,
রিক্ত হাতে চাসনে তারে—
সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে,
রত্ন মাল্য আনবি যবে—
মাল্য বদল তখন হবে,
পাতবি কি তুই দেবীর আসন,
শূন্য ধূলায় পথের ধারে?

সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি কবির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আশীর্বাদ। আর নরমপন্থীদের চেয়ে চরমপন্থীদের সঙ্গেই ছিল তাঁর অন্তরের যোগ। তাই রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত লোকমান্য তিলকের জন্য বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতিতে যোগ দিতে কলকাতায় চলে আসায় তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে কবি লিখেছিলেন—

অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের আপস-বিরোধী মতবাদকে স্বীকৃতি জানাতে সুভাষচন্দ্রকেই দেশনায়কের পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

## বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। ওই দিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড কার্জনের আদেশে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল। আবার ওই দিন বিকেলেই আপার সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন অসামান্য পণ্ডিত ও দেশবরেণ্য নেতা আনন্দমোহন বসু। অনুষ্ঠান শেষ হলে এক বিশাল জনসমুদ্র এগিয়ে চলল। পুরোভাগে

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবির সুরে সুর মিলিয়ে ওই বিশাল জনসমুদ্র গান ধরেছিল—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান?
তুমি কি এমনি শক্তিমান?
আমাদের ভাঙ্গা-গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান?
তোমাদের এমনি অভিমান?

গানটির শেষ ছিল—

আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান
তোমাদের এমন অভিমান।
তুমি কি এমনি শক্তিমান?

প্রথম গানটি শেষ হতেই ওই বিশাল জনসমুদ্র দ্বিতীয় গান ধরেছিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে।
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে—
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

কয়েকদিন বাদে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল—'বিজয়া সম্মেলন'। অবিভক্ত বাংলার অখণ্ড প্রাণসত্তাকে এক সূত্রে গেঁথে দেওয়ার জন্য কবি রচনা করলেন—'রাখী সঙ্গীত'। মিলিত কণ্ঠে গানটি গাওয়া হয়েছিল ওই দিনের অনুষ্ঠানে।

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—পুণ্য হউক হে ভগবান।

গানটির শেষ ছিল—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই-বোন—
এক হউক—এক হউক—এক হউক—হে ভগবান।

বাস্তবিকই কবি সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে এক অভাবনীয় প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত গানে ও কবিতায়—সুরে ও কণ্ঠস্বরে সেদিন যে কী উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ কল্পনা করাও বেশ কঠিন ব্যাপার।

এক চিরজীবী বায়স বা কাককে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল, কোন্ যুদ্ধটা সবচেয়ে ভয়ংকর বা সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী হয়েছিল? শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, না, রাম-রাবণের যুদ্ধ? না, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ?

বায়সটি উত্তরে বলেছিল—তিনটি যুদ্ধেই পৃথিবী রক্ত সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল। তবে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের সময়—গাছের ডালে ডালে বসে সামান্য মাথা নীচু করে রক্ত পান করেছিলাম। আর রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রক্ত ঠোঁট অবধি উঠে এসেছিল। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় রক্ত এত ওপরে উঠে গিয়েছিল যে, ঠোঁট ওপরে তুলে ধরে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল।

১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলন। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন। আর ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন। তিনটির মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল? অবশ্যই গুরুত্বের বিচারে স্বদেশি আন্দোলনকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। উল্লেখ্য কবি ও ঐতিহাসিকদেরও তাই মত। স্বয়ং গান্ধীজি পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, স্বদেশি আন্দোলনই ভবিষ্যতের সব আন্দোলনেরই পথপ্রদর্শক। তবে বিশালতার বিচারে আইন অমান্য আন্দোলনের স্থানই সবার ওপরে হওয়া উচিত। তাই অবাক বিস্ময়ে কবি সেদিন লিখেছিলেন—

কিসের তরে গো ভারতের আজি—
সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি—
এক তারে কভু ছিলো না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে—
সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।

## জনগণমন সংগীতটির রচনা

১৯১১ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে। ইতিমধ্যে ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন—"বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হল।" ওই সময় জাতীয় কংগ্রেস মডারেটদের (Moderate) দখলে ছিল। কাজেই নরমপন্থীদের ধারণা হল যে তাঁদের অনুসৃত নীতিরই জয় হয়েছে—'settled fact unsettled' হয়েছে। তাই মডারেটরা স্থির করলেন যে, কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামে জয়গান করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। কালবিলম্ব না করে কয়েকজন মডারেট নেতা বিশ্বকবির শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের জয়গান করে কোন গান লিখে দিতে কবি রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত বিশ্বের চিরসারথী মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্তবগান করে একটা গান লিখে পাঠিয়ে দিলেন। গানটি নরমপন্থীদের তেমন পছন্দ হল না। তাই অধিবেশনের প্রথম দিনে একটা হিন্দি গান গাওয়া হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কবি রচিত গানটিই গাওয়া হয়। দেশের স্বাধীনতার পর ওই গানটিই ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে—

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে—
ভারত ভাগ্য বিধাতা।

গানটির শেষে আছে—

জয় জয় জয় হে! জয় বিশ্বেশ্বর,
মানব ভাগ্য বিধাতা।

কবির জীবদ্দশাতেই গানটি সম্পর্কে কোন কোন মহলে কিছু কিছু গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন গানটিতে তো সম্রাট পঞ্চম জর্জের জয়গান করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, মানব ভাগ্যবিধাতা হতে পারেন কে?— মানুষ পঞ্চম জর্জ, না, মঙ্গলময় ঈশ্বর? তাছাড়া ওই বছরই মাঘোৎসবে কবির বাড়িতে গানটি গাওয়া হয়েছিল। কবি নিশ্চয়ই মাঘোৎসবের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের জয়গান করেননি।

## অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণ ও রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশি আন্দোলনের পর কবি আবার কলম ছেড়ে পথে নেমে পড়েছিলেন ১৯১৭ সালে অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত দুটি প্রতিবাদ সভার আয়োজনে। টাউন হলে সভা দুটির অনুষ্ঠানের অনুমতি সরকার শেষপর্যন্ত দেননি। তাই প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরিতে এবং পরে অ্যালফ্রেড্ থিয়েটারে (বর্তমানের গ্রেস সিনেমা হল) সভা দুটির আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন যথাক্রমে জগদীশচন্দ্র বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। দুটি সভাতেই দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর গানের দল "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটি অন্য সব গানের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন। দ্বিতীয় সভায় দীনেন্দ্রনাথের দলের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দ্বিতীয় সভাতে যেরকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা জনগণের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা এর আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। বিশিষ্ট অতিথিদের পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। আর অ্যালফ্রেড্ থিয়েটারের লোহার গেট দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

## জালিয়ানওয়ালাবাগ ও প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমননীতি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছিল। হাতিয়ার হিসেবে পাস করা হল—'রাওলাট আইন' (১৮/৩/১৯১৯)। অনিবার্য ফল হিসেবে ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড (১৩/৪/১৯১৯)।**

**পাঞ্জাবে মার্শাল-ল-জারি হয়েছে। ওখানকার খবরাখবর সংবাদপত্রে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রায় দেড় মাস পরে—২৭ মে তারিখে—কথাটা আশুতোষ চৌধুরীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম কবির কানে পৌঁছোয় (২৭/৫/১৯১৯)। দু-দিন তিনি শুধু ছট্‌ফট্ করে বেড়ালেন**

(২৭/৫/১৯১৯ থেকে ২৮/৫/১৯১৯)। রাত্রেও ঘুমোতে পারলেন না এতটুকু। তিনদিনের দিন (২৯ মে) কাউকে কিছু না বলে, এমনকি পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও কিছু না বলে, চলে এলেন কলকাতায়। ওই দিনই রাত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। যদি কোন প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করা যায় সেই চেষ্টায়। কিন্তু নেতাদের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ৩০ মে তারিখে সারা রাত জেগে একটা চিঠি লিখলেন বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ডকে। ওই চিঠিতেই কবি জানিয়ে দিলেন যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড (Knighthood) বা 'স্যার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন।

কবির নিজের হাতেই করা চিঠিটার বাংলা অনুবাদ পরের দিন ৩১ মে তারিখে 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময় মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন জ্ঞানতপস্বী অধ্যক্ষ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি স্বয়ং কবির মুখ থেকে মূল পত্রখানি শোনার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন খবর পেয়ে কবি তাঁর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পত্রটি স্বয়ং কবির মুখ থেকে শোনার পর অভিভূত রামেন্দ্রসুন্দর কবির পদধূলি মাথায় নিলেন। কিছুক্ষণ পরে কবি ফিরে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞান হারালেন। তাঁর চেতনা আর ফিরে আসেনি (০৩/০৬/১৯১৯)।

## ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স্ লীগ

১৯২৭-২৮ সালে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসকে দ্বিখণ্ডিত না করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই একটি মঞ্চ গঠন করেন। নামকরণ করা হয় ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই ওই মঞ্চটির সর্বভারতীয় সভাপতির পদটি অলংকৃত করেছিলেন। আসলে জাতীয় কংগ্রেসের বাম মনোভাবাপন্ন সদস্যদের এক ছাতার নীচে আনাই ওই মঞ্চটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল।

## যতীন দাশের আমরণ অনশন

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল। কবি তখন শান্তিনিকেতনে। শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না। উত্তরায়ণের দরজার ঠিক বাইরে একটা ইজিচেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় খবর এল আজ দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে অনশনের ৬৩ দিনের দিন অমর শহিদ যতীন দাশ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। খবরটা শুনেই ক্ষোভে ও দুঃখে কবি যেন কেমন হয়ে গেলেন। ঘুমোতে পারছিলেন না শুধু ছট্‌ফট্ করছিলেন। শেষে রাত জেগেই এই গানটি লিখে ফেলেন।

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহো।

১৯৩০ সালে *রাশিয়ার চিঠি* বইটিতে লিখেছিলেন—"একবার রাশিয়া ঘুরে না এলে এজীবনে তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম।"

## হিজলি জেলে রাজবন্দিদের ওপর গুলি চালনা

১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলি জেলের পুলিশ অকস্মাৎ এবং বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানোতে দুজন রাজবন্দি—সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের (বর্তমানে শহিদ মিনার নামে পরিচিত) নীচে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ধিক্কার জানায়। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কবি ওই সভায় যোগ দিতে শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে আসেন এবং তাঁর সভাপতির ভাষণে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন—

"এতো বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক। কিন্তু যখন ডাক পড়লো থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।"

কবি আরও বলেছিলেন—"প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদণ্ড অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।"

আর হিজলির রাজবন্দিদের জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন—"যা কোন কিছুকেই আবদ্ধ রাখতে দেয় না সেই মুক্তিই তোমাদের অন্তরে অবারিত হোক।"

তারপর নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করতে সেই রাত্রেই লিখে ফেললেন 'প্রশ্ন' কবিতাটি—

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
> নিভাইছে তব আলো—
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
> তুমি কি বেসেছ ভালো?

## সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও গান্ধীজির অনশন

**১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাস। বিশ্বকবি তখন শান্তিনিকেতনে। হঠাৎ খবর এল, গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করবেন। গুরুদেব গান্ধীজিকে টেলিগ্রাম পাঠালেন "Our sorrowing heart will follow your sublime penance with reverence and love."**

জবাবে গান্ধীজির টেলিগ্রাম এল—

"Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing, if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received."

কবি সেদিন মন্দিরে অনেকক্ষণ উপাসনা করলেন। আশ্রমবাসীরাও সকলে উপবাসে রইলেন। কিন্তু গান্ধীজির জন্য কবির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়েই চলল। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও নিজেই পুনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও মৌলানা আজাদ তখন কারাগারে। কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, মহাদেব দেশাই, সরোজিনী নাইডু ও কমলা নেহরু প্রমুখেরা আগেই উপস্থিত হয়ে গেছেন। বিশ্বকবিও যথাসময়ে পৌঁছে গেলেন। তারপর মীমাংসার খবর পেয়ে কবির হাত থেকে কমলালেবুর রসপান করে গান্ধীজি তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন আর কবিকে একটা গান গাইতে অনুরোধ করলেন। কবি গাইলেন—

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো।।
কর্ম যখন প্রবল আকাব, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার।
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো।।

## বিপ্লবীদের সকল কর্মকাণ্ডের প্রেরণা এবং আত্মার আত্মীয়

তিন বিপ্লবী কালীমোহন ঘোষ, কেদারেশ্বর গুহ ও হীরালাল সেন-কে চাকরিতে নিয়োগ করায় পুলিশের খাতায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে কবি চিহ্নিত হয়েছিলেন। এমনকি আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় পর্যন্ত তাঁকে উঠতে হয়েছিল।

বাঘাযতীন, মাস্টারদা, দীনেশ গুপ্ত ও প্রীতিলতা প্রমুখেরা রবীন্দ্রনাথের বই হাতে পেলে নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে যেতেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে উঠছেন। মৃতা প্রীতিলতার পোশাক তল্লাশি করে যে কাগজের টুকরোটি পাওয়া গিয়েছিল তাতে লেখা ছিল রবীন্দ্র-কবিতারই দুটি লাইন—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া—
বাহির হনু তিমির রাতে তরণীখানি বাহিয়া।

প্রায়ই শোনা যেত ফাঁসির আসামি ভগৎ সিং তাঁর কনডেমড্ সেল থেকে আবৃত্তি করছেন জাপানি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে জাপানে বলা বিশ্বকবির ইংরেজি ভাষণটি। গান্ধীজি বহুবার বলেছেন যে, গুরুদেব রচিত "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে" গানটি আমার কাছে বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছে। এরপরও কি কেউ বলতে পারবেন

যে, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাসী কবিই ছিলেন। হ্যাঁ, কবি তো তিনি ছিলেনই, একেবারে সেরা-বিশ্বকবি। তাছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল গভীর দেশপ্রেম। যা তাঁকে করে তুলেছিল বিপ্লবীদের আত্মার আত্মীয়। তাই তো অনুশীলন সমিতির প্রাণ পুরুষ প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর কণ্ঠে সর্বদা ধ্বনিত হত কবির লেখা এই গানটি—

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া,
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে—
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

## মিস্ রাথবোনের অপমানকর খোলা চিঠির প্রতিবাদ

এল কবির জীবনের শেষ জন্মদিন—১৩৪৮-এর ২৫ বৈশাখ। কবি খুবই অসুস্থ। বড়ো রকমের একটা অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। আরও একটা হবে। তাই জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি অনেক আগেই পয়লা বৈশাখেই সেরে ফেলা হয়েছে। মোটকথা এই সময় ভারতবাসী মাত্রই কবির জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময় বজ্রপাতের মতো দেখা দিল ইংরেজ মহিলা মিস্ রাথবোনের অপমানকর খোলা চিঠি। চিঠিটির মূল বক্তব্য ছিল—"ভারতবাসী ইংরেজদের কাছ থেকে ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে উন্নত হয়েছে। অথচ আজ বিশ্বযুদ্ধে বিপন্ন ইংল্যান্ডকে তারা কোনো সহায়তা করছে না। ইহা অবশ্যই কৃতঘ্নতা এবং অতীব নিন্দনীয় কাজ।"

স্থির থাকতে পারলেন না কবি। গর্জে উঠলেন রোগশয্যা (আসলে মৃত্যুশয্যা) থেকেই (জুন, ১৯৪১)। ঐ দিনই Associated Press মারফত ওই অপমানকর খোলা চিঠির প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটিতে কবি লিখেছিলেন—

**'ইংরাজী ভাষা ও ব্রিটিশ শাসন ধারায় যতটুকু পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক তা থেকে অবশ্যই আমরা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। তবে একথাও না বলে থাকতে পারছি না যে, অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমেও আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারতুম।"**

**"কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন যে দুশো বছর ধরে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে শাসনের নামে শোষণ করেছে অনেক বেশি? তাই তো আজো ঘরে ঘরে দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষের কান্না ও হাহাকার। আর শতকরা দুজন ছাত্র মাত্র যথার্থ শিক্ষিত। আমার তো মনে হয় আমাদের ক্ষতি ও অনিষ্টের কথা মনে রেখে ভদ্রগোছ ইংরেজদের অন্তত নীরব থাকাই উচিত। আর শত অমঙ্গল ও অনিষ্টের পরও আজো যে ভারতবাসীমাত্রই নীরব ও নিষ্ক্রিয় আছে তার জন্য বরং ইংরেজদেরই আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"**

**কবি যে শেষপর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না সেজন্য তাঁর দেশবাসীদের দুঃখ ও বেদনা কোনদিনও যাবে না।**

চার

# দুই মনীষী ঃ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি দুজনেই ছিলেন মহান দার্শনিক এবং ভারত তথা পৃথিবীর দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। একজনের দর্শন প্রতিফলিত হয়েছিল সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির সাধনায়, অন্যজনের দর্শন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল অহিংস-অসহযোগ নামাঙ্কিত এক নতুন রাজনৈতিক হাতিয়ারের মাধ্যমে। আবার দুজনেরই অন্তরে ছিল দেশ ও মানুষের প্রতি অগাধ ও গভীর ভালোবাসা।

তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রথম সক্ষাৎকারটি ঘটেছিল ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে। গান্ধীজিই কবির প্রতি দুর্বার আকর্ষণে নিজে থেকেই ছুটে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং থেকেও গিয়েছিলেন প্রায় মাসখানেক। ওই সময় ছাত্রছাত্রী, কর্মী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করে সকলেরই মন জয় করে নিয়েছিলেন। সকলকেই বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে ব্যক্তিগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার গুরুত্বের কথা। ফলে ওই বছরই ১০ মার্চ তারিখে গান্ধীজির নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রী, কর্মী ও শিক্ষকরা সকলেই নোংরা ফেলা পর্যন্ত সব রকমের ব্যক্তিগত কাজ নিজেরাই করেছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ১০ মার্চ তারিখটা শান্তিনিকেতনে "গান্ধীজি দিবস বা পরিচ্ছন্নতা দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গির একেবারেই মিল ছিল না। অহিংসার পূজারি গান্ধীজির আজীবনের স্বপ্ন ছিল অহিংসার মাধ্যমে শত্রুর হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন। পরাধীন ও নিরস্ত্র দেশবাসীদের তিনি অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণাই করে দিয়েছিলেন যে "তোমরা সব চরখা কাট, খদ্দর পর—এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে।" তা শুনে বিস্মিত বিশ্বকবি বলেছিলেন—"তা কেমন করে হবে? এ যে দেখি সন্ন্যাসীর মন্ত্র বলে অসাধ্য সাধনের আশ্বাস দেওয়া।" আসলে কবি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কখনও 'আবেদন-নিবেদন' বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। বলাবাহুল্য, জাতীয় কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদনের' নীতিকে কবি বরাবরই ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করতেন। ঠিক যা মনে করতেন চরমপন্থী নেতারা লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখেরাও। তাই তো ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছিলেন—

**মিছে কথার বাঁধুনী, কাঁদুনীর পালা,**
**চোখে নাহি কার(ও) নীর,**
**নিবেদন আর আবেদনের থালা—**
**ব'হে ব'হে নত শির।**

আত্মশক্তির দ্বারা ভেতর থেকে দেশকে সৃষ্টি করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূল কথা। কবির আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে দিতে হবে চরম মূল্য। এজন্যই তো কবির কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা,
রিক্ত হাতে চাসনে তারে,
সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে,
রত্নমাল্য আনবি যবে, মাল্য বদল তখন হবে—
পাতবি কি তুই দেবীর আসন, শূন্যধূলায় পথের ধারে।

দেখাই গেছে যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি কবির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আশীর্বাদ। আর নরমপন্থীদের চেয়ে চরমপন্থীদের সঙ্গেই কবির ছিল অন্তরের যোগ। তাই রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত লোকমান্য তিলকের জন্য বাংলা থেকে অর্থসংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতিতে যোগ দিয়ে বরোদা-রাজের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে এলে তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে লিখেছিলেন—"অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" আর সুভাষচন্দ্রের আপসবিরোধী মতবাদকে স্বীকৃতি জানাতে সুভাষচন্দ্রকেই 'দেশনায়কের' পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

## ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের একটা ঘরে দুজনে একদিন অসহযোগ সম্পর্কে আলোচনায় বসেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে একমাত্র দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজই ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। টানা চার ঘণ্টা ধরে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলেছিল। কিন্তু কেউ কাউকে তাঁর নিজস্ব মতবাদ থেকে এতটুকু টলাতে পারেননি। তাঁদের দুজনের মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল তখন একদল উগ্র গান্ধিভক্ত জনতা রবীন্দ্রনাথের মতবাদকে হেয় করতে বিচিত্রা ভবনের সামনেই বিলিতি কাপড় পোড়াতে শুরু করে দেয়। ওই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি দুঃখ ও লজ্জা পেয়েছিলেন গান্ধীজি নিজে। আসলে দুজনেই ছিলেন মহামানব। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে মতের অমিল থাকলেও দুজনেই ছিলেন দুজনের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। গান্ধীজিই তো বিশ্বকবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে কবিকে সর্বপ্রথম 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন। তাছাড়া কবি রচিত—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে—" গানটি তো গান্ধীজির কাছে বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। আবার গান্ধীজির 'মহাত্মাজি' নাম তো রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই পূতচরিত্রের মানুষটিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা বারবার কারারুদ্ধ করছে দেখে কবি ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—

## ১৯২৬ সালের পুজোর ছুটিতে

১৯২৬ সালের পুজোর ছুটির সময় কবি বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উত্তরভারত পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। যেভাবেই হোক গান্ধীজি আগের থেকেই জানতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটা জানার পরই তিনি ঘনশ্যামদাশ বিড়লা প্রমুখ ওই সময়ের ছয়জন প্রথমসারির শিল্পপতিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ হাজার করে মোট ষাট হাজার টাকা আনিয়ে রেখেছিলেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর দিন গান্ধীজি স্বয়ং প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে গান্ধীজি কবির সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে ষাট হাজার টাকার চেকটা তুলে দিয়ে কবিকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর ওই বয়সে এইসব অনুষ্ঠানে নিজে অংশগ্রহণ না করেন। তাছাড়াও গান্ধীজি কবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্বভারতীর অর্থসংকট দূর করতে স্থায়ী কিছু একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা তিনি অবশ্যই করবেন। কবিকে দেওয়া জাতির জনকের ওই প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাতেই স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মর্যাদা দিয়ে অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল ১৯৫১ সালে। আর প্রথম আচার্য ও উপাচার্যের পদ দুটি অলংকৃত করেছিলেন যথাক্রমে জওহরলাল নেহরু ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সারাবছর ধরেই কবির শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তাই কবি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। এমন সময় বজ্রপাতের মতো খবর এল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) প্রতিবাদে পুনার যারবেদা জেল থেকে বন্দি অবস্থাতেই গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করে দিয়েছেন। খবরটা শোনার পরই কবি গান্ধীজিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন—"Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love"। জবাবে গান্ধীজির টেলিগ্রাম এল—"Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessings if you could approve action and behold I have it in abundance in your message just received"।

কবি সেদিন দীর্ঘ সময় ধরে মন্দিরে উপাসনা করলেন। আশ্রমবাসীরাও সকলে উপবাসে রইলেন। কিন্তু গান্ধীজির জন্যে কবির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যেন ক্রমশই বাড়তে থাকল। রাতেও ঘুমোতে পারলেন না এতটুকু। শেষপর্যন্ত অশান্ত মন ও অপটু শরীর নিয়েই পরের দিন সকালেই পুনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

এখানে সাম্প্রতিক অতীত ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। স্মৃতির পটে ব্রিটিশ শাসনের মতো করুণ ও মর্মান্তিক ছবি ভেসে উঠছে। একদিকে

জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের হোতা কুচক্রী ব্রিটিশ শাসকদের নির্লজ্জ শোষণ ও নির্মম অত্যাচারের অভিশপ্ত ইতিহাস। অন্যদিকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শত-সহস্র তরুণ ও কিশোরদের আত্মবলিদানের পবিত্র ও অমর কাহিনি।

## মহারানির হাতে শাসনভার অর্পণ এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ প্রয়োগ

সিপাহি বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে দেখেই ইংরেজরা বাস্তবিকই আতঙ্কিত ও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাদের প্রথম পদক্ষেপই হয়েছিল সকল সমস্যা এড়িয়ে চলা এবং বাস্তবিকই দুর্বল কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়া ও তাঁর পার্লামেন্টের হাতে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ভেদনীতি (Divide and Rule) প্রযোগ করে ভাবতীয় জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া এবং সেই জায়গায় দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মনে গেঁথে দেওয়া (poison of two Nation Theory)। এজন্যই তো আলিগড় আন্দোলনের হিন্দু-বিরোধী নীতিকে সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশ শাসকরা মদত দেওয়া শুরু করেছিল। তাছাড়া শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধে হবে এই অজুহাতে বঙ্গভঙ্গেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তারপরই ১৯০৬ সালে সিমলায় বসেই বড়োলাট লর্ড মিন্টো আগা খান প্রমুখ মুসলিম নেতাদের বোঝালেন যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য আলাদা একটি মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ১৯০৬ সালেই মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করতেই হবে বড়োলাট লর্ড মিন্টোর সেক্রেটারি নিজের হাতে এই নতুন প্রতিষ্ঠিত দলটির গঠনতন্ত্রটি লিখে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। অবশেষে ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কারে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হলে লর্ড মর্লের দুমুখো নীতি ধরা পড়ে যায়। এখানে আবার উল্লেখ করা যেতে পারে, যে রুশ-বিপ্লবের নায়ক লেনিন ১৯০৮ সাল থেকেই (অর্থাৎ বেশ কিছুদিন আগে থেকেই) মর্লেকে Liberal Scoundrel বা উদারনীতিবাগীশ বজ্জাত বলে অভিহিত করে আসছিলেন।

## পুনা চুক্তি

তারপর তেইশ বছর পরে (১৯৩২ সালে) তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড আবার মর্লের পথেই হাঁটতে চাইলেন তাঁর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি বা Communal Award Policy ঘোষণা করে। অবশ্য তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যে ফাটল ধরানো। ওই ঘোষণায় বলা হয়েছিল শিখ, বর্ণহিন্দু ও তপশিলি হিন্দুদেরও পৃথক নির্বাচনের (Separate Electorate) অধিকার দেওয়া হবে। এর ফলে

হিন্দু সমাজের ঐক্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। অগত্যা জাতীয় ঐক্যরক্ষা করতে জেল থেকে বন্দি অবস্থাতেই গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করে দেন। তখন গান্ধীজির প্রাণ রক্ষা করতে হরিজনদের অবিসংবাদী নেতা ড. আম্বেদকরের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা 'পুনা চুক্তি' নামে একটি চুক্তি সম্পাদনা করেন (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সাল)। চুক্তিটির শর্ত অনুসারে আইনসভায় হরিজনদের দ্বিগুণ আসন (seat) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকায় হরিজনরা খুশি হয়েই যৌথ-নির্বাচনে (Joint Electorate) থেকে যায়। শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরাও পুনা চুক্তি মেনে নিয়ে গান্ধীজিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সুতরাং স্বীকার করতেই হয়, আংশিক হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্যই পরাজিত হয়েছিলেন গান্ধীজির অহিংস-অসহযোগ মন্ত্রের কাছে। সারা দেশ জুড়ে বয়ে চলে খুশির জোয়ার।

কবির হাত থেকে কমলালেবুর রস পান করে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন—ঐ ঘোরতর সংকটময় মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরু ছিলেন কারান্তরালে। তবে রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মহাদেব দেশাই, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, সরোজিনী নাইডু ও কমলা নেহরু প্রমুখেরা ইতিমধ্যেই গান্ধীজির শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে গেছেন। বিশ্বকবিও যথাসময়ে পৌঁছে গেলেন। তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে (অর্থাৎ পুনা-প্যাক্ট সম্পাদিত হয়ে গেলে) কবির হাত থেকে কমলালেবুর রস পান করে গান্ধীজি তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন এবং কবিকে একটা গান গাইতে অনুরোধ জানালেন। কবি গাইলেন—

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো।।
কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার—
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো।

## পাঁচ

# জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে যখন ভারত-সচিব মন্টেগু শাসন-সংস্কার সম্পর্কে গবেষণায় মগ্ন ঠিক তখনি ব্রিটিশ রাজ ভারতের বিপ্লবীদের দমন করার জন্যে ব্রিটিশ বিচারপতি জাস্টিস রাওলাটের নেতৃত্বে রাওলাট কমিটি বা ১৯১৮-র সিডিশন কমিটি গঠন করলেন। স্তম্ভিত ও হতবাক বিশ্বকবি ব্যঙ্গ মিশ্রিত ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"বড়ো ইংরাজ যাহা দিবে বলিয়া ভাবে, ছোটো ইংরাজ তাহার অনেকখানি নষ্ট করিয়া দেয়।" বলাবাহুল্য, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি উপস্থাপিত হলে ভারতীয় সদস্যরা এক যোগে আপত্তি জানান। এমনকি চারজন ভারতীয় সদস্য পদত্যাগও করেন। তবুও অনমনীয় ব্রিটিশ রাজ ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ বিলটি আইনে পরিণত কবলেন।

গান্ধীজি বোম্বাই থেকে এক পত্রে ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে বিলটি প্রত্যাহৃত না হলে ৩০ মার্চ ভারতের সর্বত্র হরতাল পালিত হবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থা বা Passive Resistance শুরু করে দিতে বাধ্য হবেন। পরে অবশ্য তারিখটি পরিবর্তন করে ৬ এপ্রিল করা হয়েছিল। তবুও দিল্লিতে ওই ৩০ মার্চ তারিখেই পালিত হয় এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে যায়। ক্ষুব্ধ গান্ধীজি পুনরায় ঘোষণা করেন যে ওই ৬ এপ্রিল তারিখে অবশ্যই ভারতের সর্বত্র হরতাল পালিত হবে। তারপর অশান্ত দিল্লির মানুষদের শান্ত করার জন্যে দিল্লির পথে রওনা হয়ে যান। কিন্তু ব্রিটিশরাজের পুলিশ পথেই তাঁকে আটক করে বোম্বাই ফিরে যেতে বাধ্য করে। এদিকে সর্বত্রই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে গান্ধীজিকে পথেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ঘনীভূত হয়ে ওঠে অশান্তির কালো মেঘ। এইভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে—"A new leader with a new technique"—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁর অহিংস-অসহযোগ নীতির। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অমৃতসরের মানুষ সমবেত হন জালিয়ানওয়ালাবাগে। কিন্তু ওই বছর রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবং জেনারেল ডায়ারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও দিশেহারা পাঞ্জাবের মানুষ জমায়েত হওয়া সম্পর্কে দ্বিমনা ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের গুপ্তচর হংসরাজের মিথ্যা আশ্বাসে ভুলে কিছু মানুষ ১৩ এপ্রিলের পূর্ণিমা তিথিতে জালিয়ানওয়ালাবাগে উপস্থিত হয়েছিলেন। সভা শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল ডায়ার তাঁর বাহিনী নিয়ে বাগের প্রবেশ পথে উপস্থিত হয়ে কোনো রকম সংকেত না দিয়েই গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। তারপর গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দশ মিনিট ধরে অবিরাম ১৬০০ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ফলে সরকারি হিসেবেই ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০০ জন আহত হয়েছিল।

তবে প্রত্যক্ষদর্শী পাঞ্জাব চেম্বার অব কর্মাসের ভাইস-চেয়ারম্যান গিরিধারী লালের মতে এবং বেসরকারি কংগ্রেস কমিটির হিসেবে নিহত হয়েছিল এক হাজাব আর আহতের সংখ্যা দু-হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ৯ এপ্রিল রামনবমীর দিনে—গোপনে দুই জনপ্রিয় নেতা—ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্য পালকে গ্রেপ্তার করায় পাঞ্জাবের মানুষ গর্জে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ১৩ এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেলে সবকিছু গোপন রাখার জন্য আর পাঞ্জাবিদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে ১৫ এপ্রিল গভর্নর স্যার মাইকেল ও ডায়ার হঠাৎ সমগ্র পাঞ্জাবে মার্শাল-ল জারি করে দিলেন।

অমৃতসর শাসনের দায়িত্ব পড়েছিল জেনারেল ডায়ারের ওপর। আর লাহোরের শাসনভার পড়েছিল জেনারেল জনসনের ওপর। পাঞ্জাবের প্রতিটি সংবাদপত্রের ওপর পড়েছিল নিষেধাজ্ঞার কালো পর্দা। অবশিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে পাঞ্জাব যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

## অমানুষিক অত্যাচার ও অপমান

তারপর শুরু হল পাঞ্জাবের মানুষদের জীবনে ১১ জুন পর্যন্ত প্রায় দু-মাস ধরে অমানুষিক অত্যাচার ও অপমান সহ্য করার পালা। পথচারীদের উলঙ্গ করে পথের চৌমাথায় চাবুক মারা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পথচারীদের পশুর মতো চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে বুকে হাঁটা বা crawl করা। দীর্ঘপথ নাকে খৎ দেওয়া অবস্থায় অতিক্রম করতে বাধ্য করা। বেত্রাঘাতে জ্ঞান হারানোর পরও বালক ও কিশোর ছাত্রদের ওপর বেত্রাঘাত চালিয়ে যাওয়া। পথচারী কোনো ইংরেজকে দেখামাত্র—'হুজুর সেলাম'—বলে কুর্নিশ করা। জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করে রেখে দেওয়া।

পাঞ্জাবে ফৌজি শাসকদের নারকীয় অত্যাচারের বিন্দুবিসর্গও কোনো সূত্র থেকেই জানতে পারা যাচ্ছিল না। তাই ১৭ এপ্রিল তারিখে বিশ্বকবি দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজকে খবর জানতে দিল্লি পাঠালেন। দিল্লি থেকে অমৃতসর যাবার পথে তাঁকে আটক করে দিল্লি ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। অবশেষে এক মাস পরে হতাশ অ্যান্ড্রুজ সাহেব বিষণ্ণ মনে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন শূন্য হাতে। অবশেষে ২৭ মে তারিখে অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস পরে আশুতোষ চৌধুরীর কাছ থেকে খবর পেয়ে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ওই দিন রাত্রেই একটুও ঘুমোতে না পেরে ভানু সিংহের পদাবলীতে লিখলেন—"আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম সইতে পারি। কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আমার আর সহ্য হয় না। পাঞ্জাবের দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।"

পরের দিন ভোর না হতেই কাউকে কিছু না বলে—এমনকি পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও কিছু না বলে চলে এলেন কলকাতায়। ২৮ মে তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন যদি কোন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা যায় সেই আশা নিয়ে। আশায় আশায় দু-দিন কেটে গেল। কিন্তু কোন নেতার কাছ থেকেই কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া

গেল না। শেষপর্যন্ত ৩০ মে তারিখে সারা রাত জেগে বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ডকে একটা চিঠি লিখে কবি জানিয়ে দিলেন যে পাঞ্জাবের পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি 'নাইটহুড' বা 'স্যার উপাধি' প্রত্যাহার করলেন। একই সঙ্গে পত্রটির একটি বাংলা অনুবাদও করে ফেলেছিলেন। সেটিও পয়লা জুন তারিখেই *বসুমতী* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

চিঠিটিতে কবি লিখেছিলেন—"Your Excellency—পাঞ্জাবের এক স্থানীয় হাঙ্গামা দমনে যে অমানুষিক ও নিষ্ঠুরতম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসী মাত্রই কত অসহায় ও বিপন্ন। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে শাসনদণ্ড যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাও সভ্যতার ইতিহাসে একেবারেই নজীরবিহীন।"

"প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ও অন্ধ সরকারের কাছে এই মুহূর্তে আবেদনের কোনো মূল্য নেই বলে আমার পক্ষে সামান্যতম যা করণীয় তা হল অসহায় ও হতভাগ্য দেশবাসীদের নীরব প্রতিবাদকে সরব করে তোলা এবং সব রকম বিশেষ সম্মান ও উপাধি বর্জিত হয়ে নিপীড়িত কোটি কোটি দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানো। তাই মাননীয় বড়োলাটের কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন আমাকে 'স্যার' উপাধির গুরু ভার থেকে অব্যাহতি দেন। কেননা এই মুহূর্তে ওইসব বিশেষ সম্মান ও উপাধি যশের প্রতীক না হয়ে লজ্জা ও অপমানের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ......Yours faithfully, Rabindra Nath Tagore."

জ্ঞানতপস্বী অধ্যক্ষ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি বসুমতীতে প্রকাশিত চিঠিটির অনুবাদটি পাঠ করে কবির পদধূলি মাথায় নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তা শুনে বিশ্বকবি রামেন্দ্রসুন্দরের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হন। কবির মুখ থেকে মূল পত্রখানি শুনে অভিভূত রামেন্দ্রসুন্দর কবির পদধূলি মাথায় নিলেন। কিছুক্ষণ পরে কবি ফিরে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞান হারালেন। তাঁর চেতনা আর ফিরে আসেনি।

এলাহাবাদের *Independent* সহ ভারতের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি বিশ্বকবির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। কেননা, বিশ্বযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে আর 'Defence of India Act' (ভারতরক্ষা আইন) তখনও পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

বিলেতের কাগজগুলোর মধ্যে *Daily Herald* লিখেছিল—"কবি কোন মতেই প্রো-জার্মান বা অ্যান্টি-ব্রিটিশ নহেন। ভারতীয় নেতারা যে উপাধির খাতিরে তাঁহাদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিবেন না তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।" *Manchester Guardian* অত্যন্ত ব্যথিত ও বিস্মিত হয়ে লিখেছিল যে, কবি যেসব কথা বলিয়াছেন সে সম্পর্কে অবিলম্বে ভারত সরকারের তদন্ত করা প্রয়োজন।

*The East Anglican Times* লিখেছিল—"আমরা যদি এখুনি তদন্ত না করি তবে We are a disgraced people."

স্যার হাসান ইমাম পাটনা থেকে দোসরা জুন কবিকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—"Have just read your letter to Viceroy. Country will be not merely gratified but grateful for your noble protest in defence of her rights. Your action is as we expected. Please accept my most loving homage."

অমল হোম লিখেছিলেন—"চিঠিটা দিয়ে কবি যে কতখানি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজ কিছুতেই বোঝানো যাবে না।"

সাত বছর বয়সে স্বাদেশিক সভার সদস্য হতে যিনি বুক-চেরা রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করেছিলেন, মৃত্যুশয্যা থেকে মিস্ রাথবোনের অপমানকর খোলা চিঠির প্রতিবাদ না জানিয়ে যিনি থাকতে পারেননি, তাঁর গোটা জীবনটাই তো দেশের পরাধীনতার লজ্জা ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি তিনিই তো প্রথম সুরারোপ করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে কবি রচিত গানে ও কবিতায়-সুরে ও কণ্ঠস্বরে সারা বাংলায় যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজকের দিনে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না।

রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত লোকমান্য তিলকের জন্যে বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব তিনি একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে বাংলায় চলে আসার পর তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে লিখেছিলেন—"অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" আর সুভাষচন্দ্রের আপস-বিরোধী মতবাদকে স্বীকৃতি জানাতে তাঁকে (সুভাষচন্দ্রকে) দেশনায়কের পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাশের জীবনাবসান ঘটে গেলে দারুণ ক্ষোভ ও দুঃখে লিখেছিলেন—"সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ।"

১৯৩০-এ তাঁর রচিত *রাশিয়ার চিঠি*-তে কবি লিখেছিলেন "একবার রাশিয়া ঘুরে না এলে এ জীবনে তীর্থ দর্শনের সাধই অপূর্ণ থেকে যেত।"

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনায় সারা ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওই দিন হিজলি জেলে পুলিশের গুলিতে দুই রাজবন্দি—সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন প্রাণ হারান। পরের দিনই মনুমেন্টের নীচে এক বিশাল ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় যোগ দিতে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কবি শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে এসেছিলেন। আর হিজলির অন্যান্য রাজবন্দিদের উদ্দেশে লিখে পাঠিয়েছিলেন—"কোন কিছুতেই যাকে আবদ্ধ রাখা যায় না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরে অবারিত হোক।" এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পুনা-চুক্তি (Poona Pact) স্বাক্ষরিত হবার পর গান্ধীজি কবির হাত থেকেই কমলালেবুর রস পান করে তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। তাছাড়াও সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘেরও সভাপতির পদ তিনি বেশ কিছুকাল অলংকৃত করেছিলেন।

কবিই তো কালীমোহন ঘোষ, কেদারেশ্বর গুহ ও হীরালাল সেন প্রমুখ তিন বিপ্লবীকে চাকরিতে নিয়োগ করায় কবি পুলিশের খাতায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এমনকি খুলনা আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুশয্যা থেকে মিস্ রাথবোনের অপমানকর চিঠির প্রতিবাদ করে কবি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল ইংরেজ শাসনের গ্লানি ও অপমানের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। তাই তো অনুশীলন সমিতির প্রাণ-পুরুষ প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর কণ্ঠে চিরদিন ধ্বনিত হয়েছে—

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,<br>
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া—<br>
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে,<br>
তারই কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

কবি যে শেষপর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না, সেজন্য তাঁর দেশবাসীর আক্ষেপ ও বেদনা কোনোদিনও যাবার নয়।

ছয়

# স্বামী বিবেকানন্দ ও শিকাগো বিশ্বধর্মসভা

পরাধীনতার অন্ধকার যখন সমগ্র ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখন দেশবাসীদের জাগিয়ে তুলে যিনি তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তিনিই তো স্বদেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ। সেদিন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজিই বলেছিলেন—"Get up ! Oh lions and shake off the delusion that you are sheep." সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ সেদিন সমগ্র দেশ ও জাতিকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। তাই স্বামীজি বিদ্রূপের সুরে কশাঘাত হেনে বলেছিলেন—"আমরা হিন্দু নই, বৈদান্তিকও নই। আমরা সব ছুৎমার্গীর দল। আমাদের মন্দির হচ্ছে রান্নাঘর, দেবতা হচ্ছেন ভাতের হাঁড়ি। আর ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না হচ্ছে আমাদের বেদমন্ত্র।" ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতাকে বর্জন করে—ভেদবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ জাতি গঠনই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আজীবনের স্বপ্ন। তাই তো তিনি বলেছিলেন—"হে ভারত ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—তোমার রক্ত—তোমার ভাই।" এক কথায় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন জাতীয় সংহতির মূর্ত প্রতীক। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর "যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী"।

দেশের পরাধীনতা স্বামীজিকে এতই ব্যাকুল ও বিচলিত করেছিল যে তিনি সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন—"মনে রেখো পরাধীনতার মত অভিশাপ আর নেই। তাই এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হচ্ছেন জননী জন্মভূমি। তাঁর পুজো করো। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছু দিন ভুলে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। শুধু গীতা পাঠের মাধ্যমেই নয়, ফুটবল খেলার মধ্যে দিয়েও আমরা স্বর্গের নিকটবর্তী হতে পারি।" স্বামীজি বারবার বলেছেন দুর্বল জাতি কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করতে পারে না, স্বাধীনতা অর্জন তো অনেক দূরের কথা।

১৮৬৩-র ১২ জানুয়ারি। উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ভূমিষ্ঠ হলেন ভবিষ্যৎ ভারতের দীক্ষাগুরু স্বামী বিবেকানন্দ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত—প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। বীরেশ্বরের কৃপায় স্বামীজিকে কোলে পেয়েছিলেন বলে মা ছেলের নাম রেখেছিলেন—'বীরেশ্বর', তা থেকেই ডাক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল—বিলে। বাবার দেওয়া নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ।

দামাল ছেলের নিত্যনতুন দুরন্তপনায় পাড়াপড়শিরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 'শিবনাম' উচ্চারণ করা মাত্রই অমন দস্যি ছেলেও একেবারে শান্ত। তার ওপর

ছিল অদ্ভুত এক ধ্যানের নেশা। ছাত্রাবস্থা থেকেই শরীরচর্চা, খেলাধুলো, বিতর্ক, বক্তৃতা ও গানবাজনার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন।

অল্প বয়স থেকেই গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র পাঠ এবং প্রখর বিজ্ঞানবোধ তাঁকে প্রায় নাস্তিক করে তুলেছিল। বিশ্বাসের কোথাও কিছু খুঁজে না পেয়ে অশান্ত মন নিয়ে বেশ কিছুদিন ঘোরাফেরা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। কিন্তু তাঁর অবিশ্বাসী মন সেখানেও শান্তি পেল না। ঠিক ওই সময়ে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। একদিন ঠাকুর তাঁর এক ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে পদার্পণ করলে ঠাকুরকেই গান শোনাতে ওই মিত্রবাড়িতেই ডাক পড়েছিল সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথের। সেই থেকেই এক অদ্ভুত আকর্ষণে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে টানতে শুরু করে দেন। আর নরেন্দ্রনাথও সেই দুর্বার আকর্ষণে ধরা দিয়ে শেষমেশ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর স্বামীজি ভারত পরিভ্রমণে রওনা হন। তিনি ওই সময় পায়ে পায়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছিলেন। যেমন গিয়েছিলেন রাজার প্রাসাদে, তেমনি গিয়েছিলেন গরিবের কুটিরেও। তাই তো প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি (স্বামীজি) বলতে পেরেছিলেন—"নতুন ভারতবর্ষ বেরুক—চাষার কুটির ভেদ করে, গরীব, মালি, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মাঝ থেকে।"

দেশবাসীদের "শিবজ্ঞানে জীব সেবার" আর্দশে দীক্ষিত করার জন্য স্বামীজি বলেছিলেন—কেবলমাত্র নিজের মুক্তির জন্য ধ্যান বা তপস্যা নয়। বরং সেবার মাধ্যমে আর্ত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ মোচনই হোক জীবনের পরম লক্ষ্য। জীবকে বাদ দিয়ে অরূপ সুন্দর ঈশ্বরকে কখনও পাওয়া যায় না। তাই পরিশুদ্ধ মন নিয়ে আর মানুষকে ভালোবেসে জনগণের কল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়ার অর্থই হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে স্বীকার করে নিয়ে সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলা—

> বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
> জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

**এ শুধু কথার কথা নয়। এ হল জগৎ ও জীবনের শাশ্বত সত্য। নরের মধ্যে ঈশ্বরের সুনিশ্চিত অধিষ্ঠানের জন্যই তো তিনি নারায়ণ। লোকের মধ্যে দিয়েই তো লোকোত্তর পরম পুরুষের অভিনব প্রকাশ—**

> **যেথায় থাকে সবার অধম, দীনের হ'তে দীন,**
> **সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—**
> **সবার পিছে, সবার নীচে,**
> **সবহারাদের মাঝে।**

এমন সময় ১৮৯২ সালের শেষ দিকে খবর এল আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ বিশ্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠানের অয়োজন হচ্ছে। শেষপর্যন্ত কয়েকজন ভক্তের বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শিকাগোর পথে রওনা হয়ে গেলেন। গৈরিক পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত ওই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টার পরও পাঁচ মিনিটের বেশি ওই সভায় ভাষণ দেওয়াব অনুমতি পেলেন না। তবে ভাষণের শুরুতেই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সম্ভাষণ—"আমার আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ"—সৃষ্টি করল এক অলৌকিক ও অকল্পনীয় আলোড়ন। তারপর ঝড়ের মতো বিপুল হৃদয়াবেগে হিন্দুধর্মের মূল সূত্রগুলি অনবদ্যভাবে ব্যাখ্যা করে মুগ্ধ করে দিলেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে। ওই দিনই বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন যে, এই সনাতন হিন্দুধর্মই পারে বিশ্বের দুঃখহত মানুষকে প্রকৃত মুক্তি পথের সন্ধান দিতে। এত দিনে যেন পাশ্চাত্যের চোখে সর্বপ্রথম ভারত আবিষ্কৃত হল।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজি সাংগঠনিক কাজকর্মে মন দিলেন। ১৮৯৭-এ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় সেবা প্রতিষ্ঠান—'রামকৃষ্ণ মিশন'। ১৮৯৯-এ গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রতিষ্ঠিত হল আধুনিক ভারতের পুণ্য-তীর্থ বেলুড় মঠ। তারপর ১৯০০ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সভায় যোগ দিয়ে দেশে ফেরার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই মাত্র ৩৯ বছর ছয় মাস বয়সে সমাধিমগ্ন অবস্থাতেই ওই মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং ভারতাত্মার জ্যোতির্ময় প্রতীক। একদিকে তিনি যেমন চির অবহেলিত ভারতবর্ষেব প্রতি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, অন্য দিকে আবার ভারতবর্ষের সমাজজীবনে পুঞ্জীভূত যুগযুগান্তরের কুসংস্কার অপসারিত করে দেশবাসীদের দীক্ষিত করেছিলেন নবজীবনের অভীঃমন্ত্রে। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে কী যাদু ছিল জানি না—শুধু জানি—

যে শুনেছে কানে—
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন—
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন—
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো—

**শিকাগো বিশ্বধর্মসভা :** ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে শিকাগো আর্ট প্যালেসের বিশাল কলাম্বাস হলে ত্রিশ বছরের এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী সনাতন হিন্দু ধর্মের পক্ষে ভাষণ দিতে উঠলেন। একটা গম্ভীর নির্ঘোষ সহসা সকল শ্রোতার কর্ণকে বিমুগ্ধ করে বেজে উঠল—"আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ"। কথা দুটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত নরনারী উঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত আবেগে করতালি

দিতে লাগলেন। মনে হল স্বয়ং ঈশ্বর যেন আপন মহিমা কীর্তনের জন্য মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রিটিশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মহিমা উদ্ভাসিত হল নব চেতনায়।

সংবর্ধনার উত্তরে কয়েক মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণটি শেষ হতেই কবি ও সাংবাদিক শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরোর মনে হয়েছিল—"এই হল ইতিহাসের মহান লগ্ন—বাগ্মিতার চরম শিখর।" তাই তিনি লিখেছিলেন, "The handsome monk in the orange robe, gave us in perfect English, a master piece. It was human eloquence at its highest pitch"।

সমকালীন আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি এক বাক্যে স্বামী বিবেকানন্দকে শিকাগো বিশ্বধর্মসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে চিহ্নিত করে দিল। ড. শঙ্করী প্রসাদ বসুর ভাষায়, "স্বামীজীর অসাধারণ সুন্দর চেহারা, বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব, বর্ণোজ্জ্বল পোশাক, ব্রোঞ্জের ঘণ্টা-ধ্বনির মত অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং অনবদ্য বাচনভঙ্গীর প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমেরিকান প্রেস প্রণাম জানিয়েছিল তাঁর বিষয়বস্তুর উদার মহিমাকে। যেখানে অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরা বলেছিলেন কেবল নিজ নিজ ধর্মের কথা সেখানে স্বামীজি বলেছিলেন সর্বজনীন বিশ্বধর্ম বা মানব ধর্মের কথা।"

স্বামীজির বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের সেরা বৈজ্ঞানিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী ও যাজকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। তাঁরা বিবেকানন্দের কাছে শুনলেন যদি পৃথিবীতে কখনও সর্বজনীন বিশ্বধর্মের উদ্ভব হয় তবে তা কেবলমাত্র বেদ, বাইবেল ও কোরানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বেদ, বাইবেল ও কোরানকে গ্রহণ করেও তা অনেক এগিয়ে যাবে। যেহেতু সর্বজনীন বিশ্বধর্ম গ্রন্থের পৃষ্ঠার কোনো শেষ নেই।

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই বিশাল কলাম্বাস হল দেশ-বিদেশের ৬/৭ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকে পূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক বেলা দশটার সময় বারোটি ধর্মের প্রতিনিধিরা হাত ধরাধরি করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। মঞ্চটি ওই সময় ছবির মতো চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করেছিল। ঠিক মাঝখানে উদ্বোধক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গির্জার প্রধান—কার্ডিনাল গিবন্স এবং প্রধান অতিথি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মি. বনি নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির দুপাশে বসেছিলেন প্রাচ্যের প্রতিনিধিবর্গ। ব্রহ্মা, বুদ্ধ ও মহম্মদের ভক্তদের মধ্যে বসেছিলেন তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দুপাশে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বি. বি. নাগরকার এবং সিংহলের বৌদ্ধ পণ্ডিত—ধর্মপাল। ধর্মপালের ঠিক ডান পাশে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আর এক দিকপাল রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। মুসলমান, জৈন ও পার্সি ধর্মযাজকরা নিজ নিজ বিচিত্র বর্ণের পোশাকে সজ্জিত হয়ে মঞ্চেই উপবিষ্ট ছিলেন। জাপান ও চিনের প্রতিনিধিরা ইন্দ্রধনুর মতো বিচিত্র বর্ণের পোশাকে শোভা পাচ্ছিলেন। আর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি—গ্রীক ধর্মযাজক—

জাস্তে—আবক্ষ-লম্বিত শুভ্র দাড়ি, অদ্ভুত একটা টুপি, বাঁকানো একটা লাঠি এবং বিশাল একটা ক্রুশের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের বিখ্যাত যাজক রেভাঃ আর্নেটিও মঞ্চেই আসন গ্রহণ করেছিলেন। (পত্রাবলী)

বক্তাদের তালিকায় স্বামীজির স্থান ছিল ত্রিশ। ভাষণের জন্য তাঁকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল। সময় উপস্থিত হলে—"এখন নয়—একটু পরে" বলে কয়েকবার সময় নিলেন। যখন তাঁকে বলা হল—"এবার না বললে আর সুযোগই পাবেন না।" তখন অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন। মুখমণ্ডল রক্তিম, সামনে গভীর ও বিশাল জনসমুদ্র। (পত্রাবলী)

সংবর্ধনার উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন—"আজ আপনারা আমাদের যে সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন তার উত্তর দিতে উঠে আমার হৃদয় অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে আপনারাও জেনে রাখুন যে, আমি পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকেই আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে ধর্ম জগৎকে চিরদিন পরমত-সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়েছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। আরও জেনে রাখুন যে সনাতন হিন্দুধর্ম শুধুমাত্র পরমতসহিষ্ণুতাই শিক্ষা দেয়নি বরং অন্য সব ধর্মকেও সত্য বলে স্বীকার করে নিতে শিখিয়েছে, যে জাতি অতীতে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ইহুদি ও পারসিদের আশ্রয় দিয়েছিল, আমি সেই হিন্দু জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি বলে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি।

আসলে সংকীর্ণ মনোভাবই মানুষে মানুষে হানাহানির প্রকৃত কারণ। যেহেতু আমি হিন্দু তাই আমি হিন্দুধর্মের ক্ষুদ্র কূপে বসে ভাবছি এটিই বিশ্বজগৎ। ঠিক তেমনি একজন খ্রিস্টান বা একজন মুসলমানও নিজ নিজ ধর্মের ক্ষুদ্র কূপে বসে ভাবছেন যে তাঁদের ধর্মের চেয়ে মহান আর কিছুই থাকতে পারে না এ জগতে।

ভিন্ন ভিন্ন নদীর উৎস ভিন্ন স্থানে। কিন্তু তারা একই সমুদ্রে ঢেলে দেয় তাদের জলরাশি। আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে, রুচির পার্থক্য হেতু যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করেন একমাত্র ঈশ্বরই তাঁদের সকলের লক্ষ্য ও আশ্রয়স্থল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'হে অর্জুন যে যেভাব আশ্রয় করেই আমার কাছে আসুক না কেন আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি।' প্রতিটি ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই জন্মেছেন কত উন্নত চরিত্রের নর-নারী। তাই কোন ধর্মই অন্য কোন ধর্মের চেয়ে ছোটো বা বড়ো হতে পারে না। এজন্য আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতেই লেখা হবে—বিবাদ নয়—সহায়তা, বিনাশ নয়—পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয়—সমন্বয় ও শান্তি। আর এই বিশ্বধর্ম সভার মূল মন্ত্র হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

হিন্দুধর্ম বলে যা কিছু সত্য তাই হল বেদ। আর বেদই হল হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আমি যতই বেদ পাঠ করছি ততই আমার ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে আধ্যাত্মিকতার উৎসই হল ভারতবর্ষ। আর হিন্দুধর্মই সর্বপ্রথম সকল বিশ্ববাসীকে—'অমৃতের সন্তান' বলে

সম্বোধন করেছে এবং আরও বলেছে যে, 'তোমার ও আমার মধ্যে একই শক্তি বিদ্যমান। সেখানে নেই কোনো ঘৃণা—নেই কোনো বিরোধ—নেই কোনো ভেদবুদ্ধি।'

পাশ্চাত্যের পাপবাদ সম্পর্কে বলতে চাই যে, পাপ কথাটা উচ্চারণ করাই হল পাপ। কেননা পাপ বলে কিছুই নেই এ জগতে। আর তাই পাপীও কেউ থাকতে পারে না এ পৃথিবীতে। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের অন্তরে লুকিয়ে আছে সততা ও পবিত্রতার বীজ। অতএব স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট দণ্ডধারী ঈশ্বর ও অনন্ত নরকের চিন্তাধারাটাই সকলের মন থেকে মুছে ফেলা উচিত।

শিকাগো বিশ্বধর্মসভার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে ১৭ দিন ধরে চলেছিল আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ। ১৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজি তাঁর মূল বক্তব্য রেখেছিলেন হিন্দুধর্মের ওপর। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনের দিনে যখনি প্রাচ্য সন্ন্যাসী তিনি নারীকে প্রথম স্থান দিয়ে সমগ্র আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীদের ভগ্নী ও ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছিলেন তখুনি ওই বিশ্বধর্মসভায় এক অনাবিল ও অকল্পনীয় আনন্দের শিহরণ সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। তখন তো বটেই পরেও বহুবার শ্রোতৃমণ্ডলী স্বীকার করেছিলেন, আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিত্ব নারীকে প্রথম স্থান দিয়ে ওইভাবে সম্বোধন করার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না।

শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমেই বিবেকানন্দ হঠাৎ দিবাকরের মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। "নরেন জগৎ মাতাবে" শ্রীরামকৃষ্ণের ওই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে গেল। দেহরক্ষা করার তিন দিন আগে ঠাকুর আপন আধারে রক্ষিত সকল তেজোরাশি মানসপুত্র নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। আর নরেন্দ্রনাথও সেই তেজোরাশি শুধু নিজের মধ্যে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হলেন না—সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রকে জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠা করলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলি অর্থ ও শক্তির দম্ভে নিজ নিজ ধর্মের সঙ্গে প্রাচ্যের দেশগুলির ধর্মের সমতা স্বীকার করে নিতে একেবারেই রাজি নয়, ঠিক সেই সময় শিকাগো বিশ্বধর্মসভার অনুষ্ঠান বাস্তবিকই ধর্মের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্বামীজি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে শিকাগো বিশ্বধর্মসভা বাস্তবিকই ছিল এক অসাধারণ ঘটনা। মেরি লুই বার্ক বলেছিলেন—"The Parliament, was, indeed, a unique phenomenon in the history of religions" তাই Max Muller মনে করেন যে ওই বিশ্বধর্মসভা ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতই না যদি না ওই একই মঞ্চে বিবেকানন্দের মতো এক বিশ্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটত। রোমা রঁলা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, সমবেত হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দ একাই আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন।

বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামীজির প্রথম আবির্ভাবের রূপটি বিবৃত করতে প্রত্যক্ষদর্শী অ্যানি বেশান্ত বলেছেন যে, "মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যেও ছিল মর্যাদা, যোগ্যতা ও শক্তির

দ্যোতনা। কিন্তু সব কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিবেকানন্দের দ্বারা আনীত অধ্যাত্ম বাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে।".... বেশান্ত স্বামীজির মধ্যে দেখেছিলেন—"সত্যের পক্ষে সংগ্রামী এক মহান যোদ্ধাকে।" যখনি স্বামীজি মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেন তখুনি বেশান্তের মনে হত বিবেকানন্দ বুঝি 'অনন্তের দিশারী'।

শত্রুপরিবেষ্টিত বিদেশে স্বামীজির নির্ভীক সংগ্রাম লক্ষ করে বিখ্যাত অস্ত্র নির্মাতা বৈজ্ঞানিক স্যার হিরম ম্যাক্সিস বলেছিলেন যে, "ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—যাঁর ব্রহ্মাস্ত্র হল বেদান্তের ব্রহ্মবাণী।" আর বেদান্তের ওই ব্রহ্মবাণীর মধ্যেই টলস্টয় দেখেছিলেন—"মানব প্রজ্ঞার শিখর।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই বিশ্বজয়ে গোটা দুনিয়া যখন রোমাঞ্চিত তখন মুগ্ধ ও অভিভূত রবীন্দ্রনাথ তাঁর "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় লিখেছিলেন—

ওরে তুই ওঠ আজি—
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি?
জাগাতে জগৎ-মনে।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর স্বামীজির বন্দনা গানে লিখেছিলেন—

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর
চির গৈরীক ধারী
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ
ব্রত সহায়কারী।।
যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম
তুমি তেজস্বী তাপসপরম
ভারত অরিন্দম নমো নমো
বিশ্বমঠ বিহারী।।
মদগর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী, ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি
নব ভারতে আনিলে তুমি নববেদ
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা
জানাইলে হুঙ্কারি।। (বনগীতি)

ভারত সাধক স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ,

মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বিপ্লবী সূর্য সেন প্রমুখ দেশসেবকদের জীবনে স্বামীজীর অবদান অপরিসীম। তাঁদের জীবনের পথপ্রদর্শক এবং আদর্শপুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, "আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকে তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি বুঝতে পেরেছি। মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ, মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও সেবা বুঝেছিলেন।"

স্বামী আত্মবোধানন্দজি লিখেছেন—স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় জুড়ে ছিল ভারতবর্ষ। তাঁর হৃদয় স্পন্দনের তালে তালে অনুরণিত হত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ তাঁর আবেগের কেন্দ্রবিন্দু, ভারতবর্ষ তাঁর প্রাণসত্তা, ভারতবর্ষ নিত্য প্রতিধ্বনিত হত তাঁর ধমনীতে। তাঁর দিবাস্বপ্নে স্পন্দিত হত ভারতবর্ষ, নিশীথের স্বপ্নে উদ্ভাসিত হত ভারতবর্ষ। ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন 'ভারতআত্মা'।

পরিশেষে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী। ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ণ তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক। আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পিতা। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতা লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সব কিছুর জন্য তাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ঋণী।"

## তথ্যসূত্র

১. *The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples,* (Vol. I & II) Advaita Ashrama.

২. *The Complete Works of Sister Nivedita,* (Vol. I-IV)

সাত

# লোকমাতা নিবেদিতা

লোকমাতা নিবেদিতা ছিলেন নব্যবঙ্গের মধ্যমণি। প্রবীণ ও নবীন সকলেই তাঁর ভারত-প্রীতিতে মুগ্ধ। তাই তাঁকে কেন্দ্র করেই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও রাজনীতিবিদ্ সকলেই বাংলার পুনর্গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। সেই সময় এমন কোনো প্রবীণ বাঙালি ছিলেন না যিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেননি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু ও অশ্বিনীকুমার দত্ত তখন ছিলেন প্রবীণ দলভুক্ত। নিবেদিতা যেমন তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তেমনি আবার নব্যবঙ্গের পুরোধা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরাও নিবেদিতার গুণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ওই সময় যুব-ছাত্ররাও—বিনয়কুমার সরকার, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখও তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই নিবেদিতাই হলেন নব্যবঙ্গের অন্যতম স্রষ্টা।

ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম—মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের একটি ক্যাথলিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন স্কচ। নাম—স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল। মা ইসাবেলা ছিলেন আইরিশ। মার্গারেটের পর আরও দুটি কন্যাসন্তান হয়েছিল তাঁদের।

মার্গারেটের জীবনের প্রথম চার বছর কাটে মাতামহীর কাছে আয়ারল্যান্ডে আইরিশ পরিবেশের মধ্যে। তারপর বাবা-মার কাছে লন্ডনে চলে আসেন। হ্যালিফ্যাক্স কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষাব্রত গ্রহণের জন্য যখন তিনি মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় বাবা রিচমন্ডের আকস্মিক মৃত্যুতে কেমউইকের একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শিক্ষার কাজে যুক্ত হয়েই তিনি যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পান। ওই সময়েই তাঁর জীবনে অন্য আর এক অনুভূতিও এসেছিল। গেলোয়া নামে এক আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দুজনে একসঙ্গে এমার্সন ও রাসকিন নিয়ে পড়াশোনা করতেন। পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। তাঁদের দুজনের বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু গেলোয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে চেস্টারের একটা স্কুলে যোগ দেন। ওখানকার সানডে ক্লাবে যোগ দিয়ে সাহিত্যিকদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে লেখালেখির দিকে ঝোঁক হয়। দু-বছর পরে এক

বান্ধবীর আমন্ত্রণে লন্ডনের উইম্বলডনের নিউ স্কুলে চলে আসেন। এখানে শিশুদের পড়াতে তাঁর বেশ ভালো লাগে। শিশুদের জীবন গঠনে নিযুক্ত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে জীবনের একটা অর্থ যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। উইম্বলডনেও আর একটি যুবকের সঙ্গে মার্গারেটের ঘনিষ্ঠতা হয়। তবে দীর্ঘ পনেরো মাস মেলামেশার পর ওই যুবকটি তার পূর্ব-প্রণয়িনীকে বিবাহ করলে মার্গারেট দারুণ আঘাত পান। তারপরই তিনি উইম্বলডনের দীন-দরিদ্রদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেন।

ক্রমে শিক্ষকতাই তাঁর জীবনের ব্রত বা ধর্ম হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দুই বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেস্টাল্যাসি ও ফ্রয়বেলের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন তিনি এক নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিটি কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ ছিল। স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য তিনি উইম্বলডন ছেড়ে রাসকিন স্কুলে যোগ দেন। রাসকিন স্কুলে পড়াতে পড়াতেই ম্যাকনিল নামের একটি যুবকের সাহায্যে লন্ডনে সিসেম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবীদের মজলিসে পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও সিসেম ক্লাব মার্গারেটের নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচারেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আর ঠিক ওই সময়েই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শোনারও প্রথম সুযোগ পান। তবে ইতিমধ্যেই মার্গারেট হয়ে উঠেছেন একাধারে শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক, লেখিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবিকা ও বন্ধু। আর স্বামী বিবেকানন্দের সংশ্রবে আসার আগেই তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা এবং আয়ারল্যান্ডের হোমরুল আন্দোলনের লন্ডন শাখার অধ্যক্ষা।

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসের এক হিমশীতল রবিবারের সন্ধ্যায় তিনি হিন্দুযোগীর বেদান্ত বিষয়ক ভাষণ শুনতে ওয়েস্ট এন্ডে E.T.Sturdy-র বাড়ি যান। প্রথম দিনের আলোচনার মধ্যেই তিনি একটি নতুন মন ও অপূর্ব সংস্কৃতির বাণী শুনতে পান। (Message of a new mind and a strange culture)। ওই সময়েই আরও দুবার স্বামীজির ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরেই স্বামীজি আমেরিকা ফিরে যান। তবে ১৮৯৬ সালের এপ্রিলেই আবার লন্ডনে ফিরে আসেন। আর ওই দ্বিতীয়বার লন্ডন অবস্থানকালেই নিবেদিতা স্বামীজির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং মনে মনে তাঁকে গুরু বা আচার্য বলে বরণ করে নেন। তাঁর লেখা *The Master as I saw him* গ্রন্থটিতে তিনি লিখেছেন যে স্বামীজি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতেন না। তিনি এমনভাবে বেদান্তের সারতত্ত্ব শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতেন যে তা সব ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেই সহজে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হত। তবে তাঁর বক্তব্য ভারতবর্ষের পৃথক পৃথক যুগের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে সকলেরই মন ভারতের দিকে সহজেই আকৃষ্ট হত। স্বামীজির আলোচনা বিদুষী মার্গারেটের মনে দোলা দিয়েছিল। স্বামীজি একদিন কথায় কথায় নিবেদিতাকে বলেছিলেন—"I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be of great help to me"।

মার্গারেট লিখেছেন স্বামীজির ওই কথার মধ্যেই তিনি এমন এক আহ্বান শুনতে পান যে তাঁর জীবনের ধারাটাই সম্পূর্ণরূপে পালটে যায় এবং মনে মনে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে চলে আসার সংকল্প গ্রহণ করেন। অবিশ্বাসী নরেনকে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অদ্ভুত ভালোবাসার বন্ধনে জয় করে নিয়েছিলেন। বিধর্মী মার্গারেটের ক্ষেত্রেও স্বামীজি যেন একই ব্যাপার ঘটিয়ে দিলেন।

তাঁর সংকল্পের কথা তাঁর মা ইসাবেলাকে কিছুতেই জানাতে পারছিলেন না মার্গারেট। একদিন হঠাৎ বলেই ফেললেন—

মার্গারেট—"মা, আমি ভারতবর্ষে যাব, তুমি অনুমতি দাও।"

ইসাবেলা—"বেড়াতে যাবি বুঝি?"

মার্গারেট—"না, মা, বেড়াতে নয়, আমি স্থায়ীভাবেই ভারতবর্ষে চলে যাব। ওদেশে নতুন করে জন্ম নিয়ে ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো মা।"

ইসাবেলা—"কার সঙ্গে যাবি?"

মার্গারেট—"আমার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে।"

ইসাবেলা—"ও, সেই হিন্দু যোগীর সঙ্গে? এত আমার মস্ত সৌভাগ্য। তবে শোন, তোর জন্মের আগেই আমি তোকে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে দিয়েছি। আর ভারতবর্ষ তো শুনেছি ধর্মেরই দেশ, তবে কথা দিয়ে যা মা, যেখানেই থাকিস আমার অন্তিম সময়ে নিশ্চয় একবার দেখা দিয়ে যাবি।"

ইসাবেলা সর্বান্তকরণে মেয়েকে স্থায়ীভাবে ভারতে যাবার অনুমতি দিলেন। মার্গারেট সর্বপ্রথম জানতে পারলেন যে মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই তাঁর জীবনের গতি ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন।

## প্রথম কলকাতায়—প্রথম ভাষণ স্টার থিয়েটারে

কলকাতায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীজীর সভাপতিত্বে উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারে (১১/৩/১৮৯৮) মার্গারেট 'The influence of Indian spiritual thought in England' বিষয়ের ওপর ভাষণ দিয়ে কলকাতার মানুষদের মন জয় করে নিলেন। তাঁর ভাষণ শেষ হতে স্বামীজি স্বয়ং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—"ভারতকে দেওয়া ইংল্যান্ডের আর একটি উপহার।" ওই ঘটনার মাত্র পাঁচদিন পরে (১৬/৩/১৮৯৮) ১৬ মার্চ তারিখে স্বামীজি স্বয়ং তাঁকে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নামকরণ করলেন—নিবেদিতা। ভারতের সেবায় নিবেদিত তাই নিবেদিতা। প্রথমত, ফুল হয়ে তিনি ভারতমাতার চরণে তিলে তিলে শুকিয়ে যাবেন। দ্বিতীয়ত, ধূপের মতো পলে পলে নিজেকে জ্বালিয়ে করবেন ভারতমাতার আরতি। তৃতীয়ত, প্রদীপের মতো তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবেন নিজের

অস্তিত্বকে। এই হল নিবেদিতা নামের প্রকৃত অর্থ। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" শুধুমাত্র এই মন্ত্রের গুণে আইরিশ দুহিতা মার্গারেট নোবল হলেন ভারত দুহিতা নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথকে যে কারণে বিবেকানন্দ হতে হয়েছিল, ঠিক সেই কারণেই মার্গারেটকেও নিবেদিতা হতে হয়েছিল—আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্য। সে আদর্শের কেন্দ্রবিন্দুই হল মানুষ। মানুষই স্বামীজির কাছে ভগবান। মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন চিরদিন। আব ওই মানব সেবার মন্ত্রেই দীক্ষা দিলেন তাঁর শিষ্যাকেও—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

## দীক্ষা গ্রহণের পর

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই নিবেদিতা ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করে কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করে দিয়েছিলেন। আচার-আচরণে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠতে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হয়নি। তিনি কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের বোসপাড়া লেন ও তার আশেপাশের পথ-ঘাট পরিষ্কারেও হাত লাগিয়ে দিতেন। কলকাতায় প্লেগের মহামারি দেখা দিলে প্লেগ-রোগাক্রান্তদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বোসপাড়া লেন ছেড়ে অন্য কোথাও একদিনের জন্যও থাকতে পারতেন না। তাঁর মুখের কথাই ছিল—"The lane has adopted me and I must stay here and nowhere else."

## উত্তরভারত পরিক্রমা

নিবেদিতাকে দীক্ষিত করার প্রায় পৌনে দু-মাস পর ৬ মে তারিখে নিবেদিতা ও কয়েকজন গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি উত্তরভারত পরিক্রমায় রওনা হয়ে যান। তারপর প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পরে ১৮ অক্টোবর তারিখে সদলবলে বেলুড়ে ফিরে আসেন। স্বামীজির ব্যক্তিগত জীবন ও দরদি মনের পরিচয় খুব কাছ থেকে নিবেদিতা পেয়েছিলেন এই সময়েই। ওই সময় অনেকেই মনে করেছিলেন যে নিবেদিতা স্থায়ীভাবে ভারতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় স্বামীজি বালিকা বিদ্যালয় খুলে দেবেন। কিন্তু দেখা গেল স্বামীজি উপযুক্ত সময়েরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। উত্তরভারত পরিক্রমাকালে কাশ্মীরের এক তাঁবুতে স্বামীজি সর্বপ্রথম নিবেদিতাকে বালিকা বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে তিনি কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন কিনা প্রশ্ন করেন। তখন নিবেদিতা প্রাণাধিকপ্রিয় ভারতীয় কন্যাগণকে জাতীয় ভাবধারায় শিক্ষিতকরণ ও তাদের সার্বিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে কীভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করতে চান তা স্বামীজিকে বুঝিয়ে বলেন। তারপর উত্তরভারত পরিক্রমার পর বেলুড়ে ফিরেই স্বামীজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে কালীপুজোর দিনে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে বালিকা বিদ্যালয়টির উদ্বোধন হয়। সংঘমাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হতেই তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়ে দেন এবং ওই দিনই দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। পরে ওই বিদ্যালয়টি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় নামে নামাঙ্কিত হয়। স্বামীজি দেহরক্ষা করার এক বছর পরে পরে ১৯০৩ সালের শরৎকালে স্বামীজির মার্কিনি মহিলা শিষ্যা মিস ক্রিস্টিনা স্কুলের কাজে নিবেদিতার সহকারিণী হন। বলাবাহুল্য স্কুলটির পরবর্তীকালের সাফল্যের ক্ষেত্রে মিস ক্রিস্টিনার কৃতিত্ব বড়ো কম ছিল না।

## দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ

নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৯-এর ২০ জুলাই স্বামীজি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে রওনা হয়ে যান। জাহাজ লন্ডনে পৌঁছোয় ৩১ জুলাই তারিখে। নিবেদিতা ইতিমধ্যেই কলকাতায় অবস্থানকালে এবং উত্তরভারত পরিক্রমার সময়ে তাঁর গুরুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। স্বামীজির এই দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের সময় জাহাজে নিবেদিতা তাঁর গুরুর সান্নিধ্য আরও কাছ থেকেও পূর্ণভাবে পান এবং সমস্ত অন্তর দিয়ে গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হন। তিনি নিজেই লিখেছেন—"Thus I received one long and continuous impression of his mind and personality, for which I can never be sufficiently thankful."

১৯০০ সালে আমেরিকায় F. J. Alexander নামে এক তরুণ সাংবাদিক কোন এক সংবাদপত্রের তরফ থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে অবাক বিস্ময়ে লেখেন—"I lost myself in that short space of time in admiration, forgetting my time and my surroundings in spell bound attention to her words." (*Modern Review*—Aug. 1912)। ১৯১২ সালের মধ্যেই নিবেদিতা যে সর্বপ্রকার ভারতীয়ত্বের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা ওই তরুণ আমেরিকান সাংবাদিকের লেখা থেকে জানতে পারি।

১৯০০ সালের ২ এপ্রিল তারিখে নিবেদিতা "The project of the Ramakrishna School for girls" শীর্ষক একখানি অনুষ্ঠানপত্র রচনা করে প্রকাশ করেন। ভারতীয় নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা কী ধরনের হওয়া উচিত তারই বিশদ আলোচনা ছিল ওই রচনাটির মধ্যে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের সিসেম ক্লাবে ১৯০০ সালের বাইশে অক্টোবর তিনি "ভারতীয় জীবনের নতুন ব্যক্তিত্ব" সম্পর্কে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ওই সময়েই নরওয়ে-নিবাসিনী মিসেস ওলিবুল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর ও ঐকান্তিক ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেন।

ওই সময়ে তিনি আর একজন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইনি হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর স্বদেশপ্রেমের গভীরতায় ও ঐকান্তিকতায় নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরই সঙ্গে একই জাহাজে নিবেদিতা ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে

ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন। কলকাতা ফেরার পথে জাহাজটি প্রথমে মাদ্রাজে পৌঁছোয়। মাদ্রাজের জনগণ তাঁদের দুজনকে অভিনন্দন জানাতে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। ওই সভায় নিবেদিতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন—"I felt unspeakable joy that you should have thus accorded your hearty greetings to a lady, who is now one of us, who lives our life, shares our joys and sorrows, partakes of our trials and troubles and labours with us in the cause of our Motherland." (*Life and Works of Ramesh Chandra Dutta*, p. 297)।

## স্বামীজির দেহরক্ষা (৪ জুলাই ১৯০২)

কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা আবার তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। এ যে তাঁর গুরু বিবেকানন্দের নির্দেশিত কাজ। আর স্বামীজির ইচ্ছা ও উপদেশ তো তাঁর কাছে ছিল ঈশ্বরাদেশ। তবে দুর্ভাগ্য তাঁর স্বামীজির শিক্ষা ও উপদেশ লাভের সুযোগ আর কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজি বেলুড় মঠেই সমাধিমগ্ন অবস্থাতেই দেহরক্ষা করলেন। খবর পেয়েই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন নিবেদিতা। তারপর যতক্ষণ স্বামীজির মরদেহ চিতায় না ওঠানো হয় ততক্ষণ পাশে বসে হাওয়া করে গেলেন। স্বামীজির চিতায় প্রথম অগ্নি-সংযোগও করেছিলেন নিবেদিতাই।

## মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন। কোন সংঘের অন্তর্ভুক্ত থাকলে ওই স্বাধীনতার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে স্বামীজির দেহরক্ষার ১৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৮ জুলাই তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠির মাধ্যমে নিবেদিতা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এখন থেকে মঠের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক থাকছে না। নিবেদিতা আরও মনস্থ করেন যে এখন থেকেই স্বামীজির কাছ থেকে যে সেবা-ধর্মের শিক্ষা পেয়েছেন তার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করবেন সকল ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে। তাই এখন থেকে ভারত-ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, গ্রন্থ-রচনা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হবেন।

## ভারতীয় শিল্প-কলার উন্নতি

ইউরোপীয় শিল্প-কলার সঙ্গে নিবেদিতার ভালোই পরিচয় ছিল। স্বামীজির সঙ্গে উত্তরভারত পরিক্রমার সময় ভারতবর্ষের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ললিত-কলা স্বচক্ষে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর ভারতপ্রীতি সর্বাগ্রে ভারতীয় শিল্পকলার উন্নয়নে নিয়োজিত হয়েছিল।

১৯০২ সালে জাপান থেকে কাউন্ট ওকাকুরা চিত্রকর তাইজোযানকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলেন। ইতিমধ্যেই ওকাকুরা তাঁর *Ideals of the East* গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, এশিয়া কোন ক্ষেত্রেই ইউরোপের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই ইউরোপেরই শিক্ষাগুরু। ওকাকুরার গ্রন্থের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন—"প্রাচীন মানব-সভ্যতার প্রসূতিগার এশিয়া চিরদিনই এক ও অখণ্ড এবং ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি।" মোটকথা ওকাকুরাও ওই সময়ে নব্যবঙ্গে যে সাড়া জাগিয়ে দেন শিল্পকলার ক্ষেত্রে নিবেদিতারই কৃতিত্বে তা স্থায়ী হয়েছিল।

## অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার ওই মন্তব্যে নতুন করে দীক্ষা নিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মানসপুত্র নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে নিবেদিতাই উদ্যোগী হয়ে অজন্তা গুহা চিত্রাবলি নকল করতে পাঠিয়েছিলেন। মোটকথা ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নিবেদিতার দান অসামান্য ছিল। ১৯০২ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত নিবেদিতা একাই অবনীন্দ্রনাথের ও অসিত, নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের বহু চিত্রের লিপিভাষ্য *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় রেখে গেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহ ও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সুচিত্রিত প্রাচীর ও ছাদ আজও নিবেদিতার স্মৃতি বহন করছে। জগদীশচন্দ্রের গৃহের দেওয়ালে ভারতমাতার চিত্র নিবেদিতার ইচ্ছেতেই আঁকা হয়েছিল। মূলত নিবেদিতার ইচ্ছে ও প্রেরণাতেই অবনীন্দ্রনাথ নতুন পথের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই ক্যানভাসে আঁকা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র বিসর্জন দিয়ে আঁকতে শুরু করতেন—কৃষ্ণলীলা, রূপকথার নায়ক-নায়িকা, বুদ্ধ ও সুজাতা, এবং ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলি।

বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের কাছে পাথরের বজ্রচিহ্ন দেখে নিবেদিতা যে ব্যাখ্যা দেন তা যদুনাথ সরকার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন—"Seeing that mark, Nivedita remarked, this sign of the thunder should be adopted as the national emblem of India. Its significance is that when a man gives up his all for the good of humanity, he becomes as powerful as the thunderbolt for the work of the Gods"। অর্থাৎ নিবেদিতার মতে ওই বজ্রচিহ্নটি ভারতবর্ষের জাতীয় চিহ্ন বা প্রতীক হওয়ায় দাবি রাখে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য যিনি সব কিছু বিলিয়ে দেন, তিনি ওই বজ্রটির মতো শক্তির অধিকারী হন। শোনা যায় স্বয়ং ইন্দ্র গৌতম বুদ্ধকে ওই বজ্রটি দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও তাঁর রচিত বইগুলিতে ওই বজ্রচিহ্ন ব্যবহার করতেন।

## সাহিত্য সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা

ভারতীয় শিল্পকলা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও নিবেদিতার ওই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ তাঁকে দিয়েই সংশোধন করিয়ে

নিয়েছিলেন। বাংলার গ্রাম ছাড়াও পল্লিগাথা সম্পর্কে নিবেদিতার কীরকম উচ্চধারণা ছিল তা দীনেশচন্দ্র সেনকে নিবেদিতার লেখাতেই ধরা পড়েছে—"আপনি কৃষকদের গান অবজ্ঞা করিবেন না। তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে। আর তাঁদের কুঁড়ে ঘরে সোনা-রূপার থাম না থাকিলেও আঙ্গিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।" (*ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, পৃঃ ৩৭০-৩৭২)

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ ভ্রমণের সময় (১৯০৪) কৃষক নারী-পুরুষদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, গানবাজনা, তাঁর এত ভালো লেগেছিল। পল্লি নরনারীদের স্বহস্তে তৈরি সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের দোলাই, কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, পাখা, লাঠি ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বাংলার নরনারীর প্রাণের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বলেই নিবেদিতার পক্ষে *The Web of Indian Life* (ভারতীয় জীবনের বুনন) রচনা সম্ভব হয়েছিল।

শুধু শিল্প ও সাহিত্যেই নয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির গবেষণাতেও ভারতীয়দের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করতে হবে এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে দেখে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। গবেষণা সম্পর্কে তাঁর একটি মৌলিক ধারণাও ছিল। তিনি বলতেন বিজ্ঞানের যিনি গবেষণা করবেন তাঁকে অবসর সময় ইতিহাসও পড়তে হবে। আর যিনি ইতিহাসের চর্চাতেই ব্যস্ত থাকেন তাঁকেও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলো ভালোভাবেই জেনে রাখতে হবে।

ইতিহাসের গবেষকদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, "যখনি আমরা কোনো বিষয়ের ওপর গবেষণা করব তখনি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন ওই বিষয়ের authority হিসেবে সম্মান আদায় করে নিতে পারি।" তিনি আরও বলতেন "যদুনাথ যেমন প্রত্যেকটি বিষয়ের মূল দলিলাদির সন্ধানে প্রবৃত্ত সেই রকম প্রত্যেক ইতিহাস গবেষককে বিষয়টির মূলে পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে হবে। তবেই তিনি দেশ ও জাতির সত্যকার ইতিহাস রচনায় সক্ষম হবেন।" বাস্তবিকই যদুনাথ সরকার যখন মূল ফার্সি ভাষার পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁকে নিবেদিতা দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের গবেষক। তাছাড়া সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসেবেও দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন—"তাঁর গবেষণাশক্তি, সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আর ইংরেজি রচনাকৌশল, বাংলার যুবকদের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটি প্রবলতম কারণ।"

(*বিনয় সরকারের বৈঠক*, পৃঃ ২৯১)

নিবেদিতা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট উপায়ই হল সংবাদপত্র। নিবেদিতা যে একজন জাত-সাংবাদিক ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ রামানন্দ বাবু লিখেছিলেন—"অতি তুচ্ছ বিষয়ও নিবেদিতার কলমে

সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠতো।" *মডার্ন রিভিউ*-এর সূচনা থেকেই নিবেদিতা যথার্থ ভগিনীর মতো রামানন্দবাবুকে সব বিষয়ে সাহায্য করে গেছেন বলেও রামানন্দবাবু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

## স্ত্রী-শিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে তাঁর জীবনের সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী ছিল তাঁর জীবনের দুই মহামন্ত্র—গভীরতম আবেগের স্থল। প্রধানত আদর্শ স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তনের জন্যই স্বামীজি নিবেদিতাকে ভারতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নানান কাজের মধ্যেও তাঁর গুরু নির্দেশিত ওই কাজের কথা তিনি কোনদিনও ভুলতে পারেননি। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের আদর্শ নারী যেমন—সতী, সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, রানি ভবানী ও ঝাঁসির রানি প্রভৃতিদের শাশ্বত আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন—"যে শিক্ষায় নারীর নম্রতা ও কোমলতার হানি হয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। চরিত্রের বিকাশই হইল মুখ্য, মানসিক উন্নতি গৌণ। প্রথমটির স্ফুরণে দ্বিতীয়টির বিকাশ না হইয়া যায় না। আধুনিক যুগে নারীকে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করিতে হইবে।"

বাংলাদেশে যখন স্বদেশি আন্দোলনের প্লাবন এল তখন জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলারও প্রয়োজন অনুভূত হল। খুব স্বাভাবিক কারণেই ওই কাজের জন্য নিবেদিতারও ডাক পড়ল। তাঁর কাছে ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি ছিল নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতে (Dawn Society) জাতীয়তা বা Nationalism ও জাতীয় শিক্ষা বা National Education প্রভৃতি সম্পর্কে ভাষণ দিয়ে বা লেখালেখি করে নিবেদিতা আগেই চিন্তাশীল বাংলাকে ভাবিত করে রেখেছিলেন। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে যুব ভারতকে অনুপ্রাণিত করতে তিনি শুধু বক্তৃতার ওপরই নির্ভর করেননি। তাঁর লেখনীও সমানে চালিয়ে গেছেন। "The Cry of the Mother to the Indian Youth" শীর্ষক কবিতায় ভগিনী নিবেদিতা বাঙালি, মরাঠি, রাজপুত, শিখ, মুসলমান ও দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসীদের অন্তর্নিহিত একতায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ওই একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে আবেদন জানিয়েছিলেন—

In your today lives all the greatness of the past;
Awake them and arise !
Struggle ye on and stop not till the goal is reached.

এহেন নিবেদিতার যে জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে ডাক পড়বে তা তো বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মনে করেন—"নিবেদিতা ছিলেন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা।"

স্বদেশি আন্দোলনে বাংলাদেশে যে নতুন ভাবধারা তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল জাতীয় শিক্ষা তার একটি অঙ্গ মাত্র। নিবেদিতা ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতিই চাইতেন। কিন্তু তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হল বিদেশি শাসন। তাই ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক বিনয় সরকারের মতে তিনি যুব ভারতকে স্বদেশ নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে সফল হয়েছিলেন।

## বিপ্লবীদের প্রেরণা

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে নিবেদিতা ছিলেন চরমপন্থী। যদুনাথ সরকার লিখেছেন—"পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং-এর সঙ্গে বাঙ্গালী রামমোহনের মিলন, অর্থাৎ পাঞ্জাবী রণশক্তি আর বাঙ্গালীর মনীষার সমাবেশ হইলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমাদের মুঠোর মধ্যে আসিয়া যাইবে। নিবেদিতার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"She took a profound and active interest in Indian politics and could not forgive partisanship or faction-fights in Indian politics or journalism."

১৯০২-০৩ সালের শীতের সময় নিবেদিতা বরোদায় এলেন স্বয়ং মহারাজের আমন্ত্রণ পেয়ে। ওই সময়ই তাঁর সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা অরবিন্দকে আহ্বান জানালেন—"কলকাতায় চলে আসুন। আজ এই মুহূর্তে সব বাঙালি এবং সমগ্র বাংলাদেশ স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।"

তা শুনে অরবিন্দ বললেন—"এখনো সময় হয়নি। আমি আরও কিছুদিন অগোচরে থাকতে চাই। তবে সামনে কাজ করার জন্য একজন লোক চাই।"

উত্তেজনায় সোজা উঠে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। প্রসারিত হাত দুটি যেন বিশ্বাসের প্রতীক। বললেন—"আমি তো আছি, আমি করব আপনার কাজ।" বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা নিবেদিতা তাঁর রক্তের তেজকে অরবিন্দর কাজে প্রবাহিত করার বাসনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। অরবিন্দকে কথা দিয়ে দু'এক দিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এলেন।

কলকাতায় ফিরেই তাঁর বিপ্লবাত্মক বইগুলি বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল নানা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও বিপ্লবের কাহিনি। এঁদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যেন দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নিবেদিতা ওই দুজনকে আশ্বাস দিলেন—কেউ তোমাদের পাশে না থাকলেও আমি চিরদিনই থাকব।

## স্বদেশি আন্দোলন

দেখতে দেখতে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। তবে তারও আগে নিবেদিতার ভারতপ্রীতির দু'একটি ঘটনা আলোচনা করা অবশ্যই উচিত। বিলেতে একটা সভায়

ভারতের সম্পন্ন ঘরের নারীদের চরিত্র সম্পর্কে এক মহিলা কটূক্তি করলে নিবেদিতা তাঁকে নানান প্রশ্নবাণে এমনভাবে অস্থির করে তোলেন যে ওই ভদ্রমহিলা শেষপর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নিতে বাধ্য হন।

১৯০৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তৎকালীন ভাইসরয় (লর্ড কার্জন) বাঙালিদের চরিত্রের ওপর কলঙ্কলেপনের চেষ্টা করলে প্রতিবাদে নিবেদিতা বিচারপতি স্যার গুরুদাসকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর ১৩ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) *অমৃতবাজার পত্রিকায়* কার্জনের—*The Problems of the East* বইটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেন যে কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী।

*যুগান্তর* পত্রিকার সম্পাদক তরুণ বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হলে তাঁর জামিনের জন্য টাকা পয়সা নিয়ে স্বয়ং আদালতে হাজির হয়ে যান তিনি।

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলে নিবেদিতা ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের কোর্টের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—"I know you to be great, but did not know you to be so great"।

অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আবার বের হতে যাচ্ছে খবর পেয়েই নিবেদিতার পরামর্শের জন্য রামচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন নিবেদিতা রামচন্দ্র মজুমদারকে বলে দেন যে, "Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things"। শেষপর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করে যাবার আগে অরবিন্দ ঘোষ, *কর্মযোগিন* পত্রিকাটি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে যান। বস্তুত, অরবিন্দের অন্তর্ধানের পরও নিবেদিতার জন্যই কর্মযোগিন পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন চলেছিল। ওই সময় নিজের লেখাগুলি অরবিন্দের নামে কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশ করে দীর্ঘদিন নিবেদিতা ব্রিটিশ শাসকদের বুঝতেই দেননি যে অরবিন্দ অনেক আগেই চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরি চলে গেছেন।

## ১৯১১ সালের অক্টোবরের সেই ভয়ংকর দিনটা

১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। নিবেদিতার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বসু-দম্পতি তাঁকে দার্জিলিং-এ নিয়ে এলেন। শ্রীমতী অবলা বসুর সেবা-যত্ন এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা সত্ত্বেও নিবেদিতার জীবনে উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। পয়লা অক্টোবর থেকে দারুণ জ্বর শুরু হল। তেরো দিন ধরে নিবেদিতা শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। ৬ অক্টোবর থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শেষ সাতটা দিন ধরে নিদ্রাহীন চোখে অবলা বসু বসে রইলেন তাঁর পাশে। তারপর সব শেষ হয়ে গেল ১৯১১ সালের ১৩ অক্টেবর তারিখে সকাল সাতটায়। তবে শেষপর্যন্ত জ্ঞান ছিল তাঁর। শেষ যে কথাগুলি বলেছিলেন তা হল—"The boat is sinking but I shall see the sun-rise"।

নিবেদিতার জীবনকাব্যের একটি অতি মধুর দিক হল তাঁর মাতৃভাব। প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের সেবা করার সময় একদিন দেখা গিয়েছিল যে প্লেগ আক্রান্ত একটি নীচ জাতের অস্পৃশ্য ছেলে তাঁর কোলেই মারা যায়। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ওই ছেলেটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তাঁকে নিজের মা মনে করেই আঁকড়ে ধরেছিল। স্বচক্ষে ওই দৃশ্য দেখেই মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'লোকমাতা'। এমন বহু ঘটনা আছে নিবেদিতার জীবনে যা তাঁর ওই সহজাত মাতৃভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে। নিবেদিতার জীবনদেবতা তাঁকে টেনে এনেছিলেন তাঁর বহু আকাঙিক্ষত এই ভারততীর্থে। তাঁর জীবন তাই এক মহাতীর্থ যাত্রীর সংগীত, তিনি যেন ভারতেরই বীণাপাণি। (রবীন্দ্রনাথ)

সেই লোকমাতা, সেই কর্মপ্রবাহ সবই আজ অতীতের স্মৃতি। তবু কেন জানি না তাঁর কথা মনে হলেই মনে হয় লোকমাতার প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। যা স্বাধীন ভারতবর্ষের সন্তানদের ওপর আজও সমানভাবে বর্ষিত হয়ে চলেছে। আর ওই অনুভবের গভীরতাতেই নিবেদিতা আজও অমর, আজও অনির্বাণ। (রবীন্দ্রনাথ)।

## আট

# ত্যাগী, দাতা ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ

মনে পড়ছে ১৯২৫ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখটা। ঝড় আসছে বাংলার নতুন শাসন পরিষদে। সরকার হুমকি দিয়েছেন—বাঙালির পাঁজর ভেঙে দেওয়া হবে Bengal Ordinance বিলটা পাস করিয়ে।

"এ বিলটা কিছুতেই পাস হতে দেব না।" গর্জে উঠলেন দেশবন্ধু রোগশয্যা থেকেই। "আমি যাব—ভোট দেব—হয়তো আমার ওই একটা ভোটেই বিলটা নাকচ হয়ে যাবে।"

শেষপর্যন্ত স্ট্রেচারে শুয়েই ভোট দিতে গেলেন অসুস্থ চিত্তরঞ্জন। সরকার পক্ষ পরাজিত হল। অগত্যা গভর্নর Lord Lytton মন্টেগু-সংস্কার সৃষ্ট Dyarchy বা দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত Transferred subjects বা হস্তান্তরিত বিষয়গুলির কিছুটা নিজের হাতে রেখে বাকিগুলো কর্মপরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বাধ্য হলেন। সমাধি রচিত হয়ে গেল বাংলায় দ্বৈতশাসন (Dyarchy) ব্যবস্থার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচয় প্রধানত ত্যাগী ও দাতা হিসেবে। কিন্তু রাজনীতিবিদ্ হিসেবেও তিনি ব্রিটিশ শাসকদের দিয়েছিলেন প্রচণ্ড আঘাত। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই বলতেন—"লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর 'ব্রিটিশ রাজ' দেশবন্ধুকেই তাদের পয়লা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিল।" আবার অসাধারণ আইনবিদ্ হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একের পর এক স্বদেশবাসী বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিশ্চিত প্রাণদণ্ড অথবা দ্বীপান্তরের শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতার পটলডাঙায়। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ অঞ্চলে। তাঁরা ছিলেন সেখানকার এক বিখ্যাত বৈদ্য পরিবার। পিতা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন সলিসিটার। দানশীল ও উদার অন্তকরণের মানুষ। দীন, দুঃখী ও অভাবী মানুষদের সাহায্যের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এজন্যই তো তাঁকে ঋণে জর্জরিত হয়ে শেষপর্যন্ত দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। আর আজকের প্রজন্মের মানুষ শুনলে অবাক হবেন যে পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে পুত্র চিত্তরঞ্জন তাঁকে দেউলিয়া খাতার বন্ধনমুক্ত করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের মা নিস্তারিণী দেবীও ছিলেন অত্যন্ত দয়াবতী ও দানশীলা মহিলা। বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে তিনি আপন জনের মতো আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করতেন। এঁদের মধ্যেই ছিলেন একজন যিনি পরবর্তীকালে দিকপাল বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অতি শৈশবে মাতৃহারা হয়ে অবলা বসু ও তাঁর ভাই-বোনেরা ভুবনমোহনের পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিস্তারিণী দেবী দীন, দরিদ্রদের অকাতরে দানও করতেন। বলাবাহুল্য, বাবা ও মায়ের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ পরবর্তীকালে তাঁদের পুত্র চিত্তরঞ্জনের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

ছাত্র হিসেবে চিত্তরঞ্জন তথাকথিত বইমুখো ছেলেদের দলে ছিলেন না। তবে ১৮৮৬-তে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এবং প্রেসিডেন্সি থেকেই ১৮৯০ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পরেই পিতা ভুবনমোহন তাঁকে বিলেতে I.C.S. পরীক্ষায় বসার জন্য পাঠিয়ে দেন। দু-বছর প্রস্তুতির পর ১৮৯২ সালে ওই পরীক্ষায় বসেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হতে থাকেন এবং ১৮৯৩ সালে সফল হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে প্রায় বারো বছর কাল অর্থাৎ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন তাঁর কর্মজীবনে স্মরণীয় কিছুই করতে পারেননি। তবে রাজনীতিতে তিনি সে যুগের জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আর অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তখনকার ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা *বন্দেমাতরম* প্রকাশনার ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের ব্যারিস্টাবি জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরটি শুরু হয় ১৯০৮ সাল থেকে যখন ওই বছরেই কুচক্রী ইংরেজ শাসকরা অরবিন্দ ঘোষকে মানিকতলার বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত করে তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ করেন। কালবিলম্ব না করে তরুণ স্বদেশপ্রেমিক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করে বিনা পারিশ্রমিকে মামলাটি পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন। আইনজ্ঞান ও জেরা সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা প্রকাশের সুযোগও পেয়ে যান। এই মকদ্দমায় ২০০ জন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়। ৪০০০ দলিল-পত্র দাখিল করা হয় এবং বোমা, রিভলবার, বিষাক্ত অ্যাসিড ও বিস্ফোরক প্রভৃতি প্রমাণ হিসেবে আদালতে পেশ করা হয়। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষকে বিনা শর্তে ও সসম্মানে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এই মামলার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক সওয়াল দেশবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসছেন—"My appeal to you, Sir, is this. Long after this controversy will be hushed in silence long after he is dead and gone, he will be looked upon as the Poet of Patriotism, Prophet of Nationalism and a Lover of humanity. Therefore, I would say that the man in his position is not only standing before the Bar of this Court alone but before the Bar of the High Court of History."

শুধু অসাধারণ আইনবিদ্ হিসেবেই নয়, অসাধারণ ত্যাগী ও দাতা হিসেবেও লোকে তাঁকে চিনে নিল এই মোকদ্দমারই মাধ্যমে। দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে এই মোকদ্দমা পরিচালনা করে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্থাৎ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁকে আর কোনদিনই ফিরে তাকাতে হয়নি। ওই সময় ব্যারিস্টারি পেশা থেকে আয় দাঁড়িয়েছিল মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওই সময় পর্যাপ্ত অর্থ তাঁর যেমন হাতে এসেছিল তেমনি আবার দীন, দুঃখী ও অভাবী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরও অকাতরে দান করে.গেছেন

তিনি। যে-কোন ব্যাপারে যে কেউ সাহায্যের জন্য দেশবন্ধুর কাছে গেছেন তাঁদের কখনই খালি হাতে ফিরতে হয়নি। এমনকি দেশবন্ধুর কুৎসা না করে যাঁরা জলগ্রহণ করতেন না তাঁরা পর্যন্ত তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য গেলে তিনি নিরাশ করতেন না। এই রকম একটি লোক যখন তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছেন সেই সময় দুশো টাকা চেয়ে বসেন তাঁর কাছ থেকে। দেশবন্ধু তখন বলেছিলেন এই মুহূর্তে আমার কাছে মাত্র দু-শো (২০০) টাকা আছে। তার মধ্যে থেকে দুশো (২০০) টাকা কীভাবে দেবেন। কিন্তু ওই লোকটি তারপরও পীড়াপীড়ি করতে থাকায় প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থাতেই দেশবন্ধু ওই দুশো টাকাই সেই লোকটির হাতে তুলে দেন।

এ ব্যাপারে আরও দু-একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে অন্যায় হয়ে যাবে। যদিও তখন তিনি তাঁর ব্যারিস্টারি পেশায় সাফল্যের তুঙ্গে ছিলেন।

একদিন আদালতে যাবার জন্য মোটরে উঠছেন এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁকে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন। "আচ্ছা, দাশসাহেবের দেখা কেমন করে পাব? তিনশো টাকার জন্য আমার মেয়ের বিয়ে আটকে যাচ্ছে। শুনেছি তিনি দেবতা।" দেশবন্ধু তাঁকে মোটরে তুলে নিয়ে বললেন—"আমার সঙ্গে আদালতে চলুন, ওখানেই দাশসাহেবের সঙ্গে দেখা হবে।"

আদালতে পৌঁছে ব্রাহ্মণকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটি লোক ব্রাহ্মণের হাতে একটা পাঁচশো টাকার চেক্ দিয়ে বললেন—"দাশসাহেব পাঠিয়ে দিলেন।" বিস্মিত ওই ব্রাহ্মণ তখন কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"কিন্তু উনি তো আমায় দেখেননি পর্যন্ত।" জবাবে লোকটি বললেন—"দাশসাহেবের সঙ্গেই তো আপনি মোটরে আদালতে এলেন।"

ভাবতে অবাক লাগে যখন উনি ওঁর ব্যারিস্টারি পেশায় সাফল্যের তুঙ্গে সেই সময় প্রতিদিনই আদালতে রওনা হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটা বুদ্ধমূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে বলতেন—"রাজ সন্ন্যাসী! তোমায় আমি যত ভালোবাসি ঠিক ততখানিই আবার ভয়ও করি। কে জানে আমাকেও হয়তো একদিন তোমারই মতো সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়াতে হবে কিনা?"

১৯২০ সালের শেষভাগে নাগপুর কংগ্রেস থেকে কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরবর্তী জানুয়ারি মাসে (১৯২১-এর জানুয়ারি) তিনি ব্যারিস্টারি ত্যাগ করলেন। সমস্ত প্রকার বিলাস-ব্যসন রাতারাতি ত্যাগ করে ঋষির জীবনযাপন করতে শুরু করেন এবং কলকাতায় অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়াও শুরু হয়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে দেশবন্ধু জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে তাঁর পরিবারের লোকদেরও এই আন্দোলনে ঠেলে দেন। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবী উন্মুক্ত রাস্তায় খদ্দর বিক্রয়ের অপরাধে গ্রেপ্তার হন।

ক্রমশ অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। ঠিক হল গুজরাটের বরদৌলি জেলায় সরকারকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ হবে। আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছোয় ঠিক সেই সময় (১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি) উত্তবপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা গ্রামে আন্দোলনকারীরা একটি পুলিশ চৌকির ওপর প্রতি-আক্রমণ করে বাইশজন পুলিশ কর্মচারীকে পুড়িয়ে মারে। এরপরই গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সম্পর্কে দেশবন্ধু তাঁর অননুকরণীয় এক বিশ্লেষণে বলেছিলেন—"মহাত্মা তাঁর আন্দোলন ভারী চমৎকারভাবে শুরু করেন। অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁকে সাফল্যের সিংহদ্বারে নিয়ে আসে। তারপরই তাঁর স্নায়ুগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং তিনি চলার পথে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।"

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরে দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করে দেশবাসীদের কাছে তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে স্বরাজ্য দল বাংলার নতুন শাসন পরিষদে একক গরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু তাই নয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, এস. আর. দাশ প্রমুখ রথী-মহারথীরা পর্যন্ত স্বরাজ্য দলের তরুণ ও স্বল্পখ্যাত প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হলেন। সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করেছিলেন তরুণ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

কাউন্সিলে প্রবেশ করে স্বরাজ্য দল প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। বাংলার মন্ত্রীসভাই গঠন করতে দেওয়া হল না। দেওয়া হল না মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিলটা গৃহীত হতে। মধ্যপ্রদেশের স্বরাজী সদস্যরা বাজেটই পাস করাতে দিলেন না। দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ নীতিকে যাঁরা এতদিন বিদ্রুপ ও তামাশা করে আসছিলেন তাঁরা সকলেই স্তম্ভিত ও হতবাক।

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় দিনটা হল ১৯২৫ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখটা। নিপীড়নের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার Bengal Ordinance বিলটা পাস করিয়ে নিতে সরকার ছিল বদ্ধপরিকর। অসুস্থ দেশবন্ধু স্ট্রেচারে শুয়ে ভোট দিতে গেলেন। সরকার পক্ষ পরাজিত হল। গভর্নর Lord Lytton মন্টেগু, সংস্কারসৃষ্ট Dyarchy বা দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত Transferred subjects বা হস্তান্তরিত বিষয়গুলির কিছুটা নিজের হাতে রাখতে এবং বাকিটা শাসনপরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বাধ্য হলেন। সমাধি রচিত হল বাংলায় Dyarchy বা দ্বৈত-শাসনব্যবস্থার। অভূতপূর্ব জয় হল দেশবন্ধুর এবং তাঁর স্বরাজ্য দলের।

১৯২৩ সালে Calcutta Municipal Act পাস হলে গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত কলকাতা কর্পোরেশনের ৭৫টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৫৫টি আসনে জয়লাভ করল স্বরাজ্য দল। নতুন কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের এই বিশাল জয় দলকে ও দলনেতা দেশবন্ধুকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল। দেশবন্ধুই হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত

মেয়র (Mayor)। তারপরই প্রিয়তম শিষ্য সুভাষচন্দ্রকে Chief Executive Officer নিযুক্ত করে গুরু ও শিষ্য দুজনে মিলে কলকাতা কর্পোরেশনের চেহারাটাই পালটে দিলেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও পথপ্রদর্শক ছিলেন দেশবন্ধু। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব তাঁর *India Wins Freedom* গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন বাংলাদেশে দেশবন্ধু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রকার সংশয় দূর করতে পেরেছিলেন এবং তারা দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। দেশবন্ধু সবসময়ই বলতেন—"হিন্দু ও মুসলমান নিয়েই তো বাঙালিজাতি এবং ভারতবর্ষ। আর সংঘবদ্ধ হয়েই তো আমাদের বিশ্বের দরবারে দাঁড়াতে হবে।" হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইসলামীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও কোন মিল পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে মৌলানা আক্রাম খানের সঙ্গে প্রায়ই এমনকি কারাগারেও তাঁর আলাপ-আলোচনা হত। আক্রাম খান সাহেব কথাও দিয়েছিলেন এ বিষয়ে তিনি লেখালেখি করবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রায়ই বলতেন—"দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড়ো বন্ধু বর্তমান ভারতবর্ষে আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। আর মুসলমানরাও সানন্দে ও নিঃসংকোচে তাঁকে তাঁদের নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন।"

কবি ও সাংবাদিক হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঘোর রাজনৈতিক আবর্তের মাঝে কাব্যচর্চা ও পত্রিকা সম্পাদনা তাঁকে দিত প্রাণের আরাম ও পরম শান্তি। *সাগর সংগীত, মালঞ্চ* ও *অন্তর্যামী* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের জন্য এবং বিশেষত পতিতাদের জন্য তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ফুটে উঠেছে তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমত হয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন কবি হিসেবে এবং বিশেষত রাজনীতিবিদ্ হিসেবে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ সাফল্যের মূলেই ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ও বিশ্বাস। এজন্যই তো জেলবন্দি এক দাগি আসামিকে নিজের বাড়িতে কাজে নিয়োগ করে তিনি তার সেই কয়েদির জীবনযাত্রার ধারাটাই পালটে দিতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণরূপে।

দেশবন্ধু সম্পর্কে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ না করলে যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ওই সময় দেশবন্ধুর সঙ্গে একই হাজতে ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার। জেলের টিকিটে দেশবন্ধুর পাচক হিসেবে নাম ছিল সুভাষচন্দ্রের। আর ভৃত্য হিসেবে নাম ছিল হেমন্তকুমারের। কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেম্বার স্যার আবদুর রহিম একদিন জেল পরিদর্শন করতে এসে দেশবন্ধুকে বলেছিলেন—"রাজবন্দী হিসেবে আপনি বড়োই ব্যয়বহুল। একজন আই.সি.এস. আপনার পাচক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আপনার চাকর।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে ঋষি অরবিন্দ এক তারবার্তায় জানিয়েছিলেন—"তিলকের পর তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি ভারতবর্ষকে স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারতেন।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুর সাত মাস পরে মান্দালয়ের জেল থেকেই তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—"তিনি এত বড়ো ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে, আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।"

চিত্তরঞ্জনের মহত্ত্ব ও ত্যাগের মহিমা কতখানি ছিল একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং পরবর্তী জানুয়ারি মাস থেকেই (জানুয়ারি, ১৯২১) সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন দেশসেবার মহান ব্রত নিয়ে। তখনকার মির্জাপুর পার্কের (বর্তমানে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট জনসভায় জননায়ক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বপ্রথম 'দেশবন্ধু' বলে অভিনন্দন জানালেন। সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন সমস্ত দেশের চিত্ত জয় করলেন।

রাজনীতি বা রণনীতি, ত্যাগ বা কাব্য-সাধনা, অথবা পত্রিকা সম্পাদনা সব মিলিয়েই দেশবন্ধু ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। দেশের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। তাই আজীবনই বলে এসেছেন—"স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বারবার এদেশেই জন্মগ্রহণ করব এবং যতদিন না পর্যন্ত আমার আশা ও আকাঙক্ষা পূর্ণ হয় আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে এদেশকেই ভালোবেসে যাব।" সার্থক এই উক্তি দেশবন্ধুর।

১৯২৫ সালের ১৬ জুন, সকল দেশবাসীকে অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু অকালে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর একখানি ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় হাজির হলেন শোকস্তব্ধ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে। বললেন—"এই ছবিটার ওপর একটা কবিতা লিখে দিন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি।" কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ছবিটার ওপর সেই অপূর্ব কবিতাটি লেখা হয়ে গেল—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,<br>
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

## নয়

# শ্রীঅরবিন্দ : বিপ্লবী ও সাধক

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক অরবিন্দ ঘোষ একাধারে রাজনৈতিক নেতা, সাধক ও দার্শনিক ছিলেন। জন্মলগ্ন ১৮৭২ সালের ১৫ অগাস্ট কলকাতার চৌরঙ্গি অঞ্চলের ব্যালাডস্ বিল্ডিংসে। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ডাক্তার—একেবারে কেতাদুরস্ত সাহেব। তাই মাত্র সাত বছর বয়সেই অরবিন্দকে দুই অগ্রজ বিনয়কুমার ও মনোমোহনের সঙ্গে বিলেত যেতে হয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। ওই বিলেত যাওয়ার পথেই জাহাজে ভূমিষ্ঠ হন ছোটোভাই বারীন্দ্রকুমার। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক।

১৮৯২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপোজ* ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছরে গ্রিক ল্যাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষার কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখেন এক ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী যেন তাঁকে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কাজেই ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষার দিন অনুপস্থিত হয়ে যান। আর কুচক্রী ইংরেজও ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁকে আই.সি.এস. করল না। কেননা ইতিমধ্যেই তিনি ইন্ডিয়ান মজলিস ও লোটাস অ্যান্ড ড্যাগারস প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিগুলির সদস্যপদ গ্রহণ করে ব্রিটিশ-বিরোধী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে, ভারতমাতার যে চার সুসন্তান আই.সি.এস.-এর চাকরি প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের চারজনের মধ্যে তিন জনই হলেন বাঙালি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানগুরু শ্রীঅরবিন্দ এবং কর্মগুরু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

ছাত্রাবস্থা থেকেই অরবিন্দের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে তিনি ইতালি, জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করে ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ও পারনেলের বিপ্লবী কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সবার ওপরে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' আদর্শ।

১৮৯৩ সালে দেশে ফিরলেন বরোদার গায়কোয়াড়ের অধীনে চাকরি নিয়ে। প্রথমে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান। পরে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তারপর উপাধ্যক্ষ। তারও পরে অস্থায়ী অধ্যক্ষ। বরোদায় যাবার সময় ১৮৯৬ সাল থেকেই তিনি প্রতি কাজেই ভগবৎ প্রেরণা অনুভব করতেন। ওই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনতে পান—'অরবিন্দ। মন্দির কর।' তখন বারীন্দ্রকুমারের উৎসাহে 'ভবানী মন্দির'

* ট্রাইপোজ—ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন ও অঙ্ক তিনটি বিষয়েই প্রথম বিভাগে প্রথম।

নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং পুনার বিপ্লবী সংগঠনের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওই ঠাকুর সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'সিক্রেট সোসাইটি'র সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে বাংলায় বিপ্লবী দল গঠনের উদ্দেশ্যে ছোটোভাই বারীন্দ্রকুমারকে এবং গায়কোয়াড়ের মহারাজের দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠিয়ে দেন। ওই যতীন্দ্রনাথই ১৯০২ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

## নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ

এখানে শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে নিবেদিতার কথা না বললে এ প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯০২-০৩ সালের শীতকালে নিবেদিতা বরোদায় আসেন স্বয়ং মহারাজের আমন্ত্রণ পেয়ে। ওই সময়ই তাঁর সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা অরবিন্দকে আহ্বান জানালেন—"কলকাতায় চলে আসুন। আজ এই মুহূর্তে সব বাঙালি এবং সমগ্র বাংলাদেশ স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।"

তা শুনে অরবিন্দ বললনে—"এখনো সময় হয়নি। আমি আরও কিছুদিন অগোচরে থাকতে চাই। তবে সামনে কাজ করার জন্যে একজন লোক চাই।"

উত্তেজনায় সোজা উঠে দাঁড়ালেন নিবেদিতা, প্রসারিত হাত দুটি যেন বিশ্বাসের প্রতীক। বললেন—"আমি তো আছি, আমি করব আপনার কাজ।" বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা নিবেদিতা তাঁর রক্তের তেজকে অরবিন্দের কাজে প্রবাহিত করার বাসনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। অরবিন্দকে কথা দিয়ে দু-এক দিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এলেন।

অনেক পরের কথা হলেও (১৯১০ সালের কথা) ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয়। শেষপর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করে যাওয়ার আগে অরবিন্দ ঘোষ *কর্মযোগিন* পত্রিকাটি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে যান। বস্তুত, অরবিন্দের অন্তর্ধানের পরও নিবেদিতার জন্যই *কর্মযোগিন* পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন চলেছিল। ওই সময় নিজের লেখাগুলি অরবিন্দের নামে কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশ করে দীর্ঘদিন তিনি (নিবেদিতা) ব্রিটিশ শাসকদের বুঝতেই দেননি যে অরবিন্দ ঘোষ অনেক আগেই চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরি চলে গেছেন। অরবিন্দ ঘোষের অন্তর্ধানের পেছনে নিবেদিতার যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তা বুঝতে কারোরই কোনো অসুবিধা হয়নি। কেননা সকলেই জানতেন যে ব্রিটিশ শাসকদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সর্বদাই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাই আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলে নিবেদিতা দেশপ্রেমিক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের কোর্টের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—"I know you to be great, but did not know you to be so great."

## সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ ও শ্রীঅরবিন্দ

আদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের শেষভাগে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বা চরমপন্থী মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নরমপন্থীরা ছিলেন ইংরেজ শাসকদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা চাইতেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার লাভ করা। তাঁদের হাতিয়ার ছিল আবেদন-নিবেদনের নীতি (policy of prayer and petition) কিন্তু চরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের নীতিকে রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করতেন। ঠিক যা মনে করতেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও। তাই তো ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছিলেন—

মিছে কথার বাঁধুনী, কাঁদুনীর পালা—
চোখে নাহি কার(ও) নীর,
নিবেদন আর আবেদনের থালা—
ব'হে ব'হে নত শির।

আসলে চরমপন্থীরা চাইতেন সক্রিয় জঙ্গি-আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে পূর্ণ-স্বরাজ ছিনিয়ে নেওয়া। বছরে তিন দিন অধিবেশন করে কিংবা মাঝে মাঝে ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে কখনই স্বরাজ লাভ সম্ভব হবে না। নরমপন্থীদের ব্যর্থতার কথা বোঝাতে লাজপত রায় সরাসরি লিখেছিলেন—''কুড়ি বছর ধরে যে আন্দোলন তাঁরা করেছিলেন সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সুবিচার আদায়ের জন্য তা প্রায় বিফল হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন রুটি, পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো।''

(বিপিনচন্দ্র ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পৃঃ ৯৭)

সফল না হলেও জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তীকালে চরমপন্থী মতবাদের প্রভাবেই দীর্ঘদিনের জড়তা ও অবসাদ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতবাসীর জীবনে গণ-চেতনাব উন্মেষ ঘটেছিল। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই চরমপন্থী মতবাদ ভারতবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে স্বরাজ লাভের জন্য তাদেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অরবিন্দ ঘোষ *ইন্দুপ্রকাশ* পত্রিকায় সরাসরি লেখেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও গঠনতন্ত্র ভ্রান্ত ও অবৈধ এবং নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ব্যক্তিবৃন্দ কোনক্রমেই নেতা হবার যোগ্য নয়। তাঁরা অর্থাৎ নরমপন্থীরা দেশের ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে। (জীবন মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশ পরিচয়*, পৃঃ ৪৫৫)

ঠিক এই সময় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মের মহত্ত্বকে জগতের সামনে প্রচার করলে শিক্ষিত যুবসমাজ গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করে। স্বাদেশিকতার দীক্ষাগুরু বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করেন যে দেশমাতৃকাই হলেন ঈশ্বর, দেশপ্রেমই হল ধর্ম এবং দেশসেবাই হল ঈশ্বরের উপাসনা। ইতিমধ্যে তিলক,

অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখেরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাতে শুরু করেন। অরবিন্দ ঘোষ বলেন—"স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য এবং একমাত্র হিন্দুধর্মই আমাদের আশা-আকাঙক্ষা পরিতৃপ্ত করতে পারে।" (জীবন মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশ পরিচয়*, পৃঃ ৪৫৫)

ঐতিহাসিক মেহরোত্রা মনে করেন যে চরমপন্থী আন্দোলনের দ্বৈত চরিত্র ছিল। প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলে এই চরমপন্থী মতবাদ ছিল রক্ষণশীল। আবার গণআন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে তা ছিল বৈপ্লবিক।

## রজনীপাম দত্ত ও তাঁর *India Today*

রজনীপাম দত্ত হিন্দু ধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে তাঁর বিখ্যাত বইটিতে (India Today) লিখেছেন যে, চরমপন্থী মতবাদ সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকেই সংহত করেছিল। কিন্তু রজনীপাম দত্তের অভিমতকে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সমালোচকরা মনে করেন, তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারা একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। আসলে তাঁরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির ওপরই বরাবর জোর দিয়েছেন। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে ধর্ম ও অতীত ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে চরমপন্থী নেতারা জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন।

## অরবিন্দ ঘোষের কলকাতা আগমন (১৯০৫)

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন সমগ্র বাংলা গর্জে উঠেছিল তখন স্বদেশ-অন্তপ্রাণ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা মহারাজের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে বরোদা থেকে চলে এলেন স্বদেশি আন্দোলনের তরঙ্গ দোলায় উত্তাল বাংলার বুকে মাত্র ১৫০ টাকা বেতনের জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে। শুরু হল এক নতুন কর্মজীবনের পালা। সরাসরি বিদ্রোহ ও ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্ব অস্বীকারের প্রচার-যন্ত্র হিসেবে মার্চ ১৯০৬ সালে *যুগান্তর* প্রথম প্রকাশিত হল। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম থেকেই ওই পরিকল্পনার পেছনে ছিলেন।

*যুগান্তর* বছর দুই চলার পরে যখন বেশ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকেই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে সক্রিয় বিপ্লবের অঙ্গ হিসেবে মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িটি বেছে নেওয়া হয়। সাত বিঘে জমি নিয়ে বিরাট বাগানের একটা পোড়ো বাড়ি, এঁদো পুকুর ও জঙ্গল গোপনে বোমা তৈরি করার একেবারে আদর্শ পরিবেশ। সব কিছু খুঁটিনাটির মধ্যে

না থাকলেও শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন মুরারিপুকুরের প্রাণপুরুষ—হিংসা ও অহিংসা দুয়েরই। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আবেদন-নিবেদনের পথে কখনও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসতে পারে না। তার জন্য দিতে হবে চরম মূল্য, সে মূল্য রক্তের। তাঁর চিন্তাধারার মর্মবাণী অনবদ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বকবির কাব্যে যখন তিনি লিখেছেন—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা,
রিক্ত হাতে চাসনে তারে,
সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।
রত্নমাল্য আনবি যবে, মাল্য বদল তখন হবে—
পাতবি কি তুই দেবীর আসন শুকনো ধূলায় পথের ধারে?

অচিরে অরবিন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন লোকমান্য তিলক, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখেরা।

অরবিন্দের বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুগামীরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন চরমপন্থী নামে। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মতবিরোধ প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হওয়ার পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে অবিসংবাদী নেতারূপে বরণ করে নিল। তখন ভীত ও শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ মুরারিপুকুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসাজস আছে এই অভিযোগে তাঁকে কারারুদ্ধ করল। তারপর তাঁকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেও ব্রিটিশ শাসকরা ব্যর্থ হয়ে যায় ক্ষণজন্মা ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আইন সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান এবং সওয়ালে অসামান্য দক্ষতার জন্য। সেদিন সেই ঐতিহাসিক সওয়ালে দেশবন্ধু বলেছিলেন—"এমন একদিন আসবে যখন শ্রীঅরবিন্দ আর এ পৃথিবীতে থাকবেন না। কিন্তু সেদিনও তিনি স্বদেশপ্রেমের চারণকবি, জাতীয়তাবাদের অবতার ও মানবপ্রেমিক রূপে অভিনন্দিত হবেন। তাঁর তিরোধানের বহুকাল পরেও তাঁর বাণী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, দেশদেশান্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।"

বিপ্লবী হয়েও শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি পত্রে লিখেছিলেন—"আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথমটি হল—আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আমাকে যে গুণ, প্রতিভা ও সম্পদ দিয়েছেন তা ঈশ্বরের। তাই পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যা প্রয়োজন তার উদ্বৃত্ত অংশ ঈশ্বরকেই ফেরত দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টি হল যে-কোন মতেই হোক ঈশ্বরের দর্শন আমায় পেতেই হবে। তৃতীয়টি হল যখন অন্য সকলে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ—বন, জঙ্গল, নদী ও পাহাড় বলে মনে করে তখন আমি স্বদেশকে মা বলে ভক্তি করি, পুজো করি।"

কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি ব্রিটিশরাজের দমননীতির বিরুদ্ধে আবার লেখনী ধারণ করলেন ইংরেজি *কর্মযোগিন* ও বাংলা *ধর্ম* পত্রিকার মাধ্যমে। শঙ্কিত ইংরেজ আবার তাঁকে

গ্রেফতার করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সিস্টার নিবেদিতা কীভাবে যেন ব্যাপারটা জানতে পারেন এবং সময়মতো তাঁকে সতর্ক করে দেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ ফরাসি অধিকৃত চন্দনগর হয়ে চলে যান ফরাসি অধিকৃত পন্ডিচেরিতে ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি অবস্থায় তাঁর অন্তরে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়—তিনি বাসুদেবের দর্শন পান এবং উপলব্ধি করেন যে এমন একটি পথের প্রয়োজন যা সব মানুষের উন্নতির সম্ভাবনাকে সফল করে তুলবে। সেই পথের সন্ধানেই তিনি শেষপর্যন্ত চলে যান পন্ডিচেরিতে। পন্ডিচেরিতে বিপ্লবী অরবিন্দ রূপান্তরিত হন জ্ঞানতপস্বী, দার্শনিক, মহাসাধক ঋষি শ্রীঅরবিন্দতে। বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে নিয়ে যে বিপ্লবী জীবনের পথ চলা শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা পেল অধ্যাত্মসাধনার সার্থকতায়। একই আধারে দুয়ের এমন অপূর্ব সমন্বয় বিশ্ব-ইতিহাসেও বিরল। তাই কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ দেশবাসী হিসেবে বিশ্বকবি প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘ্যের মাধ্যমেই প্রণাম জানাই।

অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার,
বাণীমূর্তি তুমি।

দশ

# মহান বিপ্লবগুরু রাসবিহারী বসু

২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। ভারতের নতুন রাজধানীকে আজ যেন চেনাই যাচ্ছে না। আলোয় পতাকায় রঙে আর মানুষের ভিড়ে ও কোলাহলে যেন এক মহোৎসবের সূচনা হয়েছে। বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লির দরবারে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাই হাতির পিঠে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলেছেন। পথের দু-ধারে হাজার হাজার উৎসুক মানুষ। দু-ধারের বাড়িগুলো যেন ভেঙে পড়ছে মানুষের ভীড়ে।

ওই বাড়িগুলোর একটাতে ছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (Punjab National Bank)। সেটার একতলায় ও তেতলায় পুরুষদের ভিড়। দোতলায় মহিলাদের। এক সুবেশা ও সুন্দরী তরুণী ওই মহিলাদের ভিড়ে মিশে গেলেন। জানালেন নাম তাঁর লীলাবতী।

শোভাযাত্রা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। চারদিকে হৈ-হৈ পালাও পালাও রব। হাতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। বহুলোক তাদের পায়ের চাপেই জখম হল। দেখা গেল বড়োলাটের হাতির মাহুত নিহত। গুরুতরভাবে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ধরাশায়ী স্বয়ং বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge)। আর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের দোতলার সেই সুবেশা তরুণীটি উধাও।

চারদিক থেকে রাজভক্ত প্রজাদের ধিক্কার ধ্বনি উঠল। দেরাদুনের অরণ্য গবেষণা কেন্দ্রের এক সামান্য কেরানি রাসবিহারী বসুকে দেখা গেল প্রতিবাদে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। রহস্যের কোনো কিনারাই হল না। কিন্তু প্রায় এক বছর বাদে অপ্রত্যাশিতভাবেই ওই রহস্যেব কিনারা হয়ে গেল। অনুশীলন সমিতির এক বিপ্লবী অমৃত হাজরার সন্ধানে পুলিশ আপার সার্কুলার রোডের একটা বাড়িতে তল্লাশি করল। অমৃত হাজরা ধরা পড়ল এবং সেই সঙ্গে আরও অনেকে। ওই বাড়িটিতেই আবিষ্কৃত হল বোমা তৈরির কারখানা। বোমার খোল যা পাওয়া গেল তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা গেল বড়োলাটের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমার সঙ্গে। আর পাওয়া গেল এক টুকরো কাগজে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন। ওই কাগজের টুকরোটাই বিপ্লবীদের বিপদ ডেকে আনল। পুলিশ শীঘ্রই তার অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ায়, একে একে ধরা পড়ল দিল্লির সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমিরচাঁদ এবং অপরাপর বিপ্লবীরা দীননাথ তলোয়ার, বালমুকুন্দ ও অবোধবিহারী প্রভৃতি—যাঁরা বোমা ছোড়ার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে অবশ্যই জড়িত ছিলেন। আর ধরা পড়ে গেলেন—বসন্ত বিশ্বাস যিনি লীলাবতীর ছদ্মবেশে বোমাটি ছুড়েছিলেন। কিন্তু দলনায়কটি কে? বা কোথায়? তার নাম শুনে তো সকলেই তাজ্জব। ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, সেই অদ্বিতীয় রাজভক্ত প্রজা বলে চিহ্নিত দেরাদুনের রাসবিহারী বসু। শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। সরকার সাড়ে

সাত হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ-ভক্ত দেশীয় রাজা-মহারাজারা আরও কয়েকধাপ এগিয়ে ঘোষণা করলেন—এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। কিন্তু কে কাকে ধরে? তখন তিনি কাশীতে। একদিন দেখলেন পুলিশ তাঁর বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ওড়িশাবাসী পাচকঠাকুর। মুখে তার দারুণ ভয় ও আতঙ্কের ছাপ।

পুলিশের প্রশ্ন—"রাসবিহারী বসু বাড়ি আছেন?"

পাচকের উত্তর—"হ্যাঁ, তাঁর ঘরে ঘুমোচ্ছেন।"

বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে পুলিশের দল দুড়দাড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী বসু? তবে কি ওই পাচক-ঠাকুরই ছদ্মবেশী রাসবিহারী বসু? সেই বা গেল কোথায়?

আর একবার পুলিশের কাছে খবর এল রাসবিহারী বসুকে কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া গেছে। খবরটা একেবারে পাকা। তাই খবরটা পেয়েই পুলিশ সমস্ত অঞ্চলটা ঘিরে ফেলল। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী বসু? যদিও খবরটা পাকাই ছিল আসলে পুলিশকে বোকা বানাতে রাসবিহারী সেই মুহূর্তে শিয়ালদহ পোস্ট অফিসের দোতলার একটা ঘরে ফিরিঙ্গি বেহালাবাদকের ছদ্মবেশে বেহালা বাজাচ্ছিলেন।

অন্য আর একবার। তখন তিনি ফরাসি চন্দননগরে। পুলিশ তাঁর বাড়িটা ঘিরে ফেলল। তারই ভেতর থেকে মেথরের ছদ্মবেশে হাতে ঝাড়ু এবং মাথায় ময়লার টিন নিয়ে তিনি পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কেউ কিছু বুঝতেই পারল না।

রাসবিহারীর সহকর্মীরা সব একে একে ধরা পড়া গেলেন। বিচারের প্রহসনের পর অধিকাংশেরই হল মৃত্যুদণ্ড। রাসবিহারী কিন্তু তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই তিনি এক বৃহত্তর সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন তখন।

১৯১৪ সালের ৪ অগাস্ট। শুরু হয়ে গেল ইতিহাসের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। ইংরেজ তার ঘর সামলাতেই ব্যস্ত তখন। তাই ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ কি হেলায় হারানো উচিত হবে? এই প্রশ্নই পাগল করে তুলেছে রাসবিহারীকে।

বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ ভাগাভাগি করে নিলেন রাসবিহারী। বাঘা যতীন ইতিমধ্যে জার্মান সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ আনবার পরিকল্পনা করেছেন। অন্যদিকে রাসবিহারী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু করে দেন। তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে সহযোগিতা পেলেন শচীন সান্যাল, বিনায়ক রাও কিপলে, দামোদর স্বরূপ, প্রতাপ সিং, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ এবং মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু গণেশ পিংলে। বিদেশ থেকে এলেন গদর পার্টির সদস্য কর্তার

সিং। ঠিক হয়েছিল সামরিক শিবিরগুলোতে বিপ্লবীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করবে। প্রথমে সৈনিকদের আস্থাভাজন হতে হবে। তারপর তাদের কাছে বিদ্রোহের প্রস্তাব দিয়ে বিদ্রোহে শামিল হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে হবে। ওই উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত সহকর্মী দামোদর, প্রিয়নাথ, বিশ্বনাথ পাণ্ডে, মঙ্গল পাণ্ডে ও নলিনী মুখার্জী প্রভৃতিকে এলাহাবাদ, বেনারস, জব্বলপুর প্রভৃতি সেনানিবাসগুলোতে পাঠানো হল। পিংলে ও কর্তার সিং-কে দায়িত্ব দেওয়া হল—লাহোর, ফিরোজপুর, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি ও মেরাটের সেনানিবেশগুলোর। বাইরে থেকে আঘাত করার জন্য সিঙ্গাপুর, বার্মা, মালয় প্রভৃতি স্থানের সৈনিকরাও রাজি হয়েছিল বিদ্রোহে শামিল হতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল একটা নির্ধারিত দিনে (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) দেশের সর্বত্র ভারতীয় সৈনিকরা হঠাৎ নিরস্ত্র ব্রিটিশ অফিসার ও সৈনিকদের আক্রমণ করবে। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের বন্দি করা হবে। আর যারা বাধা দেবে তাদের শেষ করে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই রেললাইন ও টেলিগ্রাফ পোস্ট উপড়ে ফেলা হবে। সর্বত্র কোষাগার লুঠ করা হবে এবং ব্রিটিশদের হাতে বন্দি ভারতীয়দের মুক্ত করে দেওয়া হবে। কাজ সমাধা হওয়ার পর সকলেই লাহোরে মিলিত হবে। কারণ বিদ্রোহের সদর দপ্তর করা হয়েছিল লাহোর। সেখান থেকে সব কিছু পরিচালনা করবেন স্বয়ং রাসবিহারী বসু। তাঁকে সাহায্য করবেন বিনায়ক রাও কিপলে। এছাড়াও কর্মসূচি ছিল ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক লুঠ করা। থানা লুঠ করে অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা। লাহোরের শিখদের লেখা চিঠির মাধ্যমে ঢাকার শিখ সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন লাভ করা। ভারতবর্ষের সর্বত্র গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিদ্রোহীদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশের এক গুপ্তচর কৃপাল সিং ওই বিপ্লবী দলে প্রবেশ করে সব কিছু ব্রিটিশ সরকারের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। বিপ্লবীদের সকলেই ধরা পড়ে যায়। কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতির ফাঁসি হয়ে যায়। রাসবিহারী তখনও পর্যন্ত কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শেষপর্যন্ত ১৯১৫ সালের ১২ মে তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব এই পরিচয়ে এবং পি. এন. ঠাকুর নাম নিয়ে 'সানুকামারু' নামের জাহাজে ছদ্মবেশে জাপানের পথে রওনা হয়ে যান।

৫ জুন ১৯১৫। রাসবিহারী বসু জাপানে পৌঁছে গেলেন। ব্রিটিশ সরকার মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ওপর চাপ দিতে থাকে রাসবিহারীকে জাপান থেকে অবিলম্বে বহিষ্কারের জন্য। এই সংকটকালে তাঁকে রক্ষা করেন জাপানের বামপন্থী 'ব্ল্যাক ড্র্যাগন' পার্টির নেতা মি. তোয়ামা এবং একটি রুটির কারখানার মালিক মি. সোমা। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে মি. সোমার কন্যা তোসিকের সঙ্গে রাসবিহারীর বিবাহ হয়। কিন্তু ১৯২৩-এ জাপানি নাগরিকত্ব লাভ না করা পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে বিপদ মুক্ত হতে পারেননি।

১৯৩৭ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দের এক সভায় তিনি ঘোষণা করেন—'Asia for Asians'। তারপর প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (India

Independence League)। ফিলিপাইনস্, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ, থাইল্যান্ড, সাংহাই, ফরাসি ইন্দোচিন, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি স্থানে ওই ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের শাখাও প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানার সুযোগ এসে যায়।

১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয় টোকিও (Tokyo) সম্মেলন। সম্মেলনে ঠিক হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আরও ঠিক হয় যে, সুভাষচন্দ্র বসু-র জার্মানির ফ্রী ইন্ডিয়া লিজিয়ন-এর অনুসরণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। ১৯৪২-এর ১৫ থেকে ২৩ জুন আর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ককে। ওই ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই পাঁচজন সদস্যের এক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ওই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন স্বয়ং রাসবিহারী বসু। বাকি চারজন সদস্যরা হলেন—মোহন সিং, কে. পি. কে. মেনন, এন. রাঘবন, ও জি. কিউ. জিলানি। ওই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি ছিল জাপান সরকারের কাছে আবেদন করা যে-কোন উপায়ে হোক সুভাষচন্দ্র বসুকে জার্মানি থেকে জাপানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯৪৩ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনের এক বিশেষ বৈঠকে স্বাধীনতা সংঘের সভাপতিকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়। রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র বসু হবেন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী।

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরে ক্যাথে বিল্ডিংস-এর এক বিশাল জনসভায় রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে বলেছিলেন—"এখন থেকে সুভাষচন্দ্রই আমাদের নেতা। আমরা তাই এখন তাঁর আজ্ঞাবাহী সৈনিক মাত্র।"

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা হলে রাসবিহারী বসু হন মুখ্য উপদেষ্টা। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি ওই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হলে সুভাষচন্দ্র তাঁকে "পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক" বলে অভিহিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকে মহাত্মা গান্ধীজিকে উদ্দেশ্য করে নেতাজির অবিস্মরণীয় সম্বোধন—"Father of our Nation, in this holy war of India's liberation we ask for your blessings and good wishes"। অথচ দক্ষিণপন্থী গান্ধী-অনুগামী জওহরলাল, আজাদ, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা গান্ধীজিকে এমন সম্বোধন করার কথা চিন্তাও করতে পারেননি। সুতরাং আজকের প্রজন্মের দেশবাসীদের জানাতে চাই যে, গান্ধীজির 'মহাত্মা' নামটা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি গান্ধীজিকে 'জাতির জনক' নামে অভিহিত করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

এবার বিপ্লবগুরু রাসবিহারী বসু সম্পর্কে শেষ কথাটা বলে নিই। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই আজ একমত যে, ইম্ফল অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণই হল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর আকস্মিক মৃত্যু। ঠিক যখন রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতায় বিধ্বস্ত আজাদ হিন্দের মুক্তি সংগ্রামের ব্যর্থতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি রাসবিহারী বসুর মৃত্যু নেতাজিকে বড়োই অস্থির ও অসহায় করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা সম্পর্কে এ. এন. নায়ার লিখেছেন—"সুদূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব একমাত্র রাসবিহারীর জন্যই সম্ভব হয়েছিল। রাসবিহারী না থাকলে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিংবা সুদূর প্রাচ্যে থাকতে পারতেন না। সুভাষচন্দ্র এ কথা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করতেন এবং রাসবিহারীকে শ্রদ্ধা করতেন।"

(প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৬)

এগারো

# বিপ্লবের নেপথ্য নায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ১৮৮৬ সালে ৫ নভেম্বর হুগলি জেলার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুরের বাগানন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীও ওই একই গ্রামেরই সন্তান। বিপিনবিহারীর মায়ের নাম ক্ষীরোদাদেবী। বাবার নাম অক্ষয়নাথ। এটি ছিল বিপিনবিহারীর মাতুলালয়। পিতা অক্ষয়নাথের জন্ম হয় কবি রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরে। বিপিনবিহারীর বড়ো ভাইয়ের নাম ললিতমোহন। বিপিনবিহারী ও ললিতমোহনের মাঝখানে অক্ষয়নাথের কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। মামার বাড়িতে জন্ম হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর মাতুলালয়ে কাটানোর পর ক্ষীরোদাদেবী স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে হালিশহরে চলে আসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং *বসুমতী* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিপিনবিহারীর অগ্রজ। বহুবাজারে ১৮নং মদন বড়াল লেনের "গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি"র (এ.পি.ডি.আর.) প্রতিষ্ঠাত্রী তিলোত্তমা ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ছিল বিপিনবিহারীর আত্মীয়তা। (১৪ই নভেম্বর, ২০০৫, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতার কড়চা বিভাগ)

শৈশব থেকেই বিপিনবিহারীর প্রকৃতিটা ছিল একটু চাপা স্বভাবের। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁর শৈশবকাল থেকেই গাঙ্গুলী পরিবারের দান, ধ্যান ও জনহিতকর কাজের জন্য অত্যন্ত সুনাম ছিল। পিতা অক্ষয়নাথের পূত চরিত্র এবং জননী ক্ষীরোদাদেবীর মানুষের প্রতি প্রাণ উজাড় করা স্নেহ-ভালোবাসা বিপিনকে আদর্শ চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

১৮৯৫-৯৬ সালে অক্ষয়নাথ বড়ো ছেলে ললিতমোহনের জন্য এবং নিজের জন্যও কাস্টমস্ হাউসে চাকরি পেয়ে কলকাতা চলে আসেন ৪নং দুর্গা পিতুরী লেনের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে। বিপিন তখন ৯-১০ বছর বয়সের বালক। তাকে খেলাত ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই খেলাত ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়ই বিপিনের হরিশ্চন্দ্র শিকদার ও ইন্দ্রনাথ নন্দীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। বলাবাহুল্য, এঁরা দুজনেই বিপিনকে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করে দেন এবং আত্মোন্নতি সমিতি গড়ে তোলায় অনুপ্রাণিত করেন।

**বাল্যজীবন ঃ** উনবিংশ শতাব্দীর শেষটা ছিল আমাদের দেশের যুগসন্ধিক্ষণের সময়। ওই সময়েই ১৮৯৭ সালে আত্মোন্নতি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ১৩নং ওয়েলিংটন লেনে। পরে ওই পাঠচক্রটি স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল খেলাত ইনস্টিটিউশনে। বিপিনবিহারীর যখন ১৩ বছর বয়স তখন তিনি বিপ্লবী ইন্দুভূষণ নন্দীকে এক চিঠি লিখেছিলেন যার সারমর্ম ছিল—"দেশের স্বাধীনতা লাভই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে

আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।" পরবর্তীকালে বিপিনবিহারী করেছিলেন ঠিক তাই।

**জাতীয় সম্মানরক্ষী দলের স্বেচ্ছাসেবকরূপে :** উনিশ শতকের শেষ ভাগে আর বিশ শতকের প্রথম ভাগে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা স্ট্রিট, চৌরঙ্গি ইত্যাদি থেকে লালদিঘির আশপাশ পর্যন্ত অঞ্চলটি ফিরিঙ্গি অধ্যুষিত ছিল। এইসব বিজাতীয়রা তখনকার দিনে বাঙালি তথা ভারতীয়দের দেখতে পেলেই তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও গালাগালি করত। এজন্যই আত্মোন্নতি সমিতির প্রথম কর্মসূচি হয়েছিল ওইসব অপমানের উপযুক্ত জবাব দিয়ে শেষপর্যন্ত তা বন্ধ করা। বিপিনবিহারী তখন সবেমাত্র বাল্যাবস্থা থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সমিতির ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা করে দেহের বলও বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর। কাজেই তিনি তখন যোগ দিয়েছিলেন সমিতির জাতীয় সম্মানরক্ষী শাখায়। এইভাবেই শুরু হয়েছিল বিপিনবিহারীর দেশ ও দেশবাসীদের সম্মান রক্ষার কাজ। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা স্ট্রিট বরাবর চৌরঙ্গি ও লালদিঘি অঞ্চলে বেশ কিছুটা নিরাপত্তার ভাব দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয় এইভাবে বিপিনবিহারী ধীরে ধীরে কিশোর নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯০২ সালের প্রথম দিকে মাত্র ষোলো বছর বয়সে—সমিতির নির্দেশে ওই অঞ্চলের পাহারায় নিযুক্ত হন তিনি। একদিন পাহারারত অবস্থায় তিনি দেখতে পান যে ২-৩ জন ফিরিঙ্গি গোরা একটি বাঙালি তরুণকে ভীষণভাবে উত্যক্ত করছে। দেখামাত্র বিপিনবিহারী ওই বাঙালি তরুণটিকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন এবং ওই ফিরিঙ্গিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ওই তরুণটিকে নিয়ে আত্মোন্নতি সমিতির অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন। অফিসে তখন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সিকদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিপিনবিহারীর মুখে ওই তরুণটির সাহসের কথা শুনেই তাকে তখুনি সমিতির সদস্য করে নেন। "বলাবাহুল্য এই সময় বিপিনও একজন ভালো লাঠি খেলোয়াড় ও মুষ্টিযোদ্ধা হইয়া পড়িল।....... ক্রমশ সকলেই তাহার আদেশবাহী হইতে লাগিল। বিপিনও নেতা হইয়া পড়িল।" (*নয়া সমাজ*, কার্তিক, ১৩৫৭)

**স্বামীজির অনুজ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয় :** ১৯০২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে বিপিনবিহারী এফ. এ. পড়ার জন্য রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। ঠিক ওই সময় ৪ জুলাই ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরটি শুনে মর্মাহত বিপিনবিহারী হঠাৎ বলে উঠেছিলেন—"লোকটির সঙ্গে ভালো করে মেশা হল না। তাঁর কে কোথায় আছেন খুঁজে বার করতেই হবে।" শীঘ্রই চেনা হয়ে গেল স্বামীজির ছোটো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। বিপিনবিহারী কালবিলম্ব না করে ভূপেন্দ্রনাথকে আত্মোন্নতি সমিতিতে নিয়ে এলেন। তারপর ওই দুটি জীবনের কাজের ধারা গাঁথা হয়ে গেল একই তারে। এরপর ওই রিপন কলেজে পড়ার সময়ই বিপিনবিহারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় লোকমান্য তিলক, প্রমথনাথ মিত্র প্রমুখ দিকপাল নেতাদের সঙ্গে।

**রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে সভা ঃ** বিপিনবিহারীর বিপ্লবী জীবনের প্রস্তুতি পর্বে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হয়ে যাবে। ঘটনাটি রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের ওই সভায় আবির্ভাব ঘটা। ভগ্নী নিবেদিতার কাছে বাংলার তরুণদের বিদ্রোহী মনোভাবের কথা জানতে পেরে তাঁরা তখন ওই সভায় যোগদানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। বাংলায় একটি কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য এই উপলক্ষ্যে ওই গৃহ প্রাঙ্গণে একটি সভা ও শরীরচর্চা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সভাপতিত্বে। ওই অনুষ্ঠানে আত্মোন্নতি সমিতির পক্ষ থেকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ষোল বছর বয়সের কিশোর বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন অন্যতম। আর ঠিক ওই সময়েই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমারের তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সংস্থার সূচনা হয়েছিল তখনকার সুকিয়া স্ট্রিট থানার কাছে একটি উপযুক্ত প্রাঙ্গণে। নাম রাখা হয়েছিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি। আর যাই হোক এই সুযোগে বিপিনবিহারীর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে।

অরবিন্দ ঘোষের প্রথম কলকাতায় পদার্পণ ১৯০৩ সালে। তখন উঠেছিলেন মধ্য কলকাতার একটি মেসে। ওই মেসেই আত্মোন্নতি সমিতির আর একজন সদস্যও থাকতেন যাঁর নাম বিভূতিভূষণ সরকার। এই বিভূতিভূষণ সরকারের মাধ্যমেই আত্মোন্নতি সমিতির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

**১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলন ঃ** এইভাবে যখন বাংলার বিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেই সময়েই শুরু হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গবিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলন। আর সেই স্রোতেই গা-ভাসিয়ে গড়ে উঠেছিল কলকাতার 'শিবাজি উৎসব' পান্তির মাঠে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে)। ফলে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ দিকপাল নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় বিপিন বিহারীর। তিনি ওই আন্দোলনের স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন। ভগ্নী নিবেদিতার প্রাণমাতানো ধ্বনি—"Hero's choice is made in a flash" বিপিনবিহারীকে সম্মোহিত করে তোলে।

**সংগঠনের কাজ—১৯০৬ সাল ঃ** এরপর মুরারিপুকুরের ঘটনা এই সময় ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিভূতিভূষণ সরকার প্রমুখ আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্য তাঁদের মূল সমিতির সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক ত্যাগ করে মুরারিপুকুরের বাগানে প্রবেশ করেছিলেন। বিপিনবিহারী প্রভৃতিরও ওই পরিকল্পনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সন্তর্পণে এবং সকল দিক বজায় রেখে। পরবর্তীকালে (১৯১৭) সরকারি গোপনীয় নথি থেকে জানা যায় যে, আত্মোন্নতি সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেরই 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে এবং বাগানে

ঘন ঘন যাতায়াত চলত। ওই সময় (১৯০৭-০৮) তাঁদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। এই সমিতির কার্যপ্রণালী সম্ভবত ছিল অধিকমাত্রায় বাস্তবভিত্তিক। কলকাতার অনুশীলন সমিতির তুলনায় আড়ম্বরের ভাগ কম ছিল, যদিও রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধীয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদেরও ছিল।

**জামালপুরের দাঙ্গা (১৯০৭) ঃ** বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে ইংরেজদের প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯০৭ সালের এপ্রিলের দাঙ্গার কাহিনি সংবাদপত্রে দেখা মাত্র বিপিনবিহারী ও হরিশ্চন্দ্র সিকদার প্রমুখ সমিতির প্রথম সারির সদস্যরা এক গুপ্ত সভায় মিলিত হয়ে এই ব্যাপারের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিমেষে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে পরের দিনই তাঁরা উপদ্রুত অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে যায়। সেই দলে যে সাতজন প্রথম সারির সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যেও অগ্রণী ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

আত্মোন্নতি সমিতির মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে থাকলেও সমাজসেবা ছিল আরও স্পষ্টতর। আর ওই সমাজসেবার ব্যাপারেও সব সময়ই পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। আর ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত দুস্থের সেবা তখনকার দেশকর্মীদের কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হত। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা, অসহায়কে সাহায্য করা, শবদাহ প্রভৃতি ব্যাপারের কোনটাতেই বিপিনবিহারীকে পেছপাও হতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে, এমনকি গা-ঢাকা দেওয়া অবস্থাতেও, তার কোনো অন্যথা হয়নি।

**গোয়েন্দা নন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত ঃ** ১৯০৬-০৭ সালের ঘটনাবলির আলোচনা করলে দুটি বিষয় বিশেষ ভালোভাবে চোখে পড়ে। প্রথমত, *যুগান্তর, সন্ধ্যা* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের দৌরাত্ম্য ও বিচারের প্রহসনের অবসান ঘটানো। *বন্দেমাতরম* পত্রিকায় মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৫-১৬ বছরের কিশোর সুশীল সেনের সঙ্গে এক ফিরিঙ্গি সার্জেন্ট ই. বি. হুই-এর বিচারালয়ের প্রবেশ পথে ঘুষোঘুষি হয়ে যায়। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বিচারের প্রহসনের পর সুশীলকে ষোলটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ওই সুশীল সেনও আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য ছিলেন আর বিপিনবিহারীও ছিলেন সুশীল সেনের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার গুরু। বলাবাহুল্য এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত বিপ্লবীরা এক গুপ্ত সমিতির সভায় কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ফলে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এরপরই আত্মোন্নতি সমিতির পরবর্তী সভায় বিশ্বাসঘাতক গোয়েন্দা নন্দলাল ব্যানার্জীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নন্দলালের প্রায়শ্চিত্তের কাজে (৯/১১/১৯০৮) নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের দলের আদি সভ্য শ্রীশচন্দ্র পাল। আর দ্বিতীয় যে তরুণটি নিযুক্ত হয়েছিল সে হল হাওড়া শাখার রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এখানেও যবনিকার অন্তরালে ছিলেন বিপিনবিহারী

তাঁর বিপ্লবী বন্ধু কোন্নগরের নিবারণচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে। এপ্রসঙ্গে বিপিনবিহারীর উক্তিটি আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে—"অব্যর্থ লক্ষ্য, ব্যানার্জী ওইখানেই শুয়ে পড়ল। তবে ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও সেদিন তার নিস্তার ছিল না।" এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে আসলে রণেন্দ্রনাথ ছিলেন হালিশহরেরই অধিবাসী আর বিপিনবিহারীর নিজের হাতেই তৈরি।

একদিকে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) একের পব এক গুপ্ত সমিতি গড়ে চলেছেন যদিও তিনি ছিলেন সরকারি কর্মী (লাট সাহেবের স্টেনো)। অপরদিকে ননীগোপাল গুপ্তের শিবপুরের দল এবং বিমলাচরণ দে পরিচালিত ভবানীপুরের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতেন বিপিনবিহারী।

**সর্বদলীয় সংযোগ প্রচেষ্টা (১৯১০-১১) :** ছোটো ছোটো গুপ্ত সমিতিগুলি ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় শিবপুরের কাছে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় একটি সভা হয় যার আহ্বায়ক ছিলেন মুন্সেফ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় না। তবে ছোটো বড়ো সব সমিতিরই মুষ্টিযুদ্ধের শিক্ষক নিযুক্ত হবেন বিপিনবিহারী এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগে চলতে থাকে গুপ্তভাবে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। এই সময় থেকেই বিপিনবিহারীর সংস্পর্শে আসেন গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম জীবনে যিনি কলিন্স স্কুলের এবং পরবর্তীকালে বহুবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) ও স্বনামধন্য খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বরানগরের তরুণ বিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (বাঁটুল) বিপিনবিহারী সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"বিপিনদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বরানগরের কুটিঘাট জিমন্যাস্টিক ক্লাবে ১৯১৩ সালে। বিপিনদা ওখানে আসতেন বকসিং, লাঠি ও তলোয়ার খেলা শেখাতে।"

**ননীগোপাল গুপ্ত ও হাওড়া গ্যাং কেস (১৯০৯-১০) :** ১৯০৬ সাল থেকেই এই প্রচেষ্টার অন্তরালে ছিল বাঘা যতীনের প্রেরণা এবং বিপিনবিহারীর আন্তরিক সহযোগিতা। এখানে ননীগোপালের ছোটোভাই হারান চন্দ্রের উক্তিটা দেখা যেতে পারে। "হ্যাঁ, বিপিনদাকে চিনতুম, তাঁর গায়ের রংটা একটু ফর্সা ছিল। দেখতে একটু মোটা-সোটা। আর চোখে একটা চশমা থাকত। তিনি প্রায়ই দাদার কাছে (ননীগোপালের কাছে) আসতেন। তবে একটু রাত করে। এই হাওড়া গ্যাং কেসে ননীগোপাল ও যতীন মুখার্জীকে সামশুল আলম গ্রেপ্তার করিয়ে দেন। তবে বিপিনদাকে ধরতে পারা যায়নি। এই মামলার শিরোনাম হয়েছিল—'কিং এমপারার অ্যান্ড আদার্স নোন অ্যান্ড আন্‌নোন।' বিপিনদা ছিলেন আন্‌নোনদের 'অন্যতম'।

**হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন :** আই.সি.এস.সি. নিকসন তাঁর বিবরণীতে লিখেছিলেন—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে হেমচন্দ্র ঘোষের যোগাযোগ হয়েছিল ১৯১৩ সালে। ওব্রেয়ল সাহেবকে নিধনের প্রচেষ্টার ঠিক আগে। ওই ওব্রেয়ল সাহেব একজন ভারতীয় যুবকের পেটে লাথি মেরে তাকে মেরে ফেলেছিলেন। কেন্দ্রীয় বিপ্লব সমিতি

গঠনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও হয়েছিল ওই ১৯১৩ সালেই যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর ঐকান্তিক সক্রিয়তায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও সফল হতে পারেনি।

**রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ (অগাস্ট ১৯১৪) :** বিপিনবিহারী প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টায় বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া শ্রীশচন্দ্র মিত্র (ওরফে হাবু), অচিরেই বেশ পরিণত হয়ে উঠল। এদিকে আত্মোন্নতি সমিতির চেষ্টায় তাঁর একটি কাজেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল ম্যাডান কোম্পানিতে। উদ্দেশ্য আপিস সংক্রান্ত কাজে তাঁকে পোক্ত করে তোলা। ওই সময় বিপিন গাঙ্গুলীর এক অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন কালিপদ মুখার্জী (পরবর্তীকালের মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী নয়)। এই কালিপদ মুখার্জী ছিলেন কলকাতার কামান-বন্দুক বিক্রেতা রডা কোম্পানির অফিসের আবাসিক কর্মচারী। কোম্পানির গুদাম প্রাঙ্গণেই ছিল কালিপদ বাবুর বাসস্থানের ব্যবস্থা। কালিপদ বাবুর চেষ্টাতেই বিপিনবাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্রের (হাবু) জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেন রডা কোম্পানিতে। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই হাবু নিজের কর্মদক্ষতায় রডা কোম্পানিতে জেটি ক্লিয়ারিং ক্লার্কের পদে উন্নীত হয়ে যান।

ম্যাডান কোম্পানির চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অল্প মাইনের চাকরি গ্রহণ করায় গোয়েন্দা বিভাগের চোখে কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। এই সন্দেহের জবাব দিতে শ্রীশচন্দ্র বলেছিলেন যে খোদ ব্রিটিশ কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার একমাত্র কারণ ভবিষ্যতে উন্নতির আশা। অস্ত্র-ব্যবসায়ী রডা কোম্পানির অফিসে শ্রীশচন্দ্র যোগ দিয়েছিলে ১৯১৩ সালের অগাস্ট মাসে। ১৯১৪ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত তিনি মাল খালাসের কাজ চালিয়েছিলেন নিখুঁতভাবে। কোম্পানির সন্দেহের কোন পথই তিনি রাখেননি। যদিও ইতিমধ্যে তিনি একবার কিছু টোটা সরিয়ে এনে বিপিনবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিপিনবাবু তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পিস্তল ছাড়া শুধুমাত্র টোটায় কোন কাজই হবে না। এর পরই ১৯১৪ সালের ২৬ অগাস্ট (বুধবার) শ্রীশচন্দ্র 'ট্যাকটিসিয়ান' নামে জাহাজে পাঠানো কোম্পানির মাল খালাস করার সময় ৫০টি মাউজার পিস্তলে ভরা একটি পেটি, আর পাঁচশত নকল টোটাসহ ছেচল্লিশ হাজার আসল টোটায় ভরা আটটি বাক্স একটি বলদ-টানা গাড়িতে বোঝাই করে সরাসরি অনুকূলচন্দ্রের দরজার সামনে মলঙ্গা লেনের মোড়ে হাজির করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সবচাইতে কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কালিদাস বসু, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, হরিশচন্দ্র সিকদার থেকে শুরু করে হরিদাস দত্ত, শ্রীশচন্দ্র পাল প্রমুখ আত্মোন্নতি সমিতির বিভিন্ন সভ্যদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবার ওপরে অন্তরাল থেকে সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় ছিলেন নেপথ্য নায়ক ও বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। অস্ত্রগুলি ঠিকমতো সরিয়ে আনবার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত সব কিছুতেই বিপিনবিহারীর তত্ত্বাবধান ছিল অব্যাহত। তারপর দল-মত নির্বিশেষে তিনটি করে পিস্তল আর এক হাজার টোটা, এক একটি নতুন ট্যাংকে ভরে বিতরণের কাজ শেষ করে, উদ্বৃত্ত অংশগুলি তখনকার মতো বাখা হয়েছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের জিম্মায়। যাঁদের নাম তখনও পর্যন্ত

গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় ওঠেনি। এইভাবেই একটি অংশ পাঠানো হয়েছিল হাওড়া জেলার রণেন গাঙ্গুলীর বাড়িতে (১২ নং, গৌরমোহন ব্যানার্জী লেন, ব্যাটরা)। ওই সময় বিপিনবিহারীর আর এক বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন বীরভূমের নিবারণচন্দ্র ঘটক। নিবারণের মাধ্যমে তাঁর মাসি দুকড়িবালা দেবী এক সময় বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন স্বয়ং বিপিনবিহারীর কাছে। প্রয়োজনের তাগিদে হাওড়া থেকে নিয়ে ওই উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র দুকড়িবালা দেবীর হেফাজতে রেখে আসতে হয়েছিল (১৯০৫)। তবে ওই অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিতরণ ও গ্রহণের ব্যাপারে দলীয় খেয়োখেয়ির মধ্যে পড়ে শেষপর্যন্ত সেগুলি পুলিশের হাতে পড়ে যায়। ফলে দুকড়িবালাকে গ্রেপ্তার বরণ করে অশেষ নির্যাতন ও শেষপর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, এই বীরাঙ্গনাটিই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম দণ্ডপ্রাপ্তা নারী।

অপরদিকে বিপিনবিহারীকে তখনও (১৯১৪-১৫) বাকি অস্ত্রশস্ত্রগুলি রক্ষা করার চেষ্টায় এবং বিপ্লবীদের আত্মগোপনের ব্যবস্থার জন্য নিজে গা-ঢাকা অবস্থাতেও সবিশেষ সক্রিয় থাকতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, অস্ত্রশস্ত্রগুলি যথাস্থানে আনাবার জন্য অনুকূলচন্দ্রের পরিচিত গাড়োয়ান 'আকবর দোসাদের' সঙ্গে ছিলেন গাড়োয়ান বেশে বিপ্লবী হরিদাস দত্ত। ১৯১৪ সালের ২৬ অগাস্ট বুধবার সন্ধ্যা ৫টা ৬ মিনিটের সময় দার্জিলিং থেকে শ্রীশপাল রওনা হয়েছিলেন 'হাবু' তথা শ্রীশচন্দ্র মিত্রকে রেখে আসবার জন্য ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের বাড়িতে। কাজেই শ্রীপাল ফিরে এলে তাঁর আত্মগোপনের ব্যবস্থা করাটা ছিল অপর এক অতিশয় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনবিহারী ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বড়োবাজারের দরমাহাটা অঞ্চলের শুঁড়িপাড়ার একটা বাড়ির তিনতলার একটা ঘরে। হরিদাস দত্তকে সঙ্গে নিয়ে। বিপিনবিহারী তখন ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী' আর হরিদাস দত্তের নাম হয়েছিল 'অতুল' ওরফে 'কুঞ্জ'। শ্রীশপাল ফিরে আসার পর 'গুণিন' নাম নিয়েই ওখানেই থেকে গিয়েছিলেন, তবে মূল কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার ভার ছিল হরিশ্চন্দ্র সিকদারের ওপর। কারণ তখন তিনি একটি ইউরোপিয়ান ফার্মে কাজ করতেন বলে গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহটা তাঁর ওপর ছিল না।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ২৬ অগাস্ট তারিখের পর থেকে ২৯ অগাস্ট বিকেল পর্যন্ত রডা কোম্পানির দিক থেকে পুলিশকে কোনো খবরই দেওয়া হয়নি। কারণ শ্রীশ তথা 'হাবুর' কর্মদক্ষতায় কর্তৃপক্ষ এতই খুশি ছিলেন যে ওই পরিস্থিতিতে তাঁরা বেশকিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ওই অবস্থার অন্তরালে বিপিনবিহারীর একান্ত সুহৃদ ও রডা কোম্পানির আবাসিক কর্মচারী কালিপদ মুখার্জীর নিভৃত অবদানও অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল।

এরপর বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছিল উদ্বৃত্ত টোটাগুলোর রক্ষা করার ব্যাপারে। কাজেই ছদ্মনামধারী সুরেশ গাঙ্গুলীকে তখন বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল বড়োবাজারের গলি-খুঁজির

মধ্যে ঘুরে ঘুরে গুদাম ভাড়া করার চেষ্টায়। সঙ্গে থাকতেন 'কুঞ্জ' বা অতুল নামে তাঁর প্রিয় শিষ্য—হরিদাস দত্ত। এইভাবে সেদিন বাঁশতলার গলি, ৩৪ নং শিবঠাকুরের গলি, ৩নং কানুলালের গলি প্রভৃতি স্থানে একাধিক গুদাম ভাড়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছু টোটা এবং সেই সঙ্গে বড়ো বড়ো খালি প্যাকিং বাক্স আনিয়ে নিয়ে উক্ত গুদামগুলিতে সেইগুলি রক্ষা করার চেষ্টা চলে। তবে বড়োবাজার অঞ্চলে ওই সব সংরক্ষিত মালের অধিকাংশই পরে পুলিশের হাতে চলে যায়। ওইগুলির পূর্ণাঙ্গ রক্ষা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। শিবঠাকুরের গলিতে গুদাম পরিদর্শনে গিয়ে হরিদাস দত্তকে শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিল। উক্ত অবস্থায় বিপিনবিহারীকে শুঁড়িপাড়ার আশ্রয় ছাড়তে হয়। তিনি তখন বন্ধু শ্রীশ পালকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় বরাহনগর অঞ্চলে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে। এখন থেকে তাঁর আত্মগোপন চলে বরাহনগরের আশেপাশে। অনেকটা ঠিক এমনি সময়ে, উক্ত অস্ত্র সরানোর খবরাখবর পেয়ে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু কাশী থেকে শচীন সান্যালকে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর ভাষায়—"শচীন কলকাতায় আসে এবং এটা কাদের কাজ আমার কাছে জানতে চায়।.....তাকে বিপিনদার কাছে পৌঁছে দিই।" (*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*—পৃঃ ৩০০)। প্রসঙ্গত উক্ত অস্ত্র সংগ্রহের পরে ভারতীয় বৈপ্লবিক চিত্র সম্বন্ধে রাওলাট সাহেবের অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে "—এটা অনস্বীকার্য যে রডার অস্ত্র লুঠের আগে সাধারণ পদ্ধতিতে প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রভাব সমস্তই সেদিন বিপর্যস্ত হয়েছিল।" (Sedition Committee Report 1918, p. 142)

**রাসবিহারীর বিপ্লব পরিকল্পনা ১৯১৫ ঃ** ওই সময় মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বিপ্লবের পরিকল্পনা প্রসারিত হয়েছিল পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ বা বারাণসী ইত্যাদি থেকে বার্মা পর্যন্ত। পরবর্তীকালে রাওলাট সাহেবের বিবরণীতে এই খবর খুব পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় (অনুচ্ছেদ—৬৭)। বাংলার দায়িত্ব সেদিন পড়েছিল যতীন মুখার্জীর ওপর। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ ও দখল করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (পরবর্তীকালে এম. এন. রায় নামে বিখ্যাত) সঙ্গে নিয়ে। পরবর্তীকালে রচিত সরকারি গুপ্ত-বিবরণীর একাংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"The Calcutta Party under Narendra Nath Bhattacharya and Bipin Ganguly were first to take possession of all arms and arsenal around Calcutta, then to take Fort William and afterwards to sack the town of Calcutta." (Confidential Account of the Revolutionary Organisation in Bengal, other than Dacca Anusilan Samity—Compiled by J. C. Nixon I.C.S.—1917 p. 93)

**"অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পরিচালনায় কলকাতার দলের প্রথম অস্ত্রগুলি হস্তগত করার কথা ছিল। (জার্মানি থেকে যে অস্ত্রসম্ভার আসবার কথা ছিল তা**

পথে আটকে পড়ে যায়।) পরে শহরের আশেপাশে অবস্থিত অস্ত্রাগার লুঠ ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবরোধ করে কলকাতাকে ছিনিয়ে নেবার ব্যবস্থা।" বিপিনবিহারীর অনুরক্ত সহচর বরাহনগরের খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে বাঁটুল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বিপিনদার তখন আত্মগোপন অবস্থা। পাঞ্জাবির বেশ। ওঃ ! সে কী খাসা চেহারা। বিপিনদা তখন দাড়ি রেখেছিলেন। পাঞ্জাবিদের মতো তাতে জাল বাঁধতেন। হাতে বালাও পরতেন। গালে তখন তাঁর একটি বড়ো তিল ছিল। (পরে প্রয়োজনবোধে সেটি কেটে ফেলেছিলেন) ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত এইটিই ছিল তাঁর মোটামুটি আত্মগোপনের চেহারা। দাড়ি গোঁফ যুক্ত টক্‌টকে রং, সুঠাম দেহ, পাঞ্জাবির বেশে তাঁর তখন শুরু হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে অবাধ যাতায়াত। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। ফটকের পাহারাদারেরা তাঁকে কিছুই বলত না। ভাবত সৈন্যদের আপনজন।"

গোয়েন্দাদের কীভাবে ফাঁকি দিতেন তা তাঁর মুখ থেকে শোনা—বিশিষ্ট বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তাঁর ছোটো ভাই বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তাঁদের ভাগ্নে বিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের তিনজনের সঙ্গে বিপিনদা মাঝে মাঝে আমাদের ফাল্গুন দাস লেনের বাড়িতে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের ফাল্গুন দাস লেনের বাড়িতে বসে কীভাবে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিতেন নিজের মুখে বলতেন। দুটো কাহিনির কথা আজও মনে আছে।

প্রথমটি হল একবার তিনি একটা ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বসে বাগনান যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, সেই একই কামরায় একজন গুপ্তচর একটু দূরে বসে আছে। গাড়ি ছাড়বার বাঁশিও ইতিমধ্যে বেজে গেলে ট্রেনটিও ছেড়ে দিল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ট্রেনের দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়েন। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ায় গুপ্তচরটি ট্রেন থেকে নামতে পারলেন না। বিপিনদা কিন্তু অসাধারণ তৎপরতায় পেছনের কামরায় উঠে পড়েন এবং যথারীতি বাগনানে পৌঁছে যান। পরে কলকাতায় ফিরে, এক সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন পদস্থ পুলিশ অফিসারের দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে এসেছিলেন—"তোমরা আমাকে এত খুঁজছ। এই দ্যাখ তোমাদের দরজায় হাজিরা দিয়ে গেলুম। ধরতে পারলে না।"

দ্বিতীয় যে কাহিনিটি বলেছিলেন তা কিন্তু আরও চমকপ্রদ। মধ্য কলকাতার ১৬নং শাঁখারিটোলা লেনের বাড়ির ছাদ থেকে (তখন নাম ছিল শাঁখারিটোলা ইস্ট লেন) চার-পাঁচটা বাড়ির ছাদ লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে ছুঁতে পারেনি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রের কথা—"এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই ........ এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতো বড়ো গভর্নমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেলো।" (*পথের দাবী*, পৃঃ ৬০)

## বিপ্লবীদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২০-২১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে অর্থাৎ ১৯১৯-২০ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সংগ্রামের নতুন হাতিয়ার ও আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। দেশবন্ধুও প্রথম দিকে ভীষণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন গান্ধীজির ওই অসহযোগ আন্দোলনকে। ওই সময় আত্মোন্নতি সমিতির এক ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক হয় যে, গান্ধীজির নতুন পন্থার ফলাফল দেখবার জন্য তাঁরা (অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবীরা) বেশ কয়েক বছর অপেক্ষায় থাকবেন। অর্থাৎ নিজেদের বৈপ্লবিক পন্থা বেশ কিছুদিন স্থগিত রাখবেন। কিন্তু বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী কিছুতেই যেন মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। তবুও শেষপর্যন্ত তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর ওই সিদ্ধান্তের পেছনে দুটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ করা যায়। প্রথমত, নিজের স্বভাবসুলভ কর্মময় জীবনের প্রেরণা। আর দ্বিতীয়ত, পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার এক অসামান্য ও জন্মগত দক্ষতা।

## অন্তরের চাপা আগুন (১৯২১ সাল)

বিপিনবিহারীর হরিহর আত্মা বন্ধু খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অনেকটা ওই সময়েই মুক্তি পেয়েছিলেন। সদ্যকারামুক্ত খগেন্দ্রনাথ একদিন ভোরে তাঁর একান্ত অনুরাগী ভক্ত খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে বাঁটুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বলেন যে, "বাটুল, একবার বিপিনবাবুর বাড়িতে যাও।" নেতার নির্দেশে বাঁটুল তখনি দুর্গা পিতুরী লেনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বেলা তখন প্রায় সকাল ৯টা। বিপিনবিহারী তখন একটা বড়ো অলেস্টার পরে বেরিয়ে এসে তাঁকে একটু বসতে বলে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। বাঁটুল সেদিন সারা দিনই ওইভাবে বসে রইলেন। সকাল ৯ টা থেকে সন্ধেবেলা পর্যন্ত। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে তাঁর অলেস্টারের বড়ো পকেট থেকে তিনটে পিস্তল আর কিছু টোটা বার করে বাঁটুলের হাতে দেন এবং বলেন—"এগুলি খগেনবাবুর হাতে দাওগে যাও। কি করি বল এসবই সেই রডা কোম্পানিরই মাল, আন্দুলে এক জায়গায় মাটির মধ্যে চাপা ছিল। সময়ে কাজে লাগবে।" তাঁর জীবনে উগ্র বৈপ্লবিক আদর্শনিষ্ঠার এটি যে একটি বিশেষ পরিচয় সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

## আত্মোন্নতি সমিতির যুবগোষ্ঠী (রিভোল্ট গ্রুপ)

এদিকে বিপিন গাঙ্গুলীরই আদর্শের অনুগামী সন্তোষ মিত্র প্রমুখ যুবগোষ্ঠী ক্রমে মুক্তির পরে বাইরে এসে দেখেন এক ছন্নছাড়া পরিবেশ। বয়োবৃদ্ধদের অনেকেই নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। উক্ত তরুণদের তখন প্রাণের তাগিদ—"আগুন নিভতে দিলে চলবে না।"

তাঁরাও তখন পরামর্শের জন্য ছুটেছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ প্রধানদের কাছে, আর তাঁদের নির্দেশে ধাক্কা দিয়েছিলেন প্রতিটি

আদর্শভ্রষ্ট বিপ্লবীর দরজায়। শেষে আলোচনার জন্যে এক অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটেছিল সন্তোষ মিত্রের বাড়িতে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ার পরেই ওই যুবগোষ্ঠীর কাজ চলেছিল বিপিনবিহারী প্রমুখ দু-একজন নেতাব পরামর্শে আর তাঁদেরই বলা হত তখন 'রিভোল্ট গ্রুপ'।

## কংগ্রেসে দেশবন্ধুর যুগ (১৯২১-২২)

১৯২১-২২ সাল ছিল দেশবন্ধুর যুগ। তিনি তখন প্রদেশ বাংলা কংগ্রেস (বি.পি.সি.সি.) সভাপতি। আর তাঁরই অর্থে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) পূর্বদিকে 'ফরবেস ম্যানসন' নামে একটা বিশাল বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। সেখানে একদিকে ছিল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়। অপরদিকে প্রচার বিভাগ। স্বেচ্ছাসেবকদের আবাসস্থল এবং মধ্য কলকাতা কংগ্রেসের ঘাঁটি। আত্মহারা বিপিনবিহারী ছিলেন সেখানকার আবাসিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদেব প্রধান পবিচালক। ফলে বাংলার তরুণদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। তবে এই কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আবার কারাবাসও ঘটে গিয়েছিল।

## টেগার্ট বধের চেষ্টা এবং গোপীনাথ সাহার ফাঁসি

কারামুক্তির পরে ৪নং দুর্গা পিতুরী লেনে হঠাৎ তাঁকে দেখা গিয়েছিল একটি তরুণের সঙ্গে গল্পগুজব করতে। এই শান্তশিষ্ট তরুণটি ছিলেন হুগলি বিদ্যামন্দিরের ছাত্র, নাম গোপীনাথ সাহা—অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের আবিষ্কার। টেগার্ট নিধনের চেষ্টায় ইনিই শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি। আর বিচারকের কাছে তাঁরই স্বীকারোক্তি—"হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ কমিশনার সাহেবের বিনাশ সাধন করা। ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত। নিজের জীবন দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করতে আমি তৈরি আছি।" ফাঁসির সময় তাঁর দেহের ওজন পাঁচ পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল। অমর শহিদ ক্ষুদিরামেরই যেন দ্বিতীয় সংস্করণ। ফাঁসির মঞ্চে উঠে তাঁর শেষ কথাটি বলেছিলেন—"আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।"

## গা ঢাকা দেওয়া, না, অসাধ্য সাধন?

আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা।
হাতে মোর তারি তো বরণ ডালা।

(রবীন্দ্রনাথ ঃ বলাকা)

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরের শেষ। বিপিনবিহারী তখন ছিলেন ১৬নং শাঁখারিটোলার বাড়িতে। একদিন শেষরাতে পুলিশ এসে বাড়িটি ঘিরে ফেলল। তিনিও তখন ধরা দিতে একেবারেই রাজি নন। শীতের ঠান্ডা উপেক্ষা করে—খালি পায়ে, খালি গায়ে—ওই বাড়ির

ছাদে উঠে গিয়ে ছাদের পর ছাদ টপকে, পাঁচিল ডিঙিয়ে—লোকের বাড়ির ভেতর দিয়ে গলি-খুঁজি পার হয়ে ক্রিক রো-তে এসে পৌঁছোলেন। তারপর শুরু হল তাঁর পদযাত্রা সারকুলার রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বরাহনগরের দিকে। এইভাবেই ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই অভাবিতভাবে পৌঁছে গেলেন তাঁর প্রিয় খগেন ব্যানার্জী ওরফে বাঁটুলের বাড়িতে। এইভাবে গোটা ১৯৩২ সালটা ধরে আত্মগোপনে থেকেও তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্মের ধারাটাকে চালিয়ে এসেছিলেন।

অপরদিকে তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে খগেন ব্যানার্জী, নন্দ চ্যাটার্জী প্রভৃতির ওপরে চলতে লাগল পুলিশের জুলুম ও নির্যাতন পূর্ণ উদ্যমে। ঠিক ওই সময় বিপিনবাবুর কপালে বের হয়েছিল একটা বড়ো আকারের আঁচিলও। তখন উনি কটকে আত্মগোপনে ছিলেন। আঁচিলটা হতেই তিনি খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন দেখছি শেষপর্যন্ত এই আঁচিলটাই হবে আমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক identification mark। শেষে একদিন নিজেই অ্যাসিড জোগাড় করে আঁচিলটাকে পুড়িয়ে দিলেন। ওই সময় তাঁর এক সেট নকল দাঁতও ছিল। সেটিকে পালটে এক সেট এবড়ো-খেবড়ো দাঁত করাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য বাঁটুলের (খগেন ব্যানার্জীর) সাহায্যে।

পুরো দীর্ঘ সময় গা-ঢাকা অবস্থায় তিনি অন্যান্য দেশেব বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও মতবাদের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। দেউলিতে তিনি ছিলেন ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। আর বহরমপুর বন্দি-শিবিরে ছিলেন ১৯৩৭-৩৮ সালে। দেউলিতে এসে তাঁর পুনর্মিলন হয়েছিল হেমচন্দ্র ঘোষ, খগেন চ্যাটার্জি, খগেন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, তিনকড়ি গাঙ্গুলী, প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে। তখনই শুরু হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের দেশ ছাড়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা।

## মুক্তির পরে, ১৯৩৮-৪৭

বিভিন্ন বন্দি-শিবির ঘুরে ১৯৩৮-এ তিনি মুক্তি পেলেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ঘটে গেল ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি। আশ্চর্যের ব্যাপার সুভাষচন্দ্রের ঘর ছাড়ার পরই গান্ধীজিও কেমন যেন বদলে গেলেন। ৪ বছর ধরে (১৯৩৮-১৯৪২) সুভাষচন্দ্রকে বিমুখ করার পর ১৯৪২ সালের ৮-৯ অগাস্টের মধ্যরাত্রে তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—'Quit India' (ভারত ছাড়ো)। গান্ধীজি বললেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—(করো অথবা মরো)। তরুণ সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল জাতির জনকের আবেগ।

## সেবার কাজে—১৯৪৭

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় (Great Calcutta Killing) থেকে বিপিন-বিহারীকে দেখা গিয়েছিল নিরীহ মানুষদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে।

অন্যদিকে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন প্রভৃতি স্থান যখন নির্যাতিত বাস্তুহারা নর-নারীতে উপচে উঠতে থাকে তখনও তাঁকে দেখা গিয়েছিল তাঁদের সেবায়। বিভিন্ন সেবাদল গঠন করে তাঁদের পরিত্রাণের চেষ্টার ব্যাপারেও বিপিনবিহারীর ভূমিকা বড়ো কম ছিল না।

## পরপারের ডাকে

এই মহান বিপ্লবীর তিরোধান ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ১৬ জানুয়ারি তারিখে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল—"The death of Bipin-da on Thursday night concluded the story of a life that has grown into a legend"।

নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও ক্ষাত্রবীর্য তাঁর মধ্যে ছিল সীমাহীন। আজীবন ব্রহ্মচারী, বিদ্রোহী সন্ন্যাসী, বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহ। দুঃখের মূল্য দিয়ে দুর্লভকে জয় করার বাসনা তাঁর মধ্যে ছিল যেমন তীব্র তেমনি সুস্পষ্ট। ফলে ৬৬ বছর বয়সের মধ্যে নয় নয় করে আঠাশ বছর কেটেছিল তাঁর বন্দি অবস্থায়।

আবাল্যসুহৃদ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিপিনবিহারী সম্পর্কে বলেছেন—"জন্মভূমির কাছে যাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্যের শেষ নাই। তাঁহারা 'মা ফলেষু কদাচন' এই মন্ত্রের সাধক ছিলেন।" (৬৪ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে—*নয়া সমাজ*, দ্বিতীয় বর্ষ, কার্তিক, ১৩৫৯)।

এই সময় তিনি শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করেছিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে সেই অর্থে 'নয়া সমাজ আশ্রমকেন্দ্র' স্থাপনের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহনির্মাণেও ব্রতী হয়েছিলেন জন্মভূমি হালিশহরে। জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কর্মকে সামনে রেখে তিনি তখন সদাসচেষ্ট ছিলেন অত্যাচার আর শোষণমুক্ত এক নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে। শ্রীঅরবিন্দের শাশ্বত বাণী—"দিয়ে দাও তোমার যথাসর্বস্ব, আপনাকে চিনে পবিত্র কর নিজের সত্তাকে, পূর্ণ কর আমার ইচ্ছা, পরিহার কর কল্পনার অনুসরণ।" (*দি আইডিয়াল অফ কর্মযোগীন*, পৃঃ ১৬)

বিপিনদা প্রায়ই বলতেন—"গীতার আদেশ প্রকৃত যোদ্ধার ওপরে প্রযোজ্য। দুর্বলের জন্য নয়। এ ব্যাপারে কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যা চলবে না।"

## রাজনীতি

আজীবন কংগ্রেস কর্মী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী হালিশহর কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও অব্যাহত থাকে তাঁর ভবঘুরে জীবন। তিনি প্রথমে কয়েকমাস বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়ের

তত্ত্বাবধানে বহুবাজারের মলঙ্গা লেনে বাস করেন। সেখান থেকে চলে এসে তিনি কয়েকমাস অতিবাহিত করেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর প্রান্তে ৫০ নং নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটে। এরপর তাঁর ঠিকানা বদল হয় ১৮বি, ফরডাইস লেনে। সেখান থেকে ১০, ফরডাইস লেন। তারপর তাঁর শেষ ঠিকানা হয় ৫৫ সার্পেন্টাইন লেনের 'নিমাই ভবন' নামক বাড়িটির নীচের তলার একটি ঘরে। সঙ্গে একমাত্র সাথী হংসধ্বজ ধাড়া। তখন তিনি আত্মসমাহিত। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতাই তাঁর একমাত্র জীবনবেদ।

ইতিমধ্যে শুরু হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের কল্যাণী অধিবেশন (১৯৫৪)। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে অসুস্থ বিপিনবিহারী স্বেচ্ছাসেবক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধিবেশন শেষে হালিশহর ঘুরে কলকাতা ফেরার পথে তিনি ট্রেনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

চলে গেলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী, অসমসাহসী বীর যোদ্ধা, বহু সশস্ত্র সংগ্রামের নেপথ্য নায়ক, নবভারতের 'ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ' মহাবিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

বারো

# সত্যের পূজারি শহিদ কানাইলাল দত্ত

১৮৮৭ সালের জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম চন্দননগরের সরষেপাড়ায়। কিন্তু ছেলেটা ভীষণ ডানপিটে, দুরন্ত আর অস্থির। একমুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। শুধু লাফ-ঝাঁপ, হৈ-হুল্লোড় অথবা কোন না কোন রকমের খেলা নিয়েই মেতে থাকে। আর ঘুড়ি ওড়ানোতেও অসম্ভব নেশা। এক কথায় তার দৌরাত্ম্যে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়, পাড়া-পড়শিরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ। কিন্তু কেউ তার ওপর বিরক্ত নয় বরং ভালোবাসে। সবাই বলেন অসম্ভব ডানপিটে হলে হবে কি ছেলেটার গুণ আছে। কখনও মিথ্যে কথা বলে না—মরে গেলেও না—শত প্রলোভনেও না। তাছাড়া আছে সব মানুষের প্রতি অসম্ভব দরদ ও ভালোবাসা। কিশোর বয়স থেকেই যে-কোন লোকের সুখ, দুঃখ অথবা শোকে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেই। সকলেই স্বীকার করেন যে, মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ ও ভালোবাসা কানাইলালের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল গভীর ও আন্তরিক দেশপ্রেম। দেশের পরাধীনতার গ্লানিই তাঁকে অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছিল। দেশের পরাধীনতার গ্লানি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মুখে সব সময় শোনা যেত—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়?

## সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ

**ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা ছেলেবেলা থেকে। একে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য ভালো নয়। তার ওপর ছাদে উঠে রোদে সারাদিন ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য প্রায়ই অসুখে পড়ে। তাই মা ও মামারা ওকে নিয়ে, বিশেষত ওর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মামা একদিন বেরোবার সময় কানুকে বলে গেলেন সে যেন সেদিন কিছুতেই ছাদে উঠে ঘুড়ি না ওড়ায় রোদে রোদে। কিন্তু তখন কানু একেবারেই ছেলেমানুষ। লোভ সামলাতে পারে না। মনে মনে বলে মামাকে কথা দিয়েছি ছাদে উঠে রোদে রোদে ঘুড়ি ওড়াব না। তবে ছায়ায় বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখলে তো আর কথার খেলাপ হবে না। তাই টিনের ছাদের ছায়ায় বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে লাগল। ওর বন্ধুরা ওকে বসে থাকতে দেখে বললে, হ্যাঁরে কানু, তুই আজ ঘুড়ি ওড়াবি না? জবাবে কানু বললে,—"না ভাই, আজ রোদে ঘুড়ি ওড়াতে মামার বারণ আছে।"**

কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এসে কানুকে না দেখে মামা কানুর নাম ধরে ডাকাডাকি করতেই কানু নেমে এল। তাকে ওপর থেকে নেমে আসতে দেখে মামা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, তোমাকে না বারণ করেছিলাম এই কাঠফাটা রোদে ছাদে উঠে ঘুড়ি না ওড়াতে। অথচ তুমি ঠিক তাই করছিলে।

—না মামা, আমি ছাদে ঘুড়ি ওড়াইনি।

—ফের মিথ্যেকথা বলছ। ছাদ থেকেই নেমে এলে অথচ বলছ ঘুড়ি ওড়াওনি।

কথা শেষ না হতেই মামা চটাস চটাস করে কানুর পিঠে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন। আর যায় কোথা। শুরু হয়ে গেল কানুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সে কী কান্না, কিছুতেই থামতে চায় না। কারুর কথাতেই তার কান্না বন্ধ হল না। মা শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে, অন্তত আমাকে বল—তোর মাকেও বলবি না?

বলছি শোন। আমি মামার অবাধ্য হয়ে ছাদেও উঠিনি কিংবা ঘুড়িও ওড়াইনি। অথচ মামা আমায় বিশ্বাস না করে আমায় মিথ্যেবাদী বলে কিল চড় মারল। তোমরা দুজনেই তো জান মা, আমি জীবনে মিথ্যে কথা বলিনি। মিছে কথা আমি বলতেই পারি না। সেসব জেনে শুনেও কেন মামা আমায় মিথ্যেবাদী বললে? যতক্ষণ না আমায় বিশ্বাস করা হবে ততক্ষণ আমার কান্না তো থামবেই না—আমি কিছু খাবও না।

তখন মামা পাড়ার যেসব ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— "হ্যাঁরে, কানু কি ছাদে উঠে আজ ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল?"

জবাবে সেই ছেলেরা তখন বলল,—কৈ না তো। কানু তো আজ ঘুড়ি ওড়ায়নি। ও টিনের ছাদের তলায় ছায়াতে বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিল। আমরাই বরং ওকে বললাম, কিরে, তুই ঘুড়ি ওড়াবি না? কানু তখন বলল, না ভাই, আমি আজ ঘুড়ি ওড়াতে পারব না, মামার বারণ আছে।

পাড়ার ছেলেদের কথা শুনে মামার তো চক্ষুস্থির। বুঝতে পারলেন যে, কানুকে মারা ও বকাবকি করা এবং সর্বোপরি মিথ্যেবাদী বলা খুবই অন্যায় হয়েছে। অনুতপ্ত মামা তখন আদরের ভাগ্নেকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে বাবা। তোকে মেরে ও বকাবকি করে আমি খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। ঠিক আছে, আমি আর কখনও এমন ভুল করব না। যাই হোক, সব ভুলে এখন খাবি চল, খাবি তো? হেসে ঘাড় নাড়ল কানু। তারপর মামা-ভাগ্নে দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসে গেল! তখন কানুর বয়স মাত্র ১২ বছর।

জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম বলে কানুর নাম হয়েছিল কানাই। পাঠকদের তো জানাই আছে, শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই গীতায় বলেছেন যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি বারবার মনুষ্য দেহ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং হবেন। কানাইলালও অনেকটা সেই রকম কাজই করেছিলেন। তাঁর সতীর্থ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের রক্ষা করতে এক দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতককেই আগে হত্যা করে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে নিজের

জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। কানুর মতে ভারতবর্ষে একাধিক ইংরেজ শাসক থাকলে দেশের যত ক্ষতি হবে তাব চেয়ে আরও অনেক বেশি ক্ষতি হবে যদি মাত্র একজন বিশ্বাসঘাতকও এদেশে বেঁচে থাকে। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে পড়া উচিত জয়চাঁদ বা মিরজাফরের কথা। কত বারই তো ওইসব জয়চাঁদ ও মিরজাফরের জন্য আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা হারিয়েছি। আজও ভারতবর্ষের দুর্দশার জন্য দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরাই তো দায়ী। বস্তুত নিজের জীবন দিয়েই কানাইলাল দেশবাসীর সামনে একটা আদর্শ বা প্রেরণার উৎস হয়ে গেছেন। তিনি দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার পরই দেশবাসী গর্জে উঠেছিল—আমরা রক্ত দেব—প্রাণ দেব—কিন্তু দেশ দেব না—স্বাধীনতা হারাব না কিছুতেই। যে-কোন মূল্যে দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে হবে।

প্রিয় পাঠকবর্গ—এবার আপনাদের কাছে বলব কেমন করে কানাইলাল দেশকে ভালোবাসলেন—কেমন করে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা বিপ্লবী হয়ে উঠলেন—আর কেমন করেই বা তাঁর কাছে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" হয়ে গেল।

একটু বড়ো হতেই কানাইলালের কাছে সর্বক্ষেত্রে মানুষের সেবা করা—রোগে, শোকে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি গুণের দেখা পাওয়া যেতে লাগল।

এছাড়াও স্কুল জীবনের শেষ দিকে এবং কলেজ জীবনে শয়নে-স্বপনে কিংবা নিদ্রা ও জাগরণে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল ইংরেজ শাসনের ধ্বংস সাধন। নিত্য সঙ্গী হল যত সব বিপ্লবী পত্রপত্রিকা ও বই। অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'বর্তমান রণনীতি', বারীন্দ্রকুমারের 'ভবানী মন্দির' ও 'মুক্তি কোন পথে'। স্বামীজির বক্তৃতামালা ও 'পত্রাবলী'। শ্রীঅরবিন্দের কিছু রচনা ও 'যুগান্তর' পত্রিকাটি। তাছাড়াও, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রতি অতিশয় মনোযোগী। স্বামীজির বাণী—"গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে আরো দ্রুত ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র ইষ্টদেবতা হলেন দেশমাতৃকা" কানাইকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান দল ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রও কানাইলাল দত্তকে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। হৈ-হুল্লোড় ও খেলা-ধুলোতে সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যেমন তাঁর, তেমনি ছিল যে-কোন বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার প্রতিভা ও দক্ষতা।

সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড কার্জন বাংলাপ্রদেশকে দু-ভাগে ভাগ করায় তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। পাঠকবর্গের জানা আছে যে, স্বয়ং গান্ধীজিই স্বীকার করেছেন, ওই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনই পরবর্তী কালের সকল আন্দোলনেরই পথপ্রদর্শক।

কার্জনের আদেশে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান, ওই দিনটি যেন রাখিবন্ধন দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কানাইলালের উৎসাহ দেখে কে? চন্দননগরের সব ব্যাপারেই এগিয়ে যাচ্ছেন তিনিই। সকালে খালি পায়ে শোভাযাত্রা। তারপর গঙ্গাস্নান। সব বাড়িতে অরন্ধন।

সারাদিন ফলমূল খেয়ে থাকা। সন্ধেবেলা সভা। সব বিষয়েই কানাই শুধু নেতা। সভায় ঠিক হল, যেহেতু শক্তিতে ইংরেজদের সঙ্গে পারা যাবে না তাই ওদের ভাতে মারতে হবে। অর্থাৎ ওদের ব্যবসা নষ্ট করে দিতে হবে। কী করে? বিলিতি জিনিস ব্যবহার বন্ধ করে। বিলিতি জিনিসপত্র কেউ যাতে না কেনে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।—

বলে গান গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতে হবে। দোকানে দোকানে ক্রেতাদের বলতে হবে—বিলিতি জিনিসপত্র একেবারেই কিনবেন না। আমাদের দেশে যা তৈরি হয়, যা উৎপাদন হয়, তাতেই এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনে রাখবেন এখন বিলাসিতার সময় নয়। এখন ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের সময়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে হওনা তোমরা লাট-বেলাট, তোমাদের জীবন কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। কেমন করে শাসকদের তা বোঝানো যাবে? বোঝানো যাবে একের পর এক শাসকদের হত্যা করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। সত্যিকারের সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারলে ব্রিটিশ শাসকরা পালাবার পথই পাবে না। অবিভক্ত বাংলার অখণ্ড প্রাণসত্তাকে এক সূত্রে গেঁথে দেওয়ার জন্য বিশ্বকবি রচনা করেছিলেন—রাখি সংগীত। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও (চন্দননগরেও) সভা শেষে মিলিত কণ্ঠে গানটি গাওয়া হয়েছিল।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক-পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—হে ভগবান।

গানটির শেষে ছিল—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যতো ভাইবোন,
এক হউক—এক হউক—এক হউক—হে ভগবান।

## ইংরেজ সার্কাস পার্টিকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা

ওই সময় চন্দননগরের কুঠির মাঠে এক ব্রিটিশ সার্কাস পার্টি সার্কাস দেখাতে এসেছিল। বিদেশি সার্কাসের দল এ দেশের মানুষদের টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের দেশে চলে যাবে এ ব্যাপারটা কানাইলালের একেবারেই পছন্দ হল না। সে বললে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

উদ্বোধনের দিন কানাই ঠিক সময় দলবল নিয়ে টিকিট ঘরের সামনে এসে হাজির। তারপর হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, দয়া করে কেউ টিকিট কিনবেন না। টিকিটের বিনিময়ে আপনারা যে টাকা-পয়সা দেবেন সে সবই বিলেতে চলে যাবে। তাতে ইংরেজদেরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলে ওরা আরও বেশি দিন ভারতে রাজত্ব করার সুযোগ পেয়ে যাবে। ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় বিচার করে দয়া করে আপনারা টিকিট কেনা থেকে

বিরত থাকুন। কানাইলালের কথা শুনে দু'একজন ইংরেজভক্ত ছাড়া আর সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে খবর পেয়েই সার্কাসের ম্যানেজার ছুটে এসে ধমকাতে শুরু করল—ভাগো ইঁয়াসে—ইউ ড্যাম-সোয়াইন-নিগার। ম্যানেজারের পেছন পেছন আর এক সার্কাস কর্তা লাঠি হাতে ছুটে এসে কানাইকে মারতে গেল। কানাই চকিতে লাফিয়ে উঠে বাঁ-হাতে তার লাঠিটা ধরে ফেলে ডান-হাতে কয়েকটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল তার মুখে। সে তখন লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে একটা খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পুলিশ আসার আগেই কানাই ও তার দলের ছেলেরা ওখান থেকে সরে পড়েছিল। পুলিশরা কাউকে ধরতে পারল না। সাহেবদেবও সুবুদ্ধি হল। তারাও পরের দিন সকালেই অন্যত্র চলে গেল।

## বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা পড়ার পর থেকে আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহ বা বিপ্লবের রূপ নিতে শুরু করে দেয়। বোমা মেরে লাটসাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। ধারাবাহিকভাবে সাহেবদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা চলায় ইংরেজ অত্যাচারী শাসকরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। কানাইলালের চন্দননগরেও সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল। ওখানেও মেয়রের শোবার ঘরে বোমা পড়ল।

হঠাৎ একদিন কানাইলাল কলকাতা চলে এসে মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বোমা তৈরির কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইলেন কানাইলাল তখন কী পড়ছে? উত্তরে কানাই জানাল সে ওই বছর ফাইনাল বি. এ. পরীক্ষায় বসবে। তখন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—বেশ, তবে পরীক্ষার পরই চলে এসো। লেখাপড়াটাও খুব দরকার।

কিন্তু কানাই ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন থেকেই চন্দননগরে কয়েকটি গুপ্তসমিতি গড়ে তুলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। এর কিছুদিন পরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ চন্দননগরে এলে সেইসব অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা তাঁর হাতে তুলে দেয়। তখন বারীন্দ্রকুমার কানাইকে বুকে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করেন ও বলেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে বোমা তৈরির কাজে লেগে যাও তো আমি তোমাকে সানন্দে গ্রহণ করব।

## বড়ো চাকরি পেয়েছি বলে গৃহত্যাগ

একদিন বিকেলে কানাই তার মাকে বলল, খুব ভালো চাকরি পেয়েছি। আজই আমায় চলে যেতে হবে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কী চাকরি? কোথায় যাবি?

খুব ভালো চাকরি। কলকাতায়। আজ এখুনি চলে যেতে হবে। দুধ মুড়ি খেয়ে কানাই

তখুনি বেরিয়ে গেল। কানাই তো জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেনি। তাই মার বিশ্বাস হল সে বড়ো চাকরিই করতে গেল। প্রতিবেশীদেরও সেই বিশ্বাসই হল। কানাই মনে মনে ভাবল দেশের কাজ করার চেয়ে বড়ো চাকরি আর কী হতে পারে? সুতরাং সে মোটেই মিথ্যাচার করেনি।

১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে পরপর কদিন কাগজে বেরোচ্ছিল আকাশ ভেঙে পড়ার মতো যত সব খবর। ৩০ এপ্রিল তারিখে কিংসফোর্ডকে মারতে মজঃফরপুরে বোমা পড়েছে। ১ মে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। দোসরা মে প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। তেসরা মে তারিখে খবর বের হল মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। গাদা গাদা রাইফেল, রিভলবার, হাত-বোমা ও কার্তুজ ইংরেজ শাসকরা পেয়ে গেছে। আর দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে মৃত্যু বরণের শপথ নেওয়া তিরিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই তিরিশ জনের তালিকায় দেখা গেল কানুরও নাম। তখনও কানাই-এর মা এবং আরও কয়েকজন প্রতিবেশীর ধারণা কানাইকে নিশ্চয় ভুল করে ধরেছে। ও নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে যাবে। কারণ ওতো চাকরি করতে গিয়েছে বলে গিয়েছিল। তাছাড়া ও তো মিছে কথা বলার ছেলে নয়।

একদিন কানাই-এর দাদা ডাঃ আশুতোষ দত্ত উকিল নিয়ে জেলে ভায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে কানাইকে বললেন তোর নামে কোন বড়ো রকমের অভিযোগ নেই। তাই তোকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে উকিলবাবুকেও সঙ্গে করে এসেছি। তুই উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে নে। কানাই উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর বলল, আমি মুক্তি চাই না। আমার সহবন্দি বিপ্লবীদের যা হবে আমারও যেন তাই হয়, আমি তাই চাই। উকিলবাবু তখন বললেন, অকারণে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। জবাবে কানাই বলল, অকারণে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে আমি জেলে আসিনি। তাছাড়া, সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে আমি যদি সমান শাস্তি না নিই তবে তা বেইমানি করা হবে। তা আমি মবে গেলেও পারব না।

### জেলখানা, না, আনন্দের হাট

কানাইলাল জেলে বেশ মজায় আছে। বেশ আনন্দেই তার দিন কাটছে। যখন অন্য বিপ্লবীরা ধর্মচর্চা করছে—গীতাপাঠ করছে, যোগ-ব্যায়াম করছে, তখন কানাই ওসব কিছুর মধ্যেই নেই। তখন সে ছুটোছুটি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, অন্য বিপ্লবীদের সন্দেশ কিংবা বিস্কুট খেয়ে নিচ্ছে। কিংবা আম খেতে খেতে অন্যের গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। সব বিপ্লবীদেরই যেন উত্যক্ত করে ছাড়ছে। দুপুরবেলা দু'তিন থালা লাপসি খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। আর রাত্রিবেলা চুপি চুপি উঠে একজনের কাছা অন্যজনের কোঁচার সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছে। হয়তো বা কারুর কোঁচার সঙ্গে বেড়াল ছানা বেঁধে দিচ্ছে। ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করে দিচ্ছে। তবুও সকলে তাকে ভালোবাসত।

ইতিমধ্যে একদিন গোপন বৈঠকে বারীন্দ্রকুমার নির্দেশ দিলেন চুপ করে জেলে বসে না থেকে জেল থেকেই বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাও। যে বন্ধুরা জেলে বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাদের মাধ্যমে অস্ত্র আনিয়ে নাও তোমরা সকলে। তারপর জেলরক্ষীদের একদিন আক্রমণ করে জেল ভেঙে পালিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নাও। শেষে জঙ্গল থেকে ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দাও। বলাবাহুল্য, ওই দিন থেকেই দেখা করতে আসা বন্ধুদের মাধ্যমে জেলের ভেতর অস্ত্র আনানো শুরু হয়ে গেল। শোনা যায়, একটা কাঁঠালের মধ্যে রিভলভার রেখে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

## বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই-কে হত্যা

কয়েকদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছিল, জেলবন্দি নরেন গোঁসাই-এর ক্ষেত্রে জেলের কড়াকড়ি নিয়মনীতি যেন বেশ শিথিল করা হয়েছে। সকলেই বেশ অবাক ও বিরক্ত। সন্ধের পর সাহেবদের যেখানে রাখা হয় সেখানে রাখা হত ওকে। আলাদা খাতির-যত্ন করা হচ্ছে নরেনকে। ১৯০৮ সালের ২৩ জুন তারিখে বন্দিদের আদালতের কাঠগোড়ায় তোলা হয়েছে। হঠাৎ বন্দিদের কাঠগোড়া থেকে নরেনকে সাক্ষীদের কাঠগোড়ায় সরিয়ে নেওয়া হল।

শোনা গেল, ইংল্যান্ডেশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন তার স্বীকারোক্তির জন্য। এখন বিপ্লবীদের সমস্ত গোপন কথা বলাতেই নরেনকে আদালতে আনা হয়েছে। সকলেই স্তম্ভিত—সর্বনাশ। তা হলে তো আর কারোরই নিস্তার নেই।

এই খবর যখন কয়েকটি কাগজে বেরিয়ে গেল তখন দেশের সব মানুষই এই বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এমনকি, কানাইলালের মা পর্যন্ত বললেন— এমন সর্বনেশে বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কেউ কি নেই যে ওই বিশ্বাসঘাতককে কালবিলম্ব না করে শেষ করে দিতে পারে? তখন তো আর তিনি জানতেন না যে তাঁরই ছেলে কানাই এই কাজের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে।

বারীন্দ্রকুমার যখন জেল ভেঙে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত তখনি কানাইলাল, সত্যেন বসু এবং আরও দু'এক জন বারীন্দ্রকুমারকে বোঝালেন, আগেই বিশ্বাসঘাতকটাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে তাঁদের সংগঠনই শেষ হয়ে যাবে। আর কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই আগেই বিশ্বাসঘাতকটাকে শাস্তি দিতে হবে এবং এমন শাস্তি দিতে হবে যে এদেশে বিশ্বাসঘাতকতা যেন আর কেউই করতে সাহস না পায়। শেষপর্যন্ত বারীন্দ্রকুমার কানাই ও সত্যেন বসুর যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারলেন। আর তাই সানন্দে ওদের সমর্থনও জানালেন।

সত্যেন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২৭ জুলাই তাঁকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় মাসখানেকের জন্যে। ২৯ অগাস্ট নরেন গোঁসাই জেল সুপারের সঙ্গে দেখা করে বললেন—অনুমতি দিন আমি একবার জেল হাসপাতালে যাব।

কেন?

ওখানকার সত্যেন বসু খবর পাঠিয়েছেন যে উনিও স্বীকারোক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে চান।

ঠিক আছে। যখন খুশি আপনি যেতে পারবেন। সেই দিন ২৯ অগাস্ট পরের দিন ৩০ অগাস্ট নরেন গোঁসাই সত্যেন বসুর সঙ্গে দেখা করে এলেন। দুজনের মধ্যে ঠিক হল ৩১ অগাস্ট আবার তাঁরা দেখা করবেন।

এদিকে ৩০ অগাস্ট সকালে কানাইলাল পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁকেও শেষপর্যন্ত ৩০ অগাস্ট তারিখেই জেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হল।

৩১শে অগাস্ট সকালে একজন জেলকর্মী ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের সুপারকে জানালেন যে, সত্যেন বসু নরেন গোঁসাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চান। তা শুনেই সুপার হিঙ্গিস নামের এক জেলকর্মীর সঙ্গে নরেনকে পাঠিয়ে দিলেন। জেল হাসপাতালের কাছাকাছি আসতেই নরেন দেখতে পেল ইতিমধ্যেই সত্যেন ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। হাসপাতালে প্রবেশ করেই নরেন ওষুধের ঘরে ঢুকে গেল এবং হিঙ্গিসকে বলল, সে যেন সত্যেনকে ওই ওষুধের ঘরে ডেকে আনে। এমন সময় দেখা গেল, কানাই অন্য একটা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সত্যেন ও কানাই দুজনেই নরেনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওই ওষুধের ঘরটার মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই ওষুধের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কারোর মুখেই কোন কথা নেই। এভাবে মিনিট দশেক কেটে যাবার পর সত্যেনের পিস্তলটা হঠাৎ গর্জে উঠল। সে নরেনকে লক্ষ্য করেই গুলিটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু নিশানা ঠিক না হওয়ায় গুলিটা নরেনের একটা হাতে লাগে।

ওরে বাবারে, আমায় মেরে ফেলল রে, বলে চিৎকার করতে করতে নরেন ফের সেই ওষুধের ঘরটায় ঢুকে পড়ল এবার তার ঠিক পেছনেই কানাই ও সত্যেন। দুজনেরই হাতে গুলিভরা রিভলভার। হিঙ্গিস এই সময় কানাইকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করতেই কানাই-এর রিভলভার গর্জে উঠল। এবার গুলিটা হিঙ্গিসের কোমরে লাগায় সে মাই লর্ড বলে মাটিতে বসে পড়ল। ওদিকে তখন সত্যেনকে নরেনের দিকে তাক করতে দেখেই নরেন চিৎকার করতে করতে এক দৌড়ে ওষুধের ঘর থেকে বেরিয়ে আরও জোরে দৌড়োতে লাগল। কানাই ও সত্যেন তখন গুলি চালাতে চালাতে নরেনের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। ওই সময় কানাই-এর একটা গুলি নরেনের কোমরে বিঁধে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে উলটো দিক থেকে ছুটে আসা এক ইংরেজ জেলকর্মী সত্যেনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কানাই ওই ইংরেজ জেলকর্মীর মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে দিয়েই একলাফে নরেনের কাছে পৌঁছে যায়। তারপর রিভলভারের বাকি সব গুলিই নরেনের ওপরই চালিয়ে দেয়। নরেন লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে একটা ড্রেনের ভেতর গিয়ে পড়ে। এবার কানাই তার রিভলভারটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ধরা দেবার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে

থাকে। সত্যেনও মাটি থেকে উঠে এসে হাতের রিভলভারটা মাটিতে ফেলে দিয়ে গ্রেপ্তার হবার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনের কেউই পালাবার কোন রকম চেষ্টাই করেননি। তাঁরা আসলে দেশদ্রোহীকে তার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেই তৃপ্ত ও ধন্য।

জেলের ভেতরে ও বাইরে—চারদিকেই সে কী তুমুল হৈ-হৈ। উন্মত্ত জনতা পাগলের মতো পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছেন। মুকুটহীন রাজা (Uncrowned King) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে ডেকে ডেকে জনগণকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন। জনগণের অনুভবে এ যেন রাহুমুক্তি। এ যেন স্বাধীনতার পদধ্বনি শোনা। কী সাংঘাতিক ব্যাপার রে বাবা। জেলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীকে খুন। ব্রিটিশ শাসকদেরও কেউ কেউ কানাইলালের প্রশংসা না করে থাকতে পরেনি। খাস ব্রিটিশ কাগজেও লেখা হয়েছিল—"নরেন্দ্রনাথ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দেশের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন। পাছে সব কথা বলে তিনি দেশের আরও ক্ষতি করেন তাই তার আগেই তাকে হত্যা করেছে। এখানে একের ক্ষতিতে অনেকের উপকার হয়েছে। এ হত্যাকে হীন বলা যায় না। আত্মত্যাগ এবং গৌরবের আলোয় এ হত্যা উজ্জ্বল।"

(বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, *শহীদের রক্তে রাঙা*, পৃ. ৬৮)।

তারপর। তারপর তো সেই একই কথা। বিচারের নামে প্রহসন করে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির হুকুম শুনে কানাই প্রথমে একটু হাসল। তার পরেই জিগ্যেস করল হাসতে হাসতেই—ফাঁসির দিনটা কবে ঠিক হয়েছে?

ফাঁসির হুকুম হয়েছে শুনে কানাই-এর দাদা ডাঃ আশুতোষ দত্ত ছোটো ভায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় দুজন ইংরেজ আশুতোষবাবুকে বলেছিলেন—এমন আশ্চর্য ছেলে আমরা জীবনে কখনও দেখিনি। সব সময় হাসি তামাশায় মশগুল হয়ে আছে। মৃত্যুকেও হারিয়ে দিয়েছে। ওই সময় কানাই বড়ো ভাইকে বলেছিলেন—"মাকে যেন এনো না কোনো দিন। আর শোনো আমার মৃত্যুর পর যেন শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে যেও না।"

ফিরে আসার সময় আশুতোষবাবু ছোটো ভায়ের হাতে হাত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়ম নেই বলে পারছিলেন না। দুজন ইংরেজ জেলকর্মী ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে আশুতোষবাবুকে বলল, আমরা এবার কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে থাকছি এই ফাঁকে আপনারা দু-ভাই হাত মিলিয়ে নিন। ভাবতে সত্যিই অবাক হতে হয় যে ফাঁসির হুকুম হবার কয়েক দিনের মধ্যেই কানাই-এর ওজন ষোলো পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল।

ফাঁসির ঠিক আগের দিন কানাইকে হাসি-তামাশা করতে দেখে এক ইংরেজ জেলকর্মী বলেছিল—আজ হাসছ দেখছি। কিন্তু কাল ফাঁসির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই হাসিটা অটুট থাকবে তো?

সেই রাতে কানাই এমন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল যে ঠেলাঠেলি করে শেষ রাত্রে তার ঘুম ভাঙাতে হল। অল্প কিছুক্ষণেব মধ্যেই কানাই তৈরি হয়ে গেল। তারপর চারজন ব্রিটিশ জেলকর্মীর পেছন পেছন নির্ভীক ও দৃঢ় পদক্ষেপে কানাই মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় লাফ দিয়েই মঞ্চে উঠে পড়ল। এমন সময় গত দিনের সেই ইংরেজ জেলকর্মীটিকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, হ্যালো মিস্টার, কী দেখছেন—আমার গত দিনের হাসি আজ ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তেও অটুট আছে, না, হারিয়ে গেছে? সেই জেলকর্মীটি লজ্জায় তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, তার আর দোষ কোথায়? সে তো তার জীবনে মৃত্যুকে জয় করার এমন বীরত্ব আর কখনও দেখেইনি।

গলায় ফাঁসটা পরিয়ে দেওয়া হল ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর ভোর ৬টার কিছু পরে। ইতিমধ্যে কানাই-এর মাথায় কালো একটা টুপি পরিয়ে তার মুখ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল। জেল সুপারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই জল্লাদ একটা হ্যান্ডেলে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে কানাই ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল। আর নড়ল না।

১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর তারিখটা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একটি স্মরণীয় তারিখ। কেননা ওই তারিখটা নতুন আদর্শে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার দিন।

কানাইলালের মৃতদেহ নিতে বড়োভাই ডাঃ আশুতোষ দত্ত এলেন কাঁদতে কাঁদতে। তাঁকে কাঁদতে দেখে ব্রিটিশ জেলকর্মীটি বলল—"কাঁদছ কেন? এমন বীর যুবক যে দেশে জন্মেছে সে দেশ ধন্য। এমন মরা কজন মরতে পারে?" (বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, *শহীদের রক্তে রাঙা*, পৃ ৭০)

কানাইলালের অন্তিম যাত্রায় সেদিন সকল কলকাতাবাসীই পথে নেমে এসেছিল। এমনকি ব্রিটিশরা পর্যন্ত কানাই-এর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। বেলা পড়ে এলে কানাই-এর মরদেহের ছাই কৌটা ভর্তি করে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় সকলেই। কয়েকদিন পরে সত্যেন-এরও যথারীতি ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল।

চন্দননগরের গঙ্গার ঘাটে (Strand-এ) কানাই-এর যে মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এবং সেই মূর্তির গায়ে যে কবিতাটি খোদিত আছে সেই কবিতাটির কথাই যেন সেদিন সকলেই মনে মনে বলেছিলেন—

ভারতের মুক্তি যজ্ঞে—
হে বিপ্লবী, শহীদ কানাই,
যে কীর্তি রাখিয়া গেছো
প্রাণবীর্যে আত্মাহুতি দিয়া,
সে পুণ্য অমর স্মৃতি
জন্মক্ষেত্রে থাক উদ্ভাসিয়া
অনন্তকালের বুকে—
হে যাজ্ঞিক, তব মৃত্যু নাই।

(বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, *শহীদের রক্তে রাঙা*, পৃঃ ৭০)

তেরো

# অগ্নিযুগের অগ্নিকিশোর ক্ষুদিরাম বসু

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

## ক্ষুদিরামের বাল্য ও কৈশোর

আজ আমি পাঠকদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুই বাঙালি শহিদদের অন্যতম ক্ষুদিরাম বসুর কথা বলব। প্রথম বাঙালি শহিদ বলছি এজন্য যে এগারো বছর আগেই অর্থাৎ ১৮৯৭ সালেই প্রথম ভারতীয় শহিদ হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়-দামোদর ও বালকৃষ্ণ—কুখ্যাত দুই ইংরেজ অফিসার র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টিকে হত্যা করে।

আজ থেকে ১০০ বছর আগে (১৯০৮ সালে) মাত্র ১৮ বছর বয়সে স্বদেশের মুক্তির স্বপ্ন চোখে নিয়ে বীর অথচ নির্ভীক পদক্ষেপে সর্বপ্রথম যে বাঙালি কিশোরটি হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন তিনিই তো ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দেওয়ার জন্য নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন ওই ঘটনার ঠিক পরের পরের দিন অর্থাৎ ১৯০৮ সালের দোসরা মে তারিখে (০২/০৫/১৯০৮)।

ক্ষুদিরাম জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের তেসরা ডিসেম্বর (৩/১২/১৮৮৯) বিকেলবেলা। বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোলের জমিদারদের কাছারিতে তহশিলদারের কাজ করতেন বলে তাঁকে সপরিবারে বাস করতে হত মেদিনীপুরের হবিবপুরে। মায়ের নাম—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। জন্ম লগ্নেই ক্ষুদিরামের নামকরণও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কেন? সেই কথাই তো বলব এবার। ত্রৈলোক্যনাথের ছয়টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। প্রথমে তিন কন্যা—অপরূপা, সরোজিনী ও ননীবালা। পরে তিন পুত্র। কনিষ্ঠ ক্ষুদিরামের দুই অগ্রজ জন্মের পর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। তাই ক্ষুদিরামের সময় এক দিকে যেমন সকলেই বেশ খুশি, অন্যদিকে তেমনি আবার সকলেরই মনে ভয় যদি এই নবজাতকটিও তার অগ্রজদের মতো ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে গ্রামবাংলায় একটি প্রথা আগে খুবই প্রচলিত ছিল। তা হল এই যে নবজাতকের প্রাণ রক্ষার জন্য কিছু খুদ বা কড়ির বিনিময়ে তাকে কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশী বন্ধুর কাছে বিক্রী করে দেওয়া। এক্ষেত্রে তাই করা হয়েছিল। সদ্য বিবাহিতা বড়ো বোন—অপরূপা দেবী তিন মুঠো খুদের বিনিময়ে শিশু ভাইটিকে কিনে নিয়েছিলেন। আর খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলেই শিশু ভাইটির নাম হয়েছিল ক্ষুদিরাম। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে মাত্র সাত বছর বয়সে

কেবলমাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে মা ও বাবা দুজনকেই হারিয়ে ক্ষুদিরামকে বড়ো দিদি অপরূপাদেবীর আশ্রয়েই মানুষ হতে হয়েছিল।

হাটগাছিয়ায় গিরীশ মুখার্জীর পাঠশালায় ছোট্ট ক্ষুদিরামের লেখাপড়া শুরু। জামাইবাবুর বদলির চাকরি। তাই দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে চলে আসতে হয় তমলুক। ১৯০১ সালে এখানে হ্যামিলটন স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়। এমনিতে ক্ষুদিরাম ডানপিটে ও বেপরোয়া হলেও সে খুবই বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী। তমলুকে কলেরা দেখা দিয়েছে। ক্ষুদিরাম তার বন্ধুদের নিয়ে লেগে গেল রোগীদের সেবায়। তার এক বন্ধুকে গালাগালি দিয়েছে এক ফেরিওয়ালা। ক্ষুদিরাম তাকেও ছেড়ে দেয়নি। আসল কথা কোনো কাজেই সে হারতে শেখেনি।

১৯০৪ সালে ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুরে চলে আসতে হল জামাইবাবু আবার বদলি হওয়ায়। এখানে তাকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। আবার স্কুল বদল এবং সেই সঙ্গে জীবন ও মানসিকতারও পালাবদল শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সের কিশোর ক্ষুদিরামকে ওই সময় দেখলেই তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। যেমন টানা-টানা, বড়ো-বড়ো চোখ তেমনি আবার ছিপ্‌ছিপে, সুন্দর ও সুঠাম গড়ন। গায়ের রং বেশ ফর্সা। তার ওপর মাথায় অল্প অল্প কোঁকড়া ও ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু তখন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দেশপ্রেমের জোয়ার এনে দিয়েছেন তিনি সব মানুষেরই মনে। তাঁরই আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ওই স্কুলেরই ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি ক্ষুদিরামকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে ছেলেটি একটি ছাই চাপা আগুন। গভীর দেশপ্রেম লুকিয়ে আছে ছেলেটির বুকের মধ্যে। তিনি তখুনি শপথ নিলেন ছেলেটিকে জাগিয়ে তুলবেন। আর তাই ক্ষুদিরামকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

তখন সারা বাংলায় এবং বাংলার বাইরেও জ্বলছে বিপ্লবের আগুন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে আমাদের শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকা ভারতমাতাকে। মেদিনীপুর তখন বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। আর বিপ্লবীদের দলপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষুদিরামকে—কী চাও তুমি? ক্ষুদিরাম উত্তরে বলল—আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই। সত্যেন্দ্রনাথ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরামের দিকে। তারপর বললেন—তুমি পারবে—তুমি অবশ্যই পারবে।

ক্ষুদিরাম বিপ্লবী দলে যোগ দিল। গোপন আখড়ায় সে শিখে নিল লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো। বন্দুক আর রিভলভার ছোঁড়ায় হাত পাকাল। তাছাড়া রণ-পা চড়ে সারা মেদিনীপুর ঘুরে অসুস্থের সেবা করল। নিরাশ্রয়ের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। অসুস্থ কৃষকের চাষের কাজ বন্ধ হতে দেয়নি।

পাঁচ মাইল দূরে জনার্দনপুর। গ্রামটি বন্যায় ভেসে গেছে। ঘরবাড়ি সব ভেঙে ধূলিসাৎ। বানভাসি মানুষেরা সব দিশেহারা। ক্ষুদিরাম তখুনি ছুটল তাদের দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে।

বৃদ্ধ ও শিশুদের বয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘুরে ঘুরে হাত পেতে তাদের জন্য জোগাড় কবল টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় এবং ওষুধ ও পথ্য।

মধ্যবিত্ত ঘরের এক সম্ভ্রান্ত রমণী কুসুমকুমারী ক্ষুদিরামকে আর তাব ভাগ্নে ললিতকে বললেন—"আয বাছা আমার এখানে দুমুঠো খেয়ে যা।" ললিত তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কিন্তু ক্ষুদিরাম রাজি নয়। সে তাকিয়ে আছে কুসুমকুমারীর হাতে পরা বিদেশি কাচেব চুড়ির দিকে। বিলিতি চুড়ি পরা হাতের রান্না কি দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর খাওয়া উচিত হবে? কখনও না। কুসুমকুমারী বুঝে ফেললেন ক্ষুদিরামের মনের কথা। তাই ভেঙে ফেললেন তাঁর হাতের কাচের চুড়ি। ক্ষুদিরামও একগাল হেসে বলল—"দাও গো মাসি খেতে দাও।" সেদিন থেকেই কুসুমকুমারী হয়ে গেল ক্ষুদিরামের আপন মাসি।

দেশেব কাজে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে ক্ষুদিরাম। নেতাদের ভাষণ পড়ে শোনানো আর বুঝিয়ে দেওযা বন্ধুদেব। ব্যায়াম সমিতিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ানো। বণ-পা চড়ে রাতারাতি চলে যায় এখানে সেখানে। এতটুকু বিরাম নেই। ক্লান্তি নেই একেবারেই।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো। মেদিনীপুবের বিপ্লবীদের একচ্ছত্র নেতা। ক্ষুদিরাম একদিন তাঁকে ধরে বসল।

"আমাকে একটা রিভলভার দিন।"

"তুমি কী করে জানলে যে আমার কাছে রিভলভার আছে?"

"আমি জানি।"

"না, ওসব আমার কাছে থাকে না। তুমি কখনও ওসব কথা বলতে আসবে না আমাকে।"

ক্ষুদিরাম দমবার পাত্র নয়। পরে আবার একদিন হেমচন্দ্রকে ধরে বসল, "আমাকে একটি রিভলভার দিন।"

"কী করবে রিভলভার দিয়ে?"

ক্ষুদিরামের পরিষ্কার জবাব, 'সাহেব মারব।'

ক্ষুদিরামকে প্রথমবার জেলে যেতে হয়েছিল একটি প্রচারপত্র বিলি করার অপরাধে। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের পুরোনো জেলের মধ্যে একটা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। ইংরেজ জজ ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের বড়ো কর্তারা সব উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী দেখতে সেদিন শ্রীঅরবিন্দও মেদিনীপুরে এসেছিলেন। হঠাৎ গেটের কাছে একটি স্বাস্থ্যবান তরুণকে দেখা গেল 'সোনার বাংলা' নামের একটা পুস্তিকা বিলি করছে। আসলে গুপ্ত সমিতির নির্দেশে ক্ষুদিরাম সেখানে সোনার বাংলা বিলি করছিল। ওটি ছিল ইংরেজ বিরোধী প্রচারপত্র। সেই প্রথম ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা।

বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন—"কে তোমাকে এই পত্রিকা বিলি করতে দিয়েছিল?"

ক্ষুদিরাম বলল—"তার নাম তো আমি জানি না।"

"লোকটিকে কি এই আদালত কক্ষে দেখতে পাচ্ছ?"

উপস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই রে, এই বুঝি ক্ষুদিরাম তাঁর নামটা বলে ফেলে। কেন না তিনিই তো (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) ক্ষুদিরামকে সোনার বাংলা বিলি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম আদালত কক্ষের সব দিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন *তাঁকে তো এই ঘরের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছি না।*

আসামি ক্ষুদিরাম নেহাত ছেলে মানুষ দেখে বিচারপতি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। আনন্দে ও শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বাসিত ও উৎফুল্ল জনতা তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে ক্ষুদিরামকে বীরের সংবর্ধনা জানালেন। অরবিন্দ স্বয়ং ওই সংবর্ধনায় উপস্থিত থেকে ক্ষুদিরামকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ক্ষুদিরাম শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করতেই তিনি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—"এখনও অনেক পথ বাকি আছে। নিজেকে উন্নত করো, দেশের মানুষদের নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালোবাসতে শেখাও। তবেই তো আমাদের চিরদুঃখী দেশমাতৃকা শৃঙ্খল মুক্ত হবেন।"

ক্ষুদিরামের দেশসেবার কাজ ক্রমশই বেড়ে চলতে লাগল। জামাইবাবু অমৃতলালবাবু পড়লেন মহাবিপদে। সরকারি চাকরি করেন তিনি। এদিকে দুঃসাহসী কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম তাঁর নিকট আত্মীয় এবং তাঁর আশ্রয়ে তাঁর বাড়িতেই থাকেন। এজন্য তাঁর চাকরি চলে যেতে পারে। ক্ষুদিরাম তাঁর অবস্থা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই একদিন সে কাউকে কিছু না বলেই দিদির বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তার দিন কাটে এখানে সেখানে। এমন সময় যে আর-এক দিদিকে পেয়ে গেল। এ দিদি হলেন সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের ভগ্নী। এই স্নেহময়ী রমণী ক্ষুদিরামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই দুর্দিনে। ক্ষুদিরাম ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দিদির বড়ো আদরের বিপ্লবী ভাই।

তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে ক্ষুদিরামকে সম্যক চেনা যায় না। একদিন ওই সপ্তম শ্রেণির ক্লাস-টিচার ক্লাসে ঢুকেই একটু হেসে বললেন আজ তোমাদের একটা নতুন পরীক্ষা নেব। নতুন পরীক্ষা সে আবার কী? ছাত্ররা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। আবার একটু হেসে মাস্টারমশাই বললেন—আজ আমি তোমাদের ঘুসির জোরের পরীক্ষা নেব। অর্থাৎ আমার এই টেবিলে তোমরা কটা ঘুসি মারতে পার তার পরীক্ষা। তারপর প্রথম বেঞ্চের প্রথম ছেলেটি এগিয়ে এসে একটা ঘুসি মেরেই সঙ্গে সঙ্গে উঃ বলে বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ১০/১২টি ছেলের ঘুসি মারা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন সাতটি মেরেছে। কিন্তু ঠিক এই সময় পেছনের বেঞ্চি থেকে উঠে এল সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান একটি ছাত্র এবং এসেই শুরু করে দিল ঘুসির পর ঘুসি। ২৫ ওঠার সময়েই দেখা গেল যে তার হাতের দুটো মুঠো থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে। শুধু তাই নয় ওই অবস্থাতেই মেরে দিলেন আরও ৫টি ঘুসি। তাকে থামানোর আর কোনো উপায় না দেখে শিক্ষকমশাই তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে ঘুসি মারা থেকে বিরত করেন। সেই অবস্থাতেও ছাত্রটির মুখে হাসি, শিক্ষকের চোখে জল। আর বাকি সব ছাত্রেরা বিস্ময়ে হতবাক। পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন

এই ছাত্রটি স্বয়ং ক্ষুদিরাম ছাড়া আর কেউ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যিনি হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে জীবন দিয়েছেন। সব দেশবাসীকে পথ দেখিয়েছেন—কঠিন সংকল্পের পথ—দেখিয়েছেন স্বাধীনতার পথ। স্বাধীনতার স্বপ্ন।

বাড়ির পাশে যে কালীমন্দিরটি ছিল সেখানে প্রণাম করতে করতে বলতেন—মা, আমায় শক্তি দাও যাতে সাহেব পাঁঠাদের বলি দিয়ে ভারতবর্ষকে ইংরেজশূন্য করে দিতে পারি। একবার ক্ষুদিরামের অনেক দিন ধরে জ্বর হচ্ছিল—কিছুতেই জ্বর ছাড়ছিল না। তাই অপরূপাদেবী এক ওঝাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম সেই ওঝাকে বলে দিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে যদি ইংরেজ ভূতদের তাড়াতে পারেন তবেই আমার ঘাড় থেকে ইংরেজ ভূতদের নামাতে পারবেন। ১৬/১৭ বছর বয়স থেকেই লাঠি খেলায় ক্ষুদিরামের যা নামডাক হয়েছিল তা সহ্য করতে না পেরে দেশের সেরা পাঁচজন লাঠিয়াল তাঁকে শিক্ষা দিতে এসে নিজেরাই হার মানতে বাধ্য হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ক্ষুদিরামকেই সেরা লাঠিয়ালের স্বীকৃতি দিয়েছিল।

## বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লবীদের ভূমিকা

এদিকে বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করল। প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ যত বাড়তে লাগল ইংরেজ শাসকরা ততই ক্ষেপে উঠতে লাগল। এমনকি তারা 'বন্দে মাতরম্' বলা পর্যন্ত বেআইনি করে দিল।

ওই সময় কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. কিংসফোর্ড। এঁর মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক তখন দেখা যেত না। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকেও তিনি ছেড়ে দেননি। তাঁকে জেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন।

তাঁর বিচারের দিন আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। জনতা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাতে থাকে। এই সময় সুশীল সেন নামে একটি পনেরো বছরের ছেলেকে এক ইংরেজ সার্জেন্ট ঘুসি মারায় সুশীল সঙ্গে সঙ্গে পালটা ঘুসি মেরে এই অন্যায়ের জবাব দেয়। সুশীলকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন বিচারের প্রহসনের পর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ষোলো ঘা বেত মারার আদেশ দেন। হাসি মুখে সুশীল সেন ওই অন্যায় বেত্রাঘাত সহ্য করেন। পরের দিন *সন্ধ্যা* কাগজে কিংসফোর্ডের নামে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল—

**মাই নেম ইজ কিংসফোরদ,**  
**আই অ্যাম এ গ্রেট মরদ,**  
**পেটের জ্বালায় আই কেম হিয়ার।**  
**ইন দিস নেটিভ ভারত এম্পায়ার**  
**মাই গুড্‌লাক্ এন্ড ফেট্,**  
**করে দিয়েছি ম্যাজিস্ট্রেট**

আই রিটালিয়েটেড অন হিম সাধ মিটাইয়া,
উইথ সিক্সটিন স্টাইপ্‌স হাজতে পুরিয়া।

(বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, *শহীদের রক্তে রাঙা*, পৃঃ ৪৩)

ইংরেজ শাসকদের এই অমানুষিক অত্যাচার দেশের মানুষরা আর সহ্য করতে পারছিল না। বিপ্লবীদের গোপন সভায় কিংসফোর্ডের বিচার হল। বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল কিন্তু কার হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়? ইংরেজরাও বুঝেছিল যে আর বেশিদিন কিংসফোর্ডকে কলকাতায় রাখা নিরাপদ হবে না। তাই হঠাৎ একদিন তাকে মজঃফরপুরের জেলা জজ করে বদলি করে দেওয়া হল।

ক্ষুদিরাম তখন মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়ায়। একদিন হঠাৎ বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে খবর পেলেন যে ক্ষুদিরামকে বিশেষ কাজে পশ্চিমে যেতে হবে।

এবার কলকাতা, বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর বাসায় উঠলেন ক্ষুদিরাম। সেখানে দুদিন থেকে তিনি আর প্রফুল্ল চাকী একদিন বিকেলে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও হেমচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে মজঃফরপুরের পথে রওনা হয়ে গেলেন। প্রফুল্ল চাকীর নাম তখন আর প্রফুল্ল চাকী নয়। তখন তাঁর ছদ্মনাম হয়েছে দীনেশচন্দ্র রায়। আর ক্ষুদিরামের ছদ্মনাম হয়েছে দুর্গাদাস সেন। ক্ষুদিরামের কাছে দুটো গুলিভরা রিভলভার আর একটা বড়ো টিনের কৌটোর মধ্যে ভয়ংকর একটা বোমা। প্রফুল্ল চাকীর কাছে একটা গুলিভরা রিভলভার ও বেশ কিছু কার্তুজ যা দুজনেরই কাজে লাগবে।

মজঃফরপুরে পৌঁছে ওরা দুজনে একটা ধর্মশালায় ওঠেন। তারপর শুরু হল কিংসফোর্ডের ওপর নজরদারি করা। কখন কোথায় যান বা থাকেন। কী করেন কোন্ সময় সেই সবের ওপর লক্ষ রাখা। দেখার চেষ্টা যে কোথায় বা কোন্ জায়গায় কিংসফোর্ডকে পিস্তলের গুলির আয়ত্তে পাওয়া যায়। এদিকে কিংসফোর্ডও খুব ধূর্ত। উনি আগে থেকেই বুঝেছিলেন যে তিনি যে অন্যায় করেছেন তাতে বিপ্লবীরা তাঁকে ছেড়ে দেবে না। তাই তিনি বিশেষ কোথাও বেরুতেন না। সকালে কোর্টে যেতেন। কোর্ট থেকে ফিরে বাড়িতেই থাকতেন। সন্ধের পর একবার ক্লাবে যেতেন তাস খেলতে। সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসতেন। আর সবসময়ই বন্দুকধারী প্রহরীরা তাঁকে ঘিরে থাকত। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী সব সময় বাজপাখির মতো কিংসফোর্ডের চলাফেরার ওপর নজরদারি করতেন।

৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। ১৯/২০ দিন মজঃফরপুরে থেকেও তাঁরা দুজনে কাজের কাজ কিছু করতে পারেননি। তাই গত কাল (২৯/৪/১৯০৮) তাঁরা দুজনে নতুন করে শপথ নিয়েছেন যে আগামীকাল ৩০/৪/১৯০৮ তারিখেই কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে।

৩০ এপ্রিল, ১৯০৮। সন্ধে হতে না হতেই দুজনে (ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী) কিংসফোর্ডের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। দুজন প্রহরী তা লক্ষ করে

ওদের দুজনকে সরে যেতে বলল। ওরা একটু দূরে সরে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধের অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। পথঘাট নির্জন হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ করতে লাগল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় ক্লাব থেকে একটা ফিটন গাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। গাড়িটা কাছাকাছি আসতেই ক্ষুদিরাম ছুটে গিয়ে সেই ভয়ংকর বোমাটা অভ্রান্ত নিশানায় গাড়িটার মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্ষুদিরামের ওই ফিটন গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন ব্যারিস্টার মি. কেনেডির স্ত্রী মিসেস কেনেডি ও কন্যা মিস্ কেনেডি। কিছুক্ষণ পরে ফিরবেন বলে কিংসফোর্ড ওঁদের দুজনকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওই ফিটন গাড়িটিতে।

কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন। আর দুজন নির্দোষ মহিলা প্রাণ হারালেন। এদিকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুজন দুদিকে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

সারারাত দৌড়ে মজঃফরপুর থেকে ২৩/২৪ মাইল দূরে ক্ষুদিরাম ওয়াইনি নামে এক জায়গায় এসে থামলেন। তখন সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। খিদে তেষ্টায় ক্লান্ত ক্ষুদিরামের তখন চলার শক্তি পর্যন্ত নেই। ওয়াইনি স্টেশনের খুব কাছের একটা দোকান থেকে মুড়ি কিনে খাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে দুজন পুলিশ এসে হাজির।

দু-একটা কথা বলেই একজন ক্ষুদিরামের একটা হাত চেপে ধরল। ধস্তাধস্তিতে ক্ষুদিরামের হাতের রিভলভারটা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় ক্ষুদিরাম সহজেই ধরা পড়ে গেল।

সারা রাত ধরে দেশের সর্বত্র খবর পাঠানো হল যে দুজন তরুণ বিপ্লবী মজঃফরপুরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পালাচ্ছে। তাদের যেন দেখা মাত্র ধরা হয়।

ধরা পড়ার পরই ক্ষুদিরাম জানতে পারলেন যে কিংসফোর্ড মরেনি। তার বদলে দুজন নিরীহ মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। শোনার পর ক্ষুদিরামের দুঃখের সীমা রইল না। এ কী হল। এতো আমি চাইনি। বিকেলে ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর স্টেশনে আনা হবে শুনে বিকেলে মজঃফরপুর স্টেশনে সব লোক এসে হাজির হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল মজঃফরপুর স্টেশন চত্বর। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা মাত্র কামরার মধ্যে থেকে ক্ষুদিরাম নিজেই ধ্বনি দিলেন—'বন্দে মাতরম্'। আবার কামরার বাইরে এসেও ক্ষুদিরাম ধ্বনি দিলেন—'বন্দে মাতরম্'। জনতাও বারবার ধ্বনি দিতে লাগল—'বন্দে মাতরম্'। তাছাড়াও ক্ষুদিরামের নির্ভীক অথচ শান্ত কিশোর মূর্তি দেখেও সকলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার একটু প্রফুল্ল চাকীর দিকে চোখ ফেরানো যাক। তাঁকে প্রথম দেখতে পাই মানিকতলার আখড়ায়। ক্ষুদিরামের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে আনানো হয়েছে। আমরা প্রথম দেখি দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন। কেউ কারুর নাম জানেন না। ওই মানিকতলার আখড়াতেই প্রথম পরিচয়। ওই দিন ওই সময়ে তাঁদের নাম বদলে দেওয়া হল। ক্ষুদিরামের নাম দেওয়া হল দুর্গাদাস সেন। আর প্রফুল্ল চাকীর

নাম রাখা হল দীনেশচন্দ্র রায়। তারপর দেখি মজঃফরপুর পৌঁছে ওখানকার ধর্মশালা থেকে দীনেশচন্দ্র রায় বা প্রফুল্ল চাকীর বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা চিঠিটি। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ছদ্মনাম সুকুমার। প্রফুল্ল লেখেন—

"প্রিয় সুকুদা

আমরা এখানে নিরাপদে আছি। বরকে এখনো দেখিনি। কিন্তু বরের বাড়িটির ওপর ভালোভাবেই লক্ষ রাখছি।"

আশাকরি পাঠকরা বুঝতেই পেরেছেন যে বর বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল রাত আটটা নাগাদ দুই তরুণকে দেখা গিয়েছিল কিংসফোর্ডের বাংলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিংবা বড়ো গাছটার নীচে অপেক্ষা করছিলেন। সেই ভয়ংকর বোমাটি ক্ষুদিরামের হাতে। প্রফুল্লর কাছে গুলিভরা দু-দুটি পিস্তল। একটা ফিটন গাড়ি ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষুদিরাম ছুটে গিয়ে অভ্রান্ত নিশানায় বোমাটি ছুঁড়ে দিল। কেঁপে উঠল সারা শহর। দুই তরুণ দু-দিকে ছুটে চলে গেল। পরের দিন সকালে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেলেন।

## প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা

এদিকে প্রফুল্ল চাকীকে দেখা গেল পরের দিন দুপুরবেলা নতুন জামাকাপড় পরে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সে (প্রফুল্ল) সমস্তিপুরের দিকে যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক তাকে ডেকে যখন শুনলেন সে সমস্তিপুর যাচ্ছে ট্রেন ধরতে তখন তাকে বললেন এখন তো ট্রেন পাবেন না। তার চেয়ে আপাতত আমার বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম করবেন চলুন। বিকেলে আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। তাঁর আন্তরিকাতায় প্রফুল্ল রাজি হয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত তাই হল।

যে কামরাতে প্রফুল্ল উঠল সে কামরায় ছেলে-বুড়ো সকলেই গত রাত্রের মজঃফরপুরের ঘটনাই আলোচনা করছিল। ওই কামরাতে নন্দলাল ব্যানার্জী নামে পুলিশের এক দারোগাও যাচ্ছিলেন। তবে তিনি ওই সময় ছুটিতে ছিলেন বলে সাদা পোশাকে যাচ্ছিলেন। প্রফুল্লকে দেখে তার একটু সন্দেহ হওয়ায় তিনি যেচে যেচে প্রফুল্লের সঙ্গে কথা কয়ে আরও নিশ্চিত হয়ে গেলেন। ট্রেন ভোরের অন্ধকারে সেখানে পৌঁছোল। কুলি না পাওয়া যাওয়ায় প্রফুল্লই তাঁর মালপত্র বয়ে নিয়ে গেল। তারপর প্ল্যাটফরমে মালপত্র রাখার সময় প্রফুল্ল দেখল নন্দলালবাবু ধারে কাছে নেই। তখন প্রফুল্ল অন্য একটা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় নন্দলালবাবু পাঁচ সিপাই নিয়ে সেখানে এসে প্রফুল্লকে বললেন, আমি তোমায় গ্রেফতার করলাম। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় হতচকিত প্রফুল্ল নন্দলালবাবুকে লক্ষ করে পিস্তলের গুলি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। তারপর প্রফুল্ল গুলি চালাতে চালাতে ছুটতে লাগলেন কিছুতেই ধরা দেবেন না বলে। কিছু না বুঝে জনতা ও পুলিশও তাঁকে ধাওয়া করল। তখন নিরুপায় বুঝে প্রফুল্ল পিস্তলের নলটা নিজের গলায় বসিয়ে ট্রিগারে চাপ

দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণহীন দেহটা প্ল্যাটফরমের মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওই সময়েই সসাগরা পৃথিবীর এক নশ্বর শক্তি প্রফুল্লকে ছুঁতে পর্যন্ত পারল না। তাই দুজনের মধ্যে প্রফুল্ল চাকীই প্রথম শহিদ হয়ে গেলেন। তারিখটা ছিল ১৯০৮ সালের দোসরা মে ভোরবেলা।

## ক্ষুদিরামের ফাঁসি বিচারের প্রহসন

কয়েকদিন ধরে বিচার চলল মজঃফরপুরে। বিচারের দিনগুলোতে আদালতকক্ষ লোকে লোকারণ্য থাকত। যাঁরা ওই দিনগুলোতে তাঁকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর মনোবল ও নির্ভীকতায় বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন। তাই আন্তরিকভাবে জেলাশাসক ও বিচারককে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ডে প্রফুল্ল চাকীর কোন ভূমিকাই ছিল না। অর্থাৎ সব দোষই নিজের ওপর তুলে নিয়ে প্রফুল্লকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়াও ক্ষুদিরামের মুখ থেকে কোনো কথাই কেউ বার করতে পারেননি। তাই তাঁর পক্ষের উকিল যখন জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ভয় করছে না? তখন নির্ভীক কিশোর বিপ্লবী জবাব দিলেন—ভয় করব কেন? আমি যে গীতা পড়েছি। গীতায় বলেছে আত্মার মৃত্যু নেই। ক্ষুদিরাম আরও বললেন—আমি আবার ফিরে আসব।

আদালতে ক্ষুদিরামের বিচার চলেছে। ক্ষুদিরামও মাথা উঁচু করে নির্ভীকভাবে বিচারকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে।

আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাবা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বসু। থাকি মেদিনীপুরে।

জজসাহেব—তুমি কখন এবং কোথায় তোমার জুতো জোড়াটা খুলে রেখেছিলে?

ক্ষুদিরাম—বোমাটা ছোড়ার ঠিক দশ মিনিট আগে একটা গাছের তলায় জুতো জোড়াটা খুলে রেখেছিলাম।

জজসাহেব—এত বড়ো ব্যাগের কী প্রয়োজন ছিল?

ক্ষুদিরাম—প্রয়োজন ছিল। ওটির মধ্যেই তো ওই বড়ো বোমাটা ছিল। আর ছিল বাড়তি পিস্তল দুটো এবং বাড়তি কার্তুজগুলো।

জজসাহেব—ওই সবই তোমার কাছে ছিল?

ক্ষুদিরাম—হ্যাঁ, সবই আমার কাছে ছিল।

জজসাহেব—তুমি সব কথা সত্যি বলছো তো?

ক্ষুদিরাম—সত্যি না বলার কোনো কারণই নেই। কারণ আমি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণ বলি দিতেই এ দায়িত্ব নিয়েছিলাম।

এইভাবে চলছিল আদালত কক্ষে বিচারের নামে প্রহসন। ওদিকে বাইরে তখন বিশাল জনসমুদ্র এই বীর কিশোর বিপ্লবীকে শেষ বারের মতো একবার চোখের দেখা দেখতে

চায়। এই কিশোর বিপ্লবীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে নিরাপদ হবে। তাই মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হল। বিচারক বিচারের রায় ক্ষুদিরামকে পড়ে শোনালেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওই রায় শোনার পরও ক্ষুদিরাম নির্বিকার। তখন জজ সাহেব ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করলেন—রায়ের অর্থ তুমি বুঝতে পারছ।

হাসি মুখেই ক্ষুদিরাম জবাব দিল—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তারপর আবার বলল, জজসাহেবকেই—"আমি আবার আসব।"

কয়েকদিন ধরে বিচার চলেছিল। ওই কদিন কাঠগড়ায় যাঁরা তাকে দেখেছেন তাঁরা তার মনোবল ও নির্ভীকতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। মৃত্যু সামনে দেখেও দেখা গেছে হয় সে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে, কিংবা মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। অথবা কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়েছে।

২১ মে মামলা শুরু। ২৩ মে দ্বিতীয়বার জবানবন্দি। ১৩ জুন সেশন কোর্টের রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ৮ জুলাই থেকে হাইকোর্টে আপিলের কাজ শুরু হয়। হাইকোর্টে ক্ষুদিরামের পক্ষে সওয়াল শুরু করেন নরেন্দ্রকুমার বসু। তিনি সেশন কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন যেহেতু সেশনকোর্টে বিচার আইন মোতাবেক হয়নি সেক্ষেত্রে এই মামলার নতুন করে বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ১৩ জুলাই তারিখের রায়ে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। দুই শ্বেতাঙ্গ জজ।

## ১৯০৮ সালেব ১১ অগাস্ট ভোর ৬টা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় লাল কালি দিয়ে লিখে রাখার মতন একটা দিন। ওই দিন ভোর ছটায় ক্ষুদিরাম দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হাসতে হাসতে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে এযুগের দধীচি হয়ে দেশবাসীর কাছে অমব হয়ে গেছে।

ভোর ছটায় ফাঁসি হবে। তাই বহু আগে থেকেই জেলখানায় চলছে তার প্রস্তুতি। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিয়ে এবং মা কালীর চরণামৃত খেয়ে নিয়ে ক্ষুদিরাম প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

জেল অধিকর্তা তার সঙ্গীদের নিয়ে হাজির হতেই ক্ষুদিরাম তার সেল থেকে বেরিয়ে ধ্বনি দিল—'বন্দে মাতরম্।' পরিচিত দু-চার জনকে দেখে হাসল। তারপর ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চে উঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে জল্লাদের চোখেও জল এসে গেল। অথচ ক্ষুদিরাম তখন হাসছেন।

এরপর ক্ষুদিরামের হাত দুটো পেছন দিক থেকে বেঁধে দেওয়া হল। একটা সবুজ রঙের টুপি দিয়ে তার ঘাড় পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল। শেষে ফাঁসির ফাঁসটা তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হল। জেলাশাসক রুমাল নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ একটা হাতলে চাপ দিল। ওমনি ক্ষুদিরামের দেহটা নীচে নেমে গেল। একবার দু-বার দড়িটা নড়ে উঠল। তারপরই সব শেষ।

গণ্ডক নদীর তীরে শ্মশান। অসংখ্য পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। মৃত ক্ষুদিরামকেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কত ভয়। শ্মশান ঘাটেও মানুষের ঢল নেমেছে—তিল ধারণের স্থান নেই। ক্ষুদিরামের মৃতদেহ আনা হল। শোকমগ্ন মানুষ ফুলে ফুলে ঢেকে দিল তার মৃতদেহ। কিন্তু তার অনাবৃত মুখে তখনও বিজয়ী বিপ্লবীর অমলিন ও দুঃসাহসের হাসি।

সেদিনের সেই রক্তাক্ত স্মৃতি আজো গাঁথা হয়ে আছে প্রতিটি বাঙালি তথা ভারতবাসীর অন্তরে। তাই তো কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় পল্লিকবির করুণ গানখানি—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী" আজও আমাদের ঠিক সেই সময়ের মতনই সমানভাবে ব্যাকুল ও অভিভূত করে তোলে।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।
আঠারো মাসের পরে, জনম নেব মাসির ঘরে—মা গো
চিনতে যদি না পার মা,
দেখবে গলায় ফাঁসি।

চোদ্দো

# বিদ্রোহ, স্বদেশপ্রেম ও ব্যথিত মানবাত্মার কবি নজরুল ইসলাম

যে কবির কাব্যে ধ্বনিত হয় অগ্নিবীণার সুরঝংকার, শোনা যায় যৌবনের জয়গান, শান্ত ও স্নিগ্ধ বাংলা কাব্যধারায় যিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন কালবৈশাখীর অস্থির উদ্দামতা, পরাধীন ভারতবর্ষের জরাগ্রস্ত সমাজের ধমনীতে যিনি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন নবযৌবনের উষ্ণ শোণিত ধারা, তিনিই তো মানবদরদি, স্বদেশপ্রেমিক ও চির-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহের পতাকা তুলে দুর্বার গতিতে নজরুল প্রবেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ভূমিতে। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি। আসলে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই বাংলা কাব্যের আঙিনায় প্রবেশের পক্ষে তাঁর ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যখন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি,
নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলার যুবমানসকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিপ্লবীদের কণ্ঠে ভাষা দিয়েছিল, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সাহস জুগিয়েছিল। স্বাধীনতার অর্থে কবি জানতেন কেবলমাত্র শুধু ইংরেজের হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর নয় সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের মুক্তি এবং মেহনতি মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ। তাঁর বিপ্লবী চেতনা, গভীর দেশপ্রেম, জঙ্গি অনুপ্রেরণা এবং শোষণহীন সাম্যবাদী আহ্বান সংঘবদ্ধ করেছে, বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে পরাধীন ভারতের যুব সমাজকে, ছাত্রসমাজকে।

জন্মেছিলেন মঙ্গলবার ২৫ মে ১৮৯৯ সালে, (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে) বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরবর্তী চুরুলিয়া গ্রামে। ফকির আহমেদ ও জাহেদা খাতুনের অভাবের সংসারে জন্ম নিল চাঁদের মতো ফুটফুটে এক ছেলে। ধর্মপ্রাণ পিতা ছেলের নাম রাখলেন 'দুখু মিঞা'। মাত্র চার বছর বয়সে নজরুল ভর্তি হলেন গ্রামের একটা মকতবে। বাবা ফকির আহমেদের ইচ্ছে অল্প বয়সেই উর্দু ও ফার্সিটা নজরুল মোটামুটি শিখে রাখুক। হয়েছিলও তাই। প্রথম ৩/৪ বছর পড়েই প্রতিভাবান নজরুল উর্দু ও ফার্সিটা মোটামুটি ভালোভাবেই রপ্ত করে ফেলেছিলেন। তারপর সাত বছর বয়সে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু বিধি বাম। অকালে মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইংরেজি স্কুল (নাম সিয়ারসোল স্কুল) থেকে নাম কাটিয়ে চাকরি নিতে হল একটা রুটির দোকানে

মাত্র পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে। এমনকি রেল কোয়ার্টার্সে এক গার্ডের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজও নিতে হয়েছিল ওই সময়ে, তা দেখে ছাত্রবৎসল ও স্নেহপ্রবণ হেডমাস্টার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিয়ারসোল স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়াবার জন্য তাঁকে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বলে স্কুলে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল— 'ছোটো মাস্টার'। ওই সময় অর্থের অভাব মেটাতে লেঠো গানের দলে ও যাত্রাদলের জন্য গান লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম পরিচয় দিলেন তাঁর অসামান্য কবি প্রতিভার। সে সময়ে নজরুলের ছয় জনের পরিবার। মা জাহেদা খাতুন, দাদা কাজী সাহেব জান, নিজে নজরুল স্বয়ং, ছোটোভাই কাজী আলি হোসেন এবং ছোটো দুই বোন সাজেদান্নেসা ও কুলসুম। সংসারে চরম দারিদ্র্য। কাকা কাজী করিমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে স্থির করলেন যে গান ও কবিতা লিখে যা উপার্জন হবে তার ওপর নির্ভর করেই লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবেন। ভর্তিও হয়েছিলেন সিয়ারসোল রাজস্কুলে। ওখানেই সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন পরবর্তী কালের যশস্বী ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু অর্থের অভাবেই সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। পড়া ছেড়ে আবার চাকরি নিতে হল। এবার যোগ দিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৃষ্ট 'বাঙালি পল্টনে'। যেতে হল প্রথম করাচি। তারপর মেসোপটেমিয়ায়। মেসোপটেমিয়াতেই যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে দেশে ফিরে এলেন, মনে বিশ্বযুদ্ধের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কত স্মৃতি নিয়ে, সেই সঙ্গে আবার দেশের পরাধীনতার জন্য অন্তরে বিদ্রোহের আগুন আর চিন্তাধারায় কমিউনিজমের আদর্শের উপলব্ধি।

এই সময় তিনি কলকাতায় এসে ওঠেন প্রথমে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে সাহিত্য সমিতির অফিসে। এরপর থাকেন বাগবাজারে রামকান্ত বসু লেনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে, অতঃপর ৩/৪ তালতলা লেন ও ৮এ টার্নার স্ট্রিটের বাড়িতে।

যুদ্ধ থেকে দেশে ফিরে এসে দেখলেন চারদিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা সমাজের গলায় যেন ফাঁসের মতো চেপে বসে গেছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশীয় বণিকদের নির্লজ্জ শোষণে গোটা ভারতবর্ষের বুকে রচিত হয়েছে সুবিশাল এক শ্মশান ভূমি, আবার ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রবর্তন করল 'রাওলাট আইন' (১৮/৩/১৯১৯), প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। অনিবার্যভাবে ঘটে গেল ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। গর্জে উঠলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছুড়ে ফেলে দিলেন ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইটহুড্' খেতাব (৩১/৫/১৯১৯)। স্থির থাকতে পারলেন না বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল। ওই শ্মশানভূমিতেই কাপালিকের হুঙ্কারে গর্জে উঠলেন—

কারার ওই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল্, কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদী।

গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে কবি লক্ষ করেছিলেন যে সারা ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে ঠিক তখুনি আবার মাথা তুলছে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত অভিশাপ। কবি তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারিদের ও সমাজপতিদের হুঁশিয়ার করে দিলেন তাঁর বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায়—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম্, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করে কবি আরও লিখেছিলেন—

ওকি চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব—
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা মুজফফ্র আহমেদের সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা—*নবযুগ* (জুলাই, ১৯২০)। যেন আগুন ঝরতে লাগল তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে। যে ভেদনীতির ওপর ভিত্তি করে ইংরেজ ভারতশাসন করতে চেয়েছিল তারই মূলে কুঠারাঘাত করেছিল এই সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাটি। তাই শুধু হিন্দুরাই নয় মুসলিমরা পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। শুরু থেকেই বোঝা গেল যে তাঁর সাংবাদিকতার মূলে জ্বলন্ত দেশপ্রেম, ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক চেতনা প্রধান হয়ে উঠেছে। নভেম্বর বিপ্লব, তুরস্ক বিপ্লব ও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম নজরুলের প্রেরণার উৎস ছিল। এজন্যই তিনি বিপ্লবী কবি ও সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন। ব্রিটিশ শাসকরা প্রথমেই *নবযুগ*কে সতর্ক করে। তারপরেই জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে। *নবযুগ* পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার টাকা জমা দিয়ে কাগজ বের করতে হয়েছিল।

*নবযুগে* নজরুল ইসলামের লেখা ও তাঁর সাংবাদিক প্রতিভা সম্পর্কে কমরেড মুজফফ্র আহমেদ লিখেছেন, "এ কথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই *নবযুগ* জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখা বললে সবকিছু বলা হল না, নজরুলের লেখার হেডিংগুলো হতো অতুলনীয়।" এরপর শঙ্কিত ব্রিটিশ শাসককুল কালবিলম্ব না করে *নবযুগ* পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল। বছর দেড়েক যেতে না যেতেই জন্ম নিল একটি নতুন দ্বি-সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা *ধূমকেতু* (অগাস্ট ১৯২২)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ পাঠালেন—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা

রাতের ভালে হোক্ না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

(২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৯)

দাদাঠাকুর (শরৎ পণ্ডিত) *ধূমকেতু*র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নজরুল তাঁর কলম দিয়ে আগুন ছোটাতে লাগলেন। দেশের যুবসম্প্রদায় পত্রিকাটিকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসে ফেলল। জন্মলগ্ন থেকেই *ধূমকেতু* নিজের পরিচয় দিল এই কথাটির মাধ্যমে—

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ
মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

ধূমকেতু তার চলার পথে ঘোষণা করল, ''সর্বপ্রথম ধূমকেতু চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা'' অথচ জাতীয় কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত 'স্বরাজ' না 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' কী চায় তা বুঝতেই পারছে না। ধূমকেতুর সম্পাদকীয়তে নজরুল বলছেন পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, ''আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ''। বলতে হবে, ''যে যায়, যাক্ সে, আমার হয়নি লয়'' (১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ১৯২৯)

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে বজ্রবিষাণ বেজে উঠল। সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরার অপরাধে নজরুলের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কবিতা লেখার জন্য ব্রিটিশ শাসনে এই প্রথম কারাদণ্ড। তাঁকে কারাগারে কয়েদিদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাকও পরানো হয়েছিল।

প্রায় সকল পত্রপত্রিকা *ধূমকেতু*কে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে *ধূমকেতু*র সাফল্য কামনা করে পত্র দিয়েছিলেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিঠিতে জানালেন—

২৪ শ্রাবণ, শিবপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রুমিত্রনির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি গ্রহণ করিবেন।

তোমাদের
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছিলেন—
ভাই নজরুল,

তোমার 'ধূমকেতু'কে সাদরে আহ্বান করি।
জাগ 'ধূমকেতু' ধ্বংসের হেতু। ...

(কল্পতরু সেনগুপ্ত, *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম*)

এখানে উল্লেখ করতে হয় হুগলি জেলে কবির অনশনের কথা (১৪/৪/১৯২৩ থেকে ২২/৫/১৯২৩)। এই ৩৯ দিন হুগলি জেলে আটক থাকা অবস্থায় একবার তিনি আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। কারও অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করতে রাজি হননি। ওই সময়ে প্রায়ই বলতেন—"আমার কপালে যখন ঈশ্বরের জয়টীকা বহন করছ তখন পারি কি আমি কোনো মানুষের কাছে মাথা নত করতে। বিশেষ করে কুচক্রী শাসকদের কাছে?" তাই লিখেছিলেন—

আমি বেদুইন! আমি চেঙ্গীস—
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়া দিয়ে ৩৯ দিনের অনশন ভঙ্গ করেন। তাঁর আবেদনে বিশ্বকবি বলেছিলেন—"Give up hunger strike! Literature claims you! অন্তত সাহিত্যের প্রয়োজনে তোমাকে বাঁচতেই হবে। আর সে জন্যই অনশন বন্ধ করতে হবে।" অবশ্য কবির শাশুড়িমা গিরিবালা দেবীর আকুল আবেদনও এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করেছিল।

১৯২৫ সালের শেষাশেষি লেবার স্বরাজ পার্টি গঠিত হবার পর *লাঙ্গল* নামে পার্টির মুখপত্র প্রকাশিত হয়। প্রকাশের দিন ২৫ ডিসেম্বর। এই পত্রিকায় নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। যে কবিতাগুলি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভাবানুসরণ করে রচিত হয়েছে। *লাঙ্গল* পত্রিকার জন্যও রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন—

'ধর হাল বলরাম
আন তব মরু ভাঙ্গা হল
বল দাও, ফল দাও
স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

শান্তিনিকেতন ১৩৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কল্পতরু সেনগুপ্ত, *জনগণের কবি কাজী নজরুল*, পৃঃ ৫২)

**কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ**

এদেশে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ভেবেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট*

*পার্টি* বইতে লিখেছেন—"উনপঞ্চাশ বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কাজী নজরুল ইসলাম পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কলকাতায় আমার সঙ্গে থাকতে আসে, কথা হয়েছিলো যে নজরুল ইসলাম কলকাতায় কাব্য-সাহিত্য চর্চা করবে এবং রাজনীতিতেও যোগ দিবে।" তখন তাঁর বয়স একুশ-বাইশ বছর মাত্র। তিনি (মুজঃফর আহমেদ) আরও লিখেছিলেন যে, "১৯২০ সাল হতে খবরের কাগজ চালানোর ভিতর দিয়ে নজরুল ইসলাম আর আমি রাজনীতি করেছি। ১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা মার্কসবাদের পড়াশুনা করব বলে স্থির করেছিলাম। কিছু পুঁথিপত্রও সে সময়ে কিনেছিলাম।"

রাজনীতি করার, বিশেষ করে কমিউনিস্ট রাজনীতি করার সংকল্প নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজঃফর আহমেদ যুগ্মভাবে ১৯২০ সালে *নবযুগ* পত্রিকা বার করেছিলেন। তারপরে *ধূমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণী* কাগজে কখনও মুজফফ্‌র আহমেদ্‌ নজরুলের সহযোগী, কখনও নজরুল মুজফফ্‌র আহমেদের সহযোগী। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা। এই পত্রিকাগুলির লেখায় একদিকে যেমন বিপ্লবী যুবসমাজ উৎসাহিত হয়েছে, নতুনভাবে সংগঠিত হবার প্রেরণা পেয়েছে, আরেক দিকে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রচার হয়েছে।

(কল্পতরু সেনগুপ্ত, *জনগণের কবি কাজী* নজরুল, পৃঃ ৬১)

কিন্তু নজরুল কবি, রাজনীতিক নন, চিন্তাধারা তাঁর যাই থাক, এই জরামরার দেশে কবি গাইলেন উদ্দাম যৌবনের গান। রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে অপূর্ব উন্মাদনা নিয়ে অহোরাত্র তিনি রচনা করে চললেন যৌবনের বন্দনা গীতি। ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তি নজরুল সাহিত্যের সোনার কাঠির স্পর্শে বারবার উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অত্যাচার অবিচার যেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানেই ধ্বনিত হয়েছে নজরুলের বজ্রগর্জন। তাঁর বিদ্রোহের মূলমন্ত্র দাসত্ব নয়—স্বাধীনতা, রক্ষণশীলতা নয়—অগ্রগতি, ভীরুতা নয়—সাহস। স্থবির জীবনের নয়—সদাচলমান জীবনের জয়গানই তিনি গেয়েছেন তাঁর কাব্য, সাহিত্য, গান ও কবিতার মধ্যে।

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত দম্ভে যে যৌবন আজ ধরি' আমি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।

('আমি গাই তারি গান' ঃ *সন্ধ্যা*)

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ভারতের যুবশক্তিকে বিপ্লবমুখী করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গান্ধীজির আন্দোলনের বৈপ্লবিক চেতনা কবিকে মুগ্ধ করলেও, নজরুল দেখলেন—দাও দাও বলে চাইলেই আর কথায় কথায় অনশন করলেই দাবি পূরণ হবে না। চাই সশস্ত্র বিপ্লব। তিনি ভর্ৎসনা করে লিখলেন—

সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

('সব্যসাচী' ঃ *ফণিমনসা*)

মাহাত্মাজি যখন অহিংসার মাধ্যমে নতুন কর্মপন্থা নিয়ে এলেন তখন সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে নজরুলও তাঁকে সংবর্ধিত করলেন তাঁর *ফণিমনসা* কাব্যগ্রন্থের 'বাংলায় মহাত্মা' কবিতার মাধ্যমে।

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে
ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে।

('বাংলায় মহাত্মা')

গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী মহান হৃদয়বেত্তাকে নজরুল বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যদিও দুজনের রাজনৈতিক ও সংগ্রামী চিন্তাধারার মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। গান্ধীজিকে নজরুল স্মরণ করেছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন অবতার পুরুষদের সাথে একই সঙ্গে।

চিনেছিলেন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মহম্মদ ও রাম
মানুষ কী, আর কী তার দাম
তাই মানুষ যাদের করত ঘৃণা, তাদের বুকে দিলেন স্থান
গান্ধী আবার গান সে গান।

সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষেত্রে। দেশবন্ধু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল গড়লেন। নজরুল মনেপ্রাণে সমর্থন করলেন স্বরাজ্য দলের প্রস্তাবিত কর্মধারাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নজরুলের ধারণা হল সবই ফাঁকা ভেজাল পলিটিক্সের বুলি। দেশবন্ধুর মহৎ উদার প্রাণ থাকলেও তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দেশবন্ধুর মতো গরিবদের জন্য কিছুই ভাবতেন না বা দীনদুঃখীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর মেলামেশা পছন্দ করতেন না—তাঁরা এসেছিলেন অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশের জন্য ভোট-ভিখারি হয়ে। স্বরাজ্য দলকে সমর্থনের ভুল তাঁর ভাঙল। নজরুল তাঁর 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় লিখলেন—

স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস...
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়, স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।

('আমার কৈফিয়ৎ')

কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে কবি নজরুল ব্যথাতুর চিত্তে শ্রাদ্ধ বাসরের জন্য লিখলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি—

ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে স্বর্গ করেছে চুরি ;
অভিযানে চলে ধরণির সেনা, অশনিতে বাজে তূরী।।
হে দেশবন্ধু, হয়তো স্বর্গে দেবেন্দ্র হয়ে তুমি
জানিনা কী চোখে দেখিছ, ভীরুর ভারতভূমি।।
ক্ষীণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ বাসরে কী মন্ত্র উচ্চারি
তোমারে তুষিব আমরা তো নহি শ্রাদ্ধের অধিকারী,
শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে বীর অনাগত তারা
স্বাধীন দেশের প্রভাত-সূর্যে বন্দিবে তোমা যারা।।

('তর্পণ' ঃ *সন্ধ্যা*)

সারা পৃথিবীর যে-কোন স্থানে স্বদেশে বা বিদেশে যখন যে বিপ্লবী নেতা স্বৈরাচারী রাজশাসনের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের পক্ষে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন নজরুল তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তুরস্কের কামাল পাশা, মিশরের জগলুল পাশা, মরক্কোর রিফসর্দার, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ থেকে শুরু করে ভারতের লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, যতীন দাশ, বাঘা যতীন ইত্যাদি আরও অনেক জানা-অজানা দেশপ্রেমিকদের প্রতি কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বারে বারে।

নজরুলের বিদ্রোহ যেমন ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে তেমনি ছিল আবার সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ভেদ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও। তাঁর স্বপ্ন ছিল দুটি। প্রথমত, অখণ্ড ভারতের জন্য চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষেব জন্য ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কবি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না কেন থাকবে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্য যখন সকলেই আমরা এক ঈশ্বরের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রা'। আর তাই বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে গেয়ে গেছেন—

গাই সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।

স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর কলমের মাধ্যমে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন রচনা করে গেছেন। তাঁর কাব্য তাই প্রকৃত অর্থেই হিন্দু ও মুসলমানদের মিলন তীর্থ। এজন্যই শেষপর্যন্ত দেশ বিভাগ আটকাতে না পেরে তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে গেছি আমরা।

*যুগান্তর* পত্রিকার ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সংখ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত সমালোচক অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন "আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমি কোন্ কুক্ষণে কাজী নজরুলের গানের সমালোচনা করেছিলাম *জয়তী* পত্রিকায়। একথা ঠিক যে, তাঁকে

কেন্দ্র করে কোন 'পত্রিকা' ঘুরতে পারে না ; কারণ astronomical, তিনি জ্যোতিষ্ক নন, তিনি ধূমকেতু, আর ধূমকেতুর কোনো উপগ্রহ থাকে না। কাজী নজরুলের প্রতিভা-সূর্যকে কেন্দ্র করে কোনো সাহিত্য-গ্রহও আবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি দশ বৎসর পূর্বে কাজীকে কেন্দ্র করে তরুণ মুসলমান ও হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য আসর সুন্দররূপে জমে উঠেছিল। কাজী সে মজলিসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বলেই সেদিন হয়েছিল এত শ্রোতৃ-সমাগম। কাজী করেছিলেন আমাদের কবি-সভায় মীর-মোশায়েরার কাজ ; তাই কাজীর কবিতা শুনতে এসে অবকাশ সময়ে আমাদের কবিতা শোনানো হলেও শ্রোতারা আসর ছেড়ে উঠে যেতেন না। কিন্তু আজ সে আসর ভেঙে গেছে। কাজী গরহাজির বলে সমঝদারের দল আর ভিড় করছেন না। আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা তাই উপেক্ষিত,—ভাবচর্চার মতন বুদ্ধি-চর্চার ক্ষেত্রেও নেই তেমন সাড়া। আমাদের সাহিত্যের আসর সরগরম করে তুলবাব মতো সৃজনী প্রতিভার আবির্ভাব কবে যে আবার হবে, সে কথা ভেবে আজ আমার মনে জাগছে বেদনা আর নৈরাশ্য।"

(হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত "নজরুল রচনা সম্ভার")

মঙ্গলময় ঈশ্বরও যেন তাঁকে বঞ্চনা করলেন। মাত্র ৪৩ বছর বয়সেই কেড়ে নিলেন অমন অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটির বাক্‌শক্তি ও স্মৃতিশক্তি। হয়তো ঈশ্বরের আশীর্বাদের ধরনটাই ওইরকম। যাকে তিনি তাঁর নিজের কাজের জন্য বেছে নেন, যার গলায় পরিয়ে দেন তাঁর আশীর্বাদের মালা তার সুখসম্পদ সব কিছুই দেন ধুলোয় মিশিয়ে। সেই আশীর্বাদী মালা গলায় ধারণ করার সাধ্য ও সৌভাগ্য কজনের হয় জানি না। তবে যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় ভরে ওঠে। তাই বিশ্বকবি বলেছেন—

এতো মালা নয় গো,
এ যে তোমার তরবারি,
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্রসম ভারি—
এ তো তোমার তরবারি।

১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি (জুলাই-অগাস্ট মাস) বাংলাদেশ সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে নজরুল ঢাকা গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশে ফেরা আর হল না তাঁর ; হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ২৯ অগাস্ট ওই ঢাকাতেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেখ মুজিবহীন বাংলাদেশ সরকার কবির মরদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দিল না, শুধুমাত্র এসেছিল ওখানকার কবরের এক মুঠো মাটি, যা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চুরুলিয়ায় কবি পত্নী প্রমীলা ইসলামের কবরের ওপর।

মানবদরদি, স্বদেশ-প্রেমিক ও চিরবিদ্রোহী কবি নজরুলের কথা বলতে হলে আমাদের অবশ্যই জ্ঞানতপস্বী সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হবে—

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
শুধু ভাগ হয়নিকো নজরুল।

পনেরো

# শহিদ সন্তোষকুমার মিত্রের জীবন ও সময়কাল

মুক্তির মন্দির সোপানতলে—
কতো প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।

## পরিচয়

আগরপাড়া নিবাসী দুর্গাচরণ মিত্র ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী নবনলিনী মিত্রের দুটি সন্তান ছিল। বড়োটি কন্যা—নাম মলিনা মিত্র। আর ছোটোটি পুত্র—নাম সন্তোষকুমার মিত্র। ওঁদেব মা নবনলিনী মিত্র আবাব গড়পাড়ের সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারেব কন্যা ছিলেন। এঁরা আগরপাড়া থেকে মধ্য কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে চলে আসেন। প্রথমে ৯/সি হলধর বর্ধন লেনে এবং পরে ৩/১ অক্রূর দত্ত লেনে বসবাস করতে থাকেন। তবে প্রথম জীবনে মলিনা ও সন্তোষকুমাবকে বাংলার বাইরেই কাটাতে হয়েছিল বেশি। যেহেতু দুর্গাচরণবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী ছিলেন। আর চাকরিটাও ছিল বদলির। মলিনা ও সন্তোষকুমার স্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসে উঠে আসার পর দুর্গাচরণবাবু পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বাস করতে চলে আসেন। ১৯০০ সালের ১৫ অগাস্ট সন্তোষকুমারের জন্ম হয়। মলিনার জন্ম হয় বছর দুই আগে। তবে মায়ের জন্মের সঠিক তারিখটা মলিনা দেবীর মেজো ছেলে—শ্রীযুক্ত রঞ্জন বসু সি.এ. অথবা ছোটো মেয়ে শ্রীমতী কল্যাণী বসু (ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা) কেউই মনে করতে পারলেন না।

## মৃত্যুশোক

সন্তোষকুমার ও তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্নাদেবীরও ছিল দুটি সন্তান। বড়োটি মেয়ে, নাম ছিল রেণু। ছোটোটি ছেলে, তার নাম ছিল রণবীর। ডাক নাম বাবুজি। জ্যোৎস্না দেবী সারা জীবন ধরে অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখ পেয়ে এসেছেন। বারে বারে মৃত্যু এসে তাঁকে আঘাত করেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে এক মর্মান্তিক পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামী স্বামীকে হারিয়ে তাঁকে বিধবা হতে হয়েছিল। তারপর তাঁর যখন ৩৫ বছর বয়স তখন একমাত্র কন্যা রেণুকে হারান। সালটা ছিল ১৯৪৫। আরও মর্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার হল কি ঠিক পরের বছরের অর্থাৎ কিনা ১৯৪৬ সালেই সলিল সমাধি ঘটে যায় একমাত্র পুত্র রণবীরের। রণবীর তখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং

বিভাগের ছাত্র ছিল। একটা ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। ওই দিনই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে যায়। তবুও জ্যোৎস্নাদেবী একেবারেই ভেঙে পড়েননি। স্বামী, কন্যা ও পুত্রহারা জ্যোৎস্নাদেবীর বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে মঙ্গলময় ঈশ্বর যাকে তাঁর নিজের কাজের জন্য বেছে নেন অথবা যার গলায় পরিয়ে দেন তাঁর আশীর্বাদী মালা তার সুখ-সম্পদ সব কিছুই দেন ধুলোয় মিশিয়ে। তাকে করে দেন একেবারে সর্বস্ব হারা পথের ভিখারি বা কাঙাল। সে মালা গলায় ধারণ করার শক্তি বা সৌভাগ্য কার হয় জানি না। তবে যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় ভরে ওঠে। তাই তো বিশ্বকবি লিখেছেন—

এ তো মালা নয় গো<br>
এ যে তোমার তরবারি—<br>
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,<br>
বজ্রসম ভারি—<br>
এতো তোমার তরবারি।

## রাজনৈতিক জীবন

তারুণ্যের প্রতীক সন্তোষকুমার মিত্রের রাজনৈতিক জীবন বিশেষ দীর্ঘ না হলেও অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ছিল। তাঁর আসল পরিচয় হল রাজনৈতিক কাজকর্মে দক্ষতা। সংগঠন গড়ে তোলায় বিশেষ নৈপুণ্য। রিভলভার চালানোয় অসাধারণ পটুত্ব এবং তাঁর প্রগতিশীল ধ্যানধারণার জন্য। তাঁর সমসাময়িক রাজনীতির মানুষেরা এক-বাক্যে স্বীকার করতেন যে স্বরাজ সেবক সংঘটি প্রধানত তাঁরই একক প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবীদের ও বিপ্লবে বিশ্বাসী মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই শ্রদ্ধাই তাঁকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, প্রভাস দে, কালীপদ বসু, অনুকূল মুখার্জী, মুজফ্‌ফর আহমেদ, স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ডাকসাইটে বিপ্লবীদের কাছে কাছে টেনেছে চিরদিন। বলাবাহুল্য, তাঁর রাজনৈতিক জীবনটা ডাকসাইটে বিপ্লবী ও যুবশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ারই চমকপ্রদ কাহিনি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং Workers and Peasants Party-র অন্যতম উদ্যোক্তা মজঃফর আহমেদ এই সময় গোপনে পালিয়ে এসে ভারতে অবস্থান করছিলেন। তিনিই সন্তোষ মিত্রকে অবনী মুখার্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দেন। তারপর থেকেই অর্থাৎ মুজফ্‌ফর আহমেদ ও অবনী মুখার্জীর ঘনিষ্ঠতাই তাঁকে ধীরে ধীরে সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং শেষপর্যন্ত Workers and Peasants Party-র সদস্য পদ গ্রহণ করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯২৮ সালে রামমোহন লাইব্রেরি হলে যে সমাজবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেছিলেন।

## আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা

এবপরই আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৪ সালে) প্রধান আসামি হিসেবে কারারুদ্ধ হন। এক বছর মামলা চলার পব তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তা হতে দিলেন না পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। কারণ ইতিমধ্যেই সন্তোষ মিত্র টেগার্ট সাহেবের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই টেগার্ট ১৮১৮ সালের তিনধারা প্রয়োগ করে তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দি হিসেবে কারারুদ্ধ করে রাখলেন।

১৯২৭ সালে তিনি মুক্তি পান। তবে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকার সময় তিনি জেল থেকে পড়াশোনা করেই এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন।

১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সময়ে যখন তিনি বেল পেয়ে জেলের বাইরে ছিলেন সেই সময় তাঁব বিবাহ হয শ্রীমতী জ্যোৎস্নাদেবীর সঙ্গে।

## জাতীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা

তাছাড়াও ওই সময় অর্থাৎ ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত সময়ে যখনই তিনি জেলের বাইরে থেকেছেন তখনই জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে এতদিন জাতীয় কংগ্রেসে বিপ্লবীদের কোন স্থানই ছিল না। কিন্তু ১৯২৪-২৫-এর পর থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সক্রিয়তায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিপ্লবীরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯২৭-২৮-এ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে বাম-মনোভাবাপন্ন একটি গোষ্ঠী। এজন্যই ১৯২৮ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে (দেশবন্ধু নগরে) অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের চুয়াল্লিশতম অধিবেশন। ওই সময় অমর শহিদ যতীন দাশকে G.O.C.-র (সুভাষচন্দ্রের) ঠিক নীচের সহকারী পদটি দেওয়া হয়। অতঃপব ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহায়তায় নিখিল বঙ্গ যুব আন্দোলন গড়ে ওঠে। যুব আন্দোলনের প্রথম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্কসার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের চুয়াল্লিশতম সম্মেলনেরই মণ্ডপে। আর যুব সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু স্বয়ং। বিপ্লবীদের অনেকেই বিশেষত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখেরা জাতীয় কংগ্রেসের পুরোনো নিয়মতান্ত্রিক পথ বর্জন করেন। সন্তোষকুমার ওই সম্মেলন-নির্দেশিত বিপ্লবের পথ গ্রহণের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিনকার সভায় পরিচালকমণ্ডলী সন্তোষকুমারের সমর্থকদের সভায় প্রবেশের পক্ষে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্রমিক ও কৃষকদের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে পরিচালকমণ্ডলীকে হার মানতে হয়েছিল। সন্তোষ মিত্রের সমর্থকদের সেই সভায় প্রবেশাধিকার দিতেই হয়েছিল এবং নিয়মতান্ত্রিক পথ বর্জন করে গণসংযোগের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

## প্রথম সোসালিস্ট কনফারেন্স

প্রধানত সন্তোষ মিত্রের চেষ্টাতেই রামমোহন লাইব্রেরি হলে ১৯২৮ সালে প্রথম সোসালিস্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের পর চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের যুদ্ধের মতো দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যায়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে সন্তোষ মিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। আর পুলিশ ওই সময় থেকে সন্তোষ মিত্রকে আবার ভীষণভাবে খুঁজতে থাকে। ওই সময় তিনি বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যান। আবার তাঁকে বিনা-বিচারে আটক রাজবন্দি হিসেবে হিজলি জেলে আটক করে রাখা হয়। কেননা সন্তোষ মিত্রের দাপটে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট তখন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও প্রায় দিশেহারা।

## সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী

আগে না বলা একটা কথা এবার বলে যাই। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাস। সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনে অনার্স (Philosophy Honours) নিয়ে তৃতীয় বর্ষে (Third Year-এ) পড়ছেন। আর সন্তোষকুমার তখন ফার্স্ট ইয়ার আই. এ. (First Year I. A. শ্রেণীর ছাত্র। পুজোর ছুটির পর সেইদিনই কলেজ খুলেছে সকলেই ব্যস্ত পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতে। সেই সময় সন্তোষকে দেখিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—"অদূর ভবিষ্যতে ওই সন্তোষই হবে তরুণ বিপ্লবীদের নেতা।"

## ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর মাসের সেই কালো দিনটা

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর (৩০ ভাদ্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে) নির্জন ও শব্দহীন রাত্রিবেলা। হঠাৎ গুলির আওয়াজে চমকে উঠল হিজলির বন্দিশিবির। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিবেকহীন রক্ষী বাহিনী। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিনা-বিচারে আটক ও নিরস্ত্র রাজবন্দিদের ওপর। রক্ষীবাহিনী শুধু গুলিই চালায়নি। বেয়নেট চার্জও করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ১৪-১৫ জন রাজবন্দি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে দুজনের চেতনা আর ফিরে আসেনি। তাঁরা দুজন হলেন—দুই অমর শহিদ—সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত।

পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর এই মর্মান্তিক ঘটনার খবরটা কলকাতায় এসে পৌঁছোয়। সঙ্গে সঙ্গে খড়্গাপুরের পথে রওয়া হয়ে যান সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট অ্যাটর্নী রাজকুমার বসু (সন্তোষ কুমারের ভগ্নীপতি, মলিনা দেবীর স্বামী এবং হরিনাভির বিখ্যাত বসু পরিবারের সুযোগ্য সন্তান)। ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁদের হিজলি জেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, মরদেহ দুটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া তো দূরের কথা। অবশ্য ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মরদেহ দুটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর একটা স্পেশাল ট্রেনে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলেন।

শেষে এক বিশাল শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুই শহিদের মরদেহ নিয়ে শবযাত্রা সন্ধের মধ্যেই কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছে যায়। তারপর রাত্রি দশটার মধ্যে দুই অনন্য দেশপ্রেমিকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পরের দিন ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর দু-দিন ধরে কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল এইসব ধ্বনিতে—সন্তোষ মিত্র, তোমায় আমরা ভুলিনি-ভুলব না। তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, তোমায় আমরা ভুলিনি-ভুলব না। ভারত মাতাকি জয়—বন্দে মাতরম্।

**শোকসভা**

কদিন বাদে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে গড়ের মাঠে মনুমেন্টের তলায় এক বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে এসেছিলেন এবং ওই সভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি সেদিন বলেছিলেন—

"এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। মনের পক্ষেও উদ্‌ভ্রান্তিজনক। কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বর নরঘাতক নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।"

কবি আরও বলেছিলেন—"প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে। কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি? একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশি শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।"

তাছাড়াও হিজলির রাজবন্দিদের উদ্দেশে লিখে পাঠিয়েছিলেন—"যা কোন কিছুকেই আবদ্ধ থাকতে দেয় না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরে অবারিত হোক।"

মোট কথা, কবি এই অমানুষিক ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং ওই রাত্রেই তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশিত করতে 'প্রশ্ন' কবিতাটি লিখে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ—
তুমি কি বেসেছো ভালো?

সেদিনের সেই শোকসভায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত হয়ে দুই অনন্য বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিককে চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎ পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর), বিধানচন্দ্র রায়,

কিরণশঙ্কর রায়, বাগ্মী তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখেরা। বক্তারা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের নিন্দাই করেননি, বরং ওই দুই অসাধারণ শহিদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন 'ওঁদের পথ অনুসরণ করলে আজকের যুবশক্তি সেই পথের সন্ধান পাবেন যে পথে চলেই তাঁরাও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে পারবেন। প্রত্যেকের ভাষণে উচ্চারিত হয়েছিল আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের কী অসাধারণ অবদান। সেই কথাই তো সুকান্ত ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন তাঁর কবিতার এই পংক্তিগুলিতে—

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশির খুনে
গুলিবন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।

প্রথম কথাটা এবার বলে যাই। সন্তোষকুমারের রাজনীতিতে হাতেখড়ি Calcutta University Institute-এর সদস্য হওয়ার পর। এখানে তিনি পর পর কয়েক বার Under Secretary নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর তাঁর প্রথম কারাবরণ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ওই আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়।

পরবর্তী সময়ে আমাদের তদানীন্তন এগারো নম্বর ওয়ার্ডে (বর্তমানে কলকাতা পুরসভার পঞ্চাশ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত) অবস্থিত সেন্ট জেমস স্কোয়ার বা নেবুতলা পার্কের নামকরণ করা হয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।

১৯৫৬ সালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দুই অমর শহিদ—সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের সমাধিবেদি স্থাপিত হয়।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়া জমিতে সন্তোষকুমার মিত্রের এক আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৫৯-৬০ সালে হিজলির বন্দিশালাটি এক বিখ্যাত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নাম হয়েছে—Indian Institute of Technology (Kharagpur)। সংক্ষেপে I. I. T. (Kharagpur)। এখানেও দুই অমর শহিদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মর্মর ফলক স্থাপন করা হয়েছে।

## তথ্যসূত্র

১. বিশ্বনাথ নন্দী, *সন্তোষকুমারের জন্মশতবর্ষ*।
২. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, *কবি স্মরণে*।
৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
শ্রীযুক্ত রঞ্জন বসু, সি. এ.—সন্তোষকুমারের ভাগ্নে।
শ্রীমতী কল্যাণী বসু—ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা এবং সন্তোষ কুমারের ভাগ্নী।

ষোলো

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দধীচি শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাশ

আমি যুগে যুগে আসি। আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু,
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

যে বিপ্লবী বীব বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে সংযোজিত করে গেছেন এক নতুন অধ্যায়, যিনি বিপ্লবেব চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে যুক্ত করেছিলেন অগ্নিপরিশুদ্ধ আবেগ, লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ধীব অথচ নির্ভীক পদক্ষেপে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হওয়ার কালে যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—''আমি পলাশির প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই'', বিশ্ব ইতিহাসে যিনি বীর শহিদ ম্যাকসুইনির সমগোত্রীয় হিসেবে বন্দিত (আয়ারল্যান্ডের ম্যাকসুইনির ৭৬ দিন অনশনের পর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছিল), এই ত্যাগে শুভ্র ও বৈরাগ্যে গৈরিক বাংলা মায়ের দামাল ছেলেই তো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দধীচি—যতীন্দ্রনাথ দাশ।

## জন্ম ও পরিবার পরিচিতি

শ্রদ্ধেয় কিরণচন্দ্র দাশ আমায় নিজ মুখে যা বলেছিলেন তাই বলছি। যতীন দাশের জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে মামার বাড়িতে। তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই-বোন ছিলেন। তবে প্রথম সাত জন অকালেই প্রয়াত হন। জীবিত তিনজনের মধ্যে যতীন দাশ ছিলেন অষ্টম। একমাত্র বোন লাবণ্যপ্রভা ছিলেন নবম। আর কিরণচন্দ্র ছিলেন দশম। দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বীজ ছিল তাঁদের পরিবারের রক্তে। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাশ জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ স্বদেশি আন্দোলনের সময় ইংরেজের গোলামি করবেন না বলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান খুলে সংসার চালাতে গিয়ে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। চাকরি ছাড়ার পেছনের একটা অপমানজনক ঘটনার কথাও শ্রদ্ধেয় কিরণবাবু আমায় বলেছিলেন। ১৯০১ সালের দশহারার দিনে বঙ্কিমবাবু সপরিবারে গঙ্গাস্নান করে একটা ফিটন গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে (রেড রোডে) কয়েকটি ব্রিটিশ টমি তাঁদের জোর করে ওই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়িটি চেপে চলে যায়। বঙ্কিমবাবুকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হল। ওই দিনই উনি শপথ নেন সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।

১৯২১ সালে যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে আই. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম ডিভিশান পান। তারপর

১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ার বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান। কিন্তু উত্তরোত্তর রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ায় ফাইনাল বি.এ. পরীক্ষায় বসার সুযোগই হয় না। তবে বঙ্গবাসীর ছাত্রদরদি অধ্যক্ষ আচার্য গিরীশচন্দ্র বসু যতীনকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রতি বছরই তাকে কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে রাখতেন (১৯২৩ থেকে ১৯২৮)। কারণ সেই সময় ভর্তির ব্যপারে কলেজের অধ্যক্ষদের দারুণ স্বাধীনতা ছিল। যখন যতীন কলেজে উপস্থিত থাকতেন তখুনি কলেজ-জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে যেতেন। কলেজ ফুটবল টিমের হয়ে নিয়মিত খেলতেন। কলেজ টিম খেলায় জিতলে অথবা তিনি নিজে গোল করতে পারলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য এক এক বোতল Vimto-র (তখনকার দিনের Thums up বা Limca) জন্য বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের কাছে আব্দার করতেন। ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এমনি ভোজনবিলাসী মানুষ ছিলেন যে পকেটে পয়সা থাকলে বন্ধুদের নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকতেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এমন এক ভোজনবিলাসী মানুষকেও মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরণ অনশনের পথই বেছে নিতে হয়েছিল কোন্ মন্ত্র বলে? তা হল 'দেশপ্রেম' যা বিপ্লবীকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দেয় না যে, "সবার আগে দেশের স্বাধীনতা—তারপর অন্য কথা।" বঙ্গবাসী কলেজের ম্যাগাজিন ও অন্যান্য নথিপত্রে দেখা যায় যে বাবা—বঙ্কিমবিহারী দাশ ও তাঁর দুই পুত্র—যতীন্দ্রনাথ দাশ ও কিরণচন্দ্র দাশ—তিনজনেই ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজেরই ছাত্র।

## কিশোর বিপ্লবী

কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯-২০ সালে মাত্র ১৫-১৬ বছর বয়সে একটা বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। কিন্তু জেলে তাঁকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়ায় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শেষপর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করায় বাবা (বঙ্কিমবাবু) যতীনকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তিনিও দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস অফিসে আশ্রয় নেন। আবার বাবার কথায় কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরেও আসেন। এই সময় দেবেন বসু নামে এক দক্ষ বিপ্লবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। দেবেন বসুই শচীন সান্যালের সঙ্গে যতীন দাশের ঘনিষ্ঠতা করে দেন। এই সময় যতীনের ছদ্মনাম হয়—'রবিন'। আর কিছুদিন গেলে যতীন দাশ আর একটু সিনিয়র হলে তাঁর দ্বিতীয় ছদ্মনাম হয় 'কালীবাবু'। শচীন সান্যাল সিনিয়র ও জুনিয়র সব বিপ্লবীদের নিয়ে বোমা বানানোর ট্রেনিং ক্লাস শুরু করেন। তাতে যতীন

সবচেয়ে সফল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। ঠিক হয় কলকাতায় বোমা বানানোর প্রধান কারখানা খোলা হবে। তারপর প্রয়োজন মতো দেশের সব প্রান্তে বোমা বানানোর কারিগরদের পাঠানো হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় বোমা বানানোর একটা গোপন কারখানা স্থাপন করা হয়।

## বোমার দোকান ও H.S.R.A.

১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল ভারতের সব প্রান্তের বিপ্লবীদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যার নাম দেন—Hındusthan Socialist Republican Association (প্রথমে নাম ছিল Army, পরে বদল করে নাম করা হয় Association)। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পিস্তলের সমস্যা মেটাতে খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে যতীনের সক্রিয়তায় এবং বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র, দেওঘরের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন লাহিড়ী, পাঞ্জাবের ইন্দার সিং নারায়ণ ইত্যাদি উগ্রবাদী বন্ধুদের সহায়তায় একটি পিস্তল ও বোমার গোপন দোকান গড়ে ওঠে। টাকার অভাব মেটাতে টালিগঞ্জ রোডের দক্ষিণে Indo-Burma Petroleum নামে পেট্রল স্টেশনের টাকা ব্যাংকে জমা দিতে পাঠানো হলে সেই টাকা ডাকাতি করে নেওয়া হয়। কিন্তু ১৯২৪-এর ৯ অগাস্ট বিখ্যাত কাকোরি রেল স্টেশনের ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ ইন্দুভূষণ মিত্র ও বেনারসীলাল রাজসাক্ষী হয়ে যাওয়ায় পুলিশ আগে থেকেই সব কিছু জেনে ফেলে।

## দক্ষিণেশ্বরের গোপন কারখানা

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় যতীন বোমা তৈরির উন্নত প্রণালী শেখাতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ট্রেনিং দিতেন। কারণ তখন যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন বোমা তৈরির দক্ষ কারিগর। উদ্দেশ্য একটি কেন্দ্রীয় অস্ত্র ও বোমা সরবরাহ কেন্দ্র গড়ে তোলা—সেখান থেকে সব প্রান্তের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা সরবরাহ করা যায়। ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ওই সময় বাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পুলিশ গিরীশ মুখার্জী রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে (যতীন্দ্রনাথকে) গ্রেপ্তার করে। একটা মজার ব্যাপার হল সাক্ষীরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ শাসকরা Bengal Ordinance প্রয়োগ করে তাঁকে আটক করে রাখে। মেদিনীপুরের এক condemned cell-এ তাঁকে রাখা হয়। ওই সময় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন জেল-ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে ময়মনসিং জেলে পাঠানো হয়। এখানে স্বদেশি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলতে দেখে তিনি জেল-সুপারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে দেন। অবশেষে গোয়েন্দা বিভাগের D.I.G. লোম্যানের হস্তক্ষেপে একুশ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ হয়। তারপরই তাঁকে পাঞ্জাবের মরু-অঞ্চলের দুর্গম ও ভয়াবহ মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৮

সালের অগাস্ট মাসে যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক ওই সময়েই তাঁর একমাত্র ভগ্নী লাবণ্যপ্রভাদেবীরও মৃত্যু হয়।

১৯২২-২৫ এই সময়টায় জাতীয় কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় আর ঠিক এই সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। আবার ওই সময়েই যতীন দাশ শৃঙ্খলপরায়ণ কর্মী ও মানুষ হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। উন্নতমানের বোমা তৈরি, দল সংগঠন, পিস্তল ছোড়ায় এবং সামরিক কায়দায় দলের সদস্যদের পরিচালনায় তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪-তম অধিবেশনের সময় ও তারপর যতীন দাশ Bengal Volunteers কোরে উল্লেখযোগ্য গ্রহণ করেছিলেন। ওই সংগঠনে যতীন ছিলেন Major। শোনা যায় যে ওই সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। প্রত্যেককে সামরিক পদ্ধতিতে ড্রিল, মার্চ পাস্ট, অভিবাদন ইত্যাদি করানো হত। আর এই ব্যাপারে যতীন দাশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি সে সময়ে South Calcutta National School-এর অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ছাত্রদের ড্রিল (Drill) শেখাতেন। কথাগুলি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যতীন দাশ সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁর *Indian Struggle* বইটিতে।

১৯২২-২৩ অর্থাৎ দেশবন্ধুর সময়ে বিপ্লবীদের কংগ্রেসের ভেতর থেকে কাজ করার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ১৯২৮ থেকে অর্থাৎ সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দেখা দেয়। জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী সদস্যদের অবস্থান শক্ত করতে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন দাশ সুভাষচন্দ্রের পথই শ্রেষ্ঠ পথ বিবেচনা করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকেই সমর্থন জানান। তাছাড়াও ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের চুয়াল্লিশতম অধিবেশনে সভাপতি বরণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর (Major) হিসেবে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন যতীন।

## যতীন দাশ ও ভগৎ সিং

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন। এই সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাবে হিন্দ নওজোয়ান সভা নামে একটি বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফল হিসেবেই পুলিশি নির্যাতন ও লাঠিচার্জ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। ফলে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় নিহত হন। পাঞ্জাব কেশরীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান মি. স্কটের সহকারী মি. সন্ডার্সকে হত্যা করে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে মেস খুঁজে বের করে যতীন

দাশের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর তাঁকে (যতীনকে) অনুরোধ করেন ভগৎ সিং-এর নওজোয়ান সভার জন্য যেন কিছু করেন। ভগৎ সিং-এর কথায় ও আগ্রহে খুশি হয়ে যতীন দাশ বলেন—"বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমার যা কবণীয় ও দেবার তা আমি উজাড় করে দিয়েছি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পায়ে। তবে তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্যও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে। তা হল আগ্রায় গিয়ে তোমার দলের ছেলেদেরও বোমা বানানোতে অত্যন্ত দক্ষ করে দিয়ে আসতে হবে।" কথাবার্তায় দুজনেই বেশ খুশি হন এবং সে রাত্রে ভগৎ সিং যতীন দাশের দক্ষিণ কলকাতার মেসে রাত্রিবাস করেন। এর কিছুদিন পরে যতীন দাশ আগ্রায় গিয়ে ভগৎ সিং-এর দলের ছেলেদের বোমা বানানোর কাজে ভালো রকম ট্রেনিং দিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদের আসনের পাশেই হঠাৎ একটি শক্তিশালী বোমা ফাটান ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে তাঁরা দুজনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে ভারতব্যাপী এক বিশাল পরিকল্পনা আছে সন্দেহ করে তদানীন্তন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মি. প্যাট্রি (Mr. Pattry) নিজে পুনরায় তদন্ত শুরু করেন। এর ফলে ত্রিশটি নামের একটি তালিকা বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন দাশ। কালবিলম্ব না করে Lahore Conspiracy Case-এর অন্যতম অভিযুক্ত আসামি হিসেবে কলকাতাব প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যতীন দাশকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৪ জুন ১৯২৯ তারিখে। এক্ষেত্রে তাঁকে ধরিয়ে দেয় ফণী ঘোষ নামে ভগৎ সিং-এর দলের প্রাক্তন এক সদস্য যিনি যতীন দাশের কাছে বোমা বানানো শিখতে আগ্রায় গিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের বোরস্টাল জেলে যতীন দাশকে কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ তখুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে এবং ভগৎ সিংকে পাঞ্জাবের ভয়াবহ মরু-কারাগার মিয়ানওয়ালি জেলে বন্দি করে রাখা হল।

২৫ জুন তারিখে যতীন ও তাঁর ১৫ জন সহযোদ্ধাকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। ওই সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—অজয়কুমার ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, কৃষ্ণকুমার, রাজগুরু প্রমুখেরা। বটুকেশ্বর দত্তকে আগেই লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন বিখ্যাত হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। বলা-বাহুল্য, বিশ ও ত্রিশের দশকে ওই H.S.R.A. অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে ব্রিটিশ শাসকদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে ভগৎ সিংকেও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয় পয়লা জুলাই ১৯২৯ সালে।

ঠিক পরের দিনই দোসরা জুলাই যতীন গোপনে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, এখানে তাঁদের ওপর যে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে তাঁরা ১৬ জন সমবেতভাবে অনশন (Group Hunger Strike) শুরু

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেননা, গত বছর (১৯২৮) সেপ্টেম্বর মাসে দলের বার্ষিক গোপন অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ভবিষ্যতে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে দলের বন্দি সদস্যরা সমবেতভাবে অনশন করতে পারবেন। শোনামাত্র বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং ওই সমবেত অনশনে সামিল হবার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। শেষপর্যন্ত ৬ জুলাই আর এক দফা গোপন বৈঠকের পর ১৩ জুলাই থেকে সমবেত অনশন (Group Hunger Strike) শুরু করার সিদ্ধান্ত পাকা-পাকিভাবে গৃহীত হয় এবং ওই দিনই বড়োলাট লর্ড আরউইনকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

১৩ জুলাই, ১৯২৯ (রবিবার) থেকে সমবেত অনশন (Group Hunger Strike) যথারীতি শুরু হয়। ওই অনশন আরম্ভ করার ঠিক দু-এক দিন আগে যতীন তাঁর সহ-যোদ্ধাদের অঙ্গীকার করিয়ে নেন যে, তাঁদের দাবিগুলোর যথাযথ মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁরা অবশ্যই অনশন ভঙ্গ করবেন। তবে যতীন্দ্রনাথ করবেন না। কেননা, তাঁর পক্ষে এই অনশনই হবে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ। ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে। তা হল পলাশির প্রান্তরে বাঙালি মিরজাফরকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করা। সহযোদ্ধাদের তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশের অনুমতি আগেই তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

১৩/৭/১৯২৯ থেকে ১৯/৭/১৯২৯—সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আট দিনের দিন (২০ জুলাই তারিখে) ভোরবেলা জেল-সুপার জেল-ডাক্তার ও আটজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে যতীনের সেলে প্রবেশ করলেন। তারপর কোন রকম সংকেত না দিয়েই ওই আটজন পাঠান একই সঙ্গে আট দিন অভুক্ত ও বিশেষ দুর্বল যতীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যতীন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দুজন পাঠান তখন যতীনের বুকের ওপর চেপে বসে, আর অন্য ছয়জন চার পাশ থেকে যতীনকে জাপটে ধরে রাখে। ওই সুযোগে ডাক্তার একটা সরু নল যতীনের নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুধ ঢালতে শুরু করে দেন। আর কোনো উপায় না দেখে যতীন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে জোরে জোরে কাশতে থাকেন। ফলে ওই নলটির মুখ খাদ্যনালী থেকে সরে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুটা দুধও যতীনের ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডাক্তার কোন কিছু চিন্তা না করেই সেই মুহূর্তে একটা মোটা নল যতীনের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুধ ঢালতে গিয়ে লক্ষ করেন যে যতীনের মুখ থেকে স্রোতের মতো রক্ত বেরিয়ে আসছে। তখন ভয় পেয়ে তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর ডাক্তার ও জেল-সুপার ওই আটজন পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

৪৮ ঘণ্টা পরে (২২ জুলাই, ১৯২৯) যতীনের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলতেই তিনি লক্ষ করেন যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য তাঁর সেল-ভরতি ঘরে নানা ধরনের খাবার

সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরও বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাছাড়াও লক্ষ করলেন যে তাঁর পাশে রাখা হয়েছে সদ্য কেনা একটা শ্লেট ও একটা পেন্সিল। বুঝতে বাকি রইল না যে জীবনে আর কথা কইতে পারবেন না বলেই এখন থেকে সব কিছু ওই শ্লেটে লিখে জানাতে হবে। ওই দিনই সন্ধেবেলা (২২/৭/১৯২৯) ছোটোভাই কিরণ দাশও এসে হাজির। বলাবাহুল্য, যতীনের ওই সঙ্গিন অবস্থা উপলব্ধি করে স্বয়ং বড়োলাট লর্ড আরউইন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে যতীনকে দেখা-শোনা করার জন্যই কিরণ দাশকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং ৬৩ দিনের ওই ঐতিহাসিক অনশনের ৫৩ দিনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে রইলেন স্বয়ং ছোটো ভাই কিরণ দাশ। আর আমার এই প্রতিবেদন কিরণ চন্দ্রেরই ডায়েরির সংক্ষিপ্ত অনুলিপি মাত্র।

জুলাই শেষ, অগাস্টেরও একটা সপ্তাহ অতিক্রান্ত। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ প্রতিবাদে মুখর ও উত্তাল। ৭-ই অগাস্ট জাতীয় কংগ্রেস মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করল। তাছাড়াও জওহরলাল নেহরু যাতে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ওই ১৮ জন অনশনকারী দেশপ্রেমিকদের স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন তার জন্যও অনুমতি চাওয়া হয়।

অনুমতি পেয়ে জওহরলাল নেহরু স্বয়ং ১০ অগাস্ট লাহোর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ১৮ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসেন। নেহরুজির আত্মজীবনীতে লেখা আছে যে, ওই একমাসের অনশনে সকলেই অত্যন্ত দুর্বল এবং কেউ কেউ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর (নেহরুজির) পক্ষে তাঁদের (অনশনকারী) সঙ্গে বিশেষ আলাপ-আলোচনার তেমন সুযোগ হয়নি। তবে তারই মধ্যে তিনি যতীন দাশের ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১১ অগাস্ট (১৯২৯) বড়োলাট লর্ড আরউইন এক বিশেষ জরুরি ঘোষণায় অনশনকারীদের দাবিদাওয়া সব মেনে নিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে জেল অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ১২ অগাস্ট (৩১ দিনের দিন) যতীনের ১৭ জন সহ-যোদ্ধা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তে-রাঙা অধ্যায়। পরাধীন ভারতের নবীন-দধীচি যতীনের নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলার ইতিহাস। যতীন্দ্রনাথ একাই চালিয়ে যান পলাশির প্রান্তরে মিরজাফরকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এ যেন অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় তো বটেই। চলতে লাগল তাঁর একার অনশন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। কবির ভাষায়—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।

অগাস্টও যায় যায়। শরীর সব দিক থেকেই ভেঙে পড়েছে—পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন যতীন একটু একটু করে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আগুনটা ঠিকই জ্বলছে—"মিরজাফরের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে"—"ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ"।

প্রতিদিন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন—রিপোর্ট লিখে রাখেন। শিয়রে বসে ছোটোভাই কিরণ দাশ সব কিছু লক্ষ করেন আর নিজের ডায়রিতে টুকে রাখেন। তাঁর তো কিছু করার নেই। কারণ প্রথম দিন থেকেই তো কিরণের হাত-পা বাঁধা। কেননা প্রথম দিনই কিরণ বড়ো ভাইয়ের সেলে প্রবেশ করা মাত্রই যতীন ছোটো ভাইকে গীতা হাতে শপথ করিয়ে নেন যে, যতীন অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেও যেন কিরণচন্দ্র ভুলেও যতীনকে এক ফোঁটা জলও দিয়ে না বসেন।

৪৩ দিনের দিন (২৪ অগাস্ট) যতীনের ডান চোখটা (Right Eye) কেমন যেন গলে গেল। ৪৮ দিনের দিন (২৯ অগাস্ট) বাঁ-চোখটাও (Left Eye), আগেই তো আটদিনের দিন (২০/৭/২৯) জেল ডাক্তার নল দিয়ে জোর করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে যতীনের কথা বলার ক্ষমতা চিরদিনের মতো নষ্ট করে দিয়েছেন।

৫০ দিনের দিন (৩১ অগাস্ট) দেখা গেল যে, পক্ষাঘাত তাঁর সমস্ত শরীর গ্রাস করে ফেলেছে। যখন ওই পক্ষাঘাত যতীনের হৃৎযন্ত্রকে স্পর্শ করবে তখুনি তাঁর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এতো দিনে টনক নড়ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু তবুও শাসকরা যতীন্দ্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে রাজি নয়। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ ও ছোটো ভাই কিরণচন্দ্র ঘৃণাভরে জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর এক সর্বজননিন্দিত গুপ্তচরের জামিনে যতীনকে মুক্ত করা হয় পঞ্চান্ন দিনের দিন (৫/৯/২৯)। পরের দিন (৬/৯/২৯) একেবারে কাক-ভোরে ডাক্তার ও জেল-সুপার অ্যাম্বুলেন্স ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে জেলে প্রবেশ করে দেখেন যে যতীনের সহ-যোদ্ধারা তার সেলের চারপাশে ব্যারিকেড রচনা করে পথ অবরোধ করে শুয়ে আছে। তখন ডাক্তার জেল-সুপারকে বোঝান যে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই। কেননা জোর করে যতীনকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার চেষ্টা করলেই উত্তেজনায় যতীনের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

পরের সাতদিন (৭/৯/২৯ থেকে ১৩/৯/২৯) হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা—শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে ঠিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে অমর বিপ্লবী যতীন দাশ চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যতীন্দ্রনাথের আত্মাহুতির কথা শোনামাত্র গোটা দেশের মানুষ অপার শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিল। ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক নতুন ধারা সংযোজিত হল। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল 'যতীন্দ্রনাথ দাশ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। কোটি কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হল—হে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তোমায় শতকোটি প্রণাম। আরও উচ্চারিত হল কবির অমর বাণী—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

লাহোর থেকে যতীনের মরদেহ হাওড়া পৌঁছতে তিন-দিন লেগেছিল। কারণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই শ্রদ্ধাবনত দেশবাসী ট্রেন থামিয়ে ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। শবাধার গ্রহণ করতে হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন—সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও শ্রীমতী কমলা নেহরু প্রমুখেরা। সরকারি হিসেবেই পাঁচ লক্ষ মানুষ হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন। খবরটা শোনামাত্র ক্ষোভে ও দুঃখে মর্মাহত কবি রাত্রি জেগেই লিখে ফেলেছিলেন—

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহো।

পরের দিন পিতা—বঙ্কিমবিহারী দাশ একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের ম্যাকসুইনি পরিবারের কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল—"We are proud of your son Jatındra Nath. India would now be free"।

## সতেরো

# অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ছোট্ট ৫-৬ বছর বয়সের একটি মেয়ে দাদার পড়ার ঘরের দরজার পাশে হাতে একটা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাদাকে পড়িয়ে যেই মাস্টারমশাই ঘরের বাইরে পা দিয়েছেন অমনি তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল মেয়েটি। তারপর মেয়েটি বলল—"আমায় একটু পড়িয়ে দেবেন মাস্টারমশাই। আমার পড়ার কথা কেউ ভাবে না—কোন ব্যবস্থাও নেই।" বাচ্চা মেয়েটির মুখে-চোখে আগ্রহের আলো লক্ষ করে মাস্টারমশাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন—"হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই পড়াব তোমাকে। তোমাকে পড়াব না তো আর কাকে পড়াব?" মাস্টারমশাই তখুনি পড়াতে বসে গেলেন মেয়েটিকে।

সময়টা ছিল তখন ১৯১৬ সালের কোন একটা দিন। ঘটনাটি ঘটেছিল চট্টগ্রাম শহরে। আর ওই ছোটো মেয়েটির ডাক নাম ছিল রানি, ভালো নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন চল ছিল না, কিন্তু ছোট্ট রানি লেখাপড়া শিখবেই। শেষপর্যন্ত তার ইচ্ছেরই জয় হয়েছিল। মায়ের চেষ্টায় সাত বছর বয়সে (১৯১৮ সালে) চট্টগ্রাম খাস্তগীর গার্লস স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, আর ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেধাবী ছাত্রী হিসেবে সকলেরই মন জয় করে নিয়েছিল।

প্রীতিলতার জন্ম হয়েছিল ১৯১১ সালে। বাবার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। মায়ের নাম প্রতিভাময়ী দেবী। চট্টগ্রাম খাস্তগীর গার্লস স্কুলের মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল ১৯২৯ সালে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশন পেয়ে ১৯৩১ সালে বি. এ. পাশ করেন, বেথুন কলেজের ছাত্রী হিসেবে।

১৯২৯ সালে বেথুন কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই অর্থাৎ কিনা কলেজ জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই তাঁর একটা নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩০ সালে জালালাবাদের মুক্তি যুদ্ধ তাঁর জীবনে ও মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বাস্তবিকই মাস্টারদা সূর্য সেন প্রীতিলতার মনে দেশপ্রেমের এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে দেন। ১৯৩২ সালেই তিনি কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসার আগেই মাস্টারদা প্রীতিলতাকে নির্দেশ পাঠাতেন আর প্রীতিলতাও সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। প্রীতির মনে পড়ে মাস্টারদার নির্দেশেই কলকাতায় থাকাকালীন সে প্রতিদিন আলিপুর জেলে বন্দি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে আসত। সকলে জানত প্রীতি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছোটো বোন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও গিয়েছিল। গিয়ে জানতে পারল সেইদিনই ভোর চারটের সময় রামকৃষ্ণের ফাঁসি হয়ে গেছে। উঃ, কী যন্ত্রণা। বুকভরা কান্না নিয়ে সেইদিনই সে শপথ নিয়েছিল

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে সেও মাস্টারদার পথেই চলবে। ওই দিনই সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারল ইংরেজ সোজা জাত নয় যে এদেশের এত সম্পদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাবে তারা। তাই জোর করে, সশস্ত্র বিপ্লব আর বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজদের মেরে ধরে এদেশ ছাড়া করে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞা নিল সে সেই দিনই। সে সেই দিনই মর্মে মর্মে বুঝল যে স্বাধীনতা কখনও ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। তার জন্য দিতে হয় উপযুক্ত মূল্য। সে মূল্য রক্তের। তাই তো কবি লিখেছেন—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা,
রিক্ত হাতে চাসনে তারে,
সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে,
রত্নমাল্য আনবি যবে, মাল্য বদল তখন হবে,
পাতবি কি তুই দেবীর আসন, শূন্য ধূলায় পথের ধারে?

না-না। ইংরেজ শাসনের পৈশাচিক রূপ দেখে প্রীতির মতন মেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। সে চুপ করে থাকেওনি। ঢাকায় আই. এ. পড়ার সময় থেকেই বিপ্লবীদের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে দিল। আর কলকাতায় বি. এ. পড়ার সময় থেকেই আরও গভীরভাবে বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর মাস্টারদার নির্দেশেই ১৯৩২-এর গোড়ার দিকে চট্টগ্রামের নন্দনকানন গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল কলকাতার সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ আরও নিবিড় ও দৃঢ় করা।

চট্টগ্রামে ফিরে আসার পর ১৯৩২-এর গোড়ার দিকে একদিন সন্ধেবেলায় প্রীতি পড়ার ঘরে বসে কী যেন লেখা-লেখি করছিল। এমন সময় একটি মেয়ে এসে বলল—প্রীতি, তুমি কি মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে চাও? শুনে প্রীতি মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। আর বলল, কোথায় তিনি? কোথায় দেখা পাব? সব কথা খুলে বলো আমায় কল্পনাদি (মাস্টারদার আর এক বিপ্লবী শিষ্যা—পরবর্তীকালে পি.সি. যোশীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে কল্পনা যোশী)।

ব্যস্ত হতে হবে না। এখুনি দেখা পাবে। পুরুষের পোশাক আছে তোমার? তবে এখুনি তৈরি হয়ে নাও।

বিপ্লব-গুরু সূর্য সেন। সব বিপ্লবীর গুরু—গুরুর গুরু—মাস্টারদা। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন। কী সৌভাগ্য আমার! প্রীতি তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। প্রথমেই তো তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করব। কিন্তু তারপর কী কথা বলব তাঁর সঙ্গে। তিনিই বা কী কথা বলবেন? প্রীতি এখনও পর্যন্ত মাস্টারদাকে দেখেইনি। স্মৃতির পটে কত ছবি ভেসে ওঠে—মনে পড়ে যায় কত কথা। মনে পড়ে যায় কলকাতায় থাকাকালীন মাস্টারদার নির্দেশেই সে প্রতিদিন আলিপুর জেলে যেত বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে দেখতে।

প্রীতি তৈরি হয়ে যাবার পর দোতলায় উঠে গিয়ে তার মাকে বলল—মা, আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি যাচ্ছি। কাল ফিরে আসব। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে দুই বন্ধু—কল্পনা ও প্রীতি বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাত দশটার সময় দুই বন্ধু ধলঘাট গ্রামে পৌঁছে গেল। গ্রামের একধারে বাগান-ঘেরা একটা ছোট্ট বাড়ি। খুব সন্তর্পণে ওরা দুজনে সেই বাড়িটাতেই ঢুকে পড়ল। একজন মহিলা বেরিয়ে এসে ওদের দুজনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ইনিই সাবিত্রীদেবী—সকলের মাসিমা। নবীন চক্রবর্তীর স্ত্রী। সাবিত্রিদেবী ও তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণ প্রীতি ও কল্পনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেন। তারপর ওপর থেকে ডাক এল, ওপরের ঘরে গিয়ে প্রীতি যেন আর দাঁড়াতেই পারছেনা, সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। সামনেই মাস্টারদা সূর্য সেন। অল্প আলোয় তাঁর মুক্তোর মতন দাঁতগুলোই দেখা যাচ্ছিল। তিনি অল্প অল্প হাসছিলেন। প্রীতি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। মাস্টারদা ওকে তুলে ধরে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—কী দেখা হল তো? তোমার মতো সোনার মেয়েকে কি দেখা না দিয়ে থাকতে পারা যায়? প্রীতি দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথরের মূর্তি। কিন্তু সেই পাথরের মূর্তির ভেতর থেকে উছলে পড়ছে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা ও হাসির ফল্গুধারা। আলাপ-আলোচনা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ওই ছোট্ট বাড়িতেই মাস্টারদার ছায়ার মতন রয়েছেন চট্টগ্রামের দুই খ্যাতিমান বিপ্লবী—নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন।

মাস্টারদা বললেন—মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু খুব সন্তর্পণে। কেননা কাছেই রয়েছে ধলঘাটের মিলিটারি ক্যাম্প। সেই থেকে প্রীতি প্রায় প্রতিদিনই আসে সন্ধেবেলা অন্ধকার নেমে আসার পর। আর মনে মনে অবাক হয়ে ভাবে সাবিত্রীদেবীর কী অসামান্য সাহস। ওই ছোট্ট বাড়িটিতে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন কী করে অতগুলি বিপ্লবীকে। এর চেয়ে যে ঘরে আগুন রাখা অনেক সহজ ব্যাপার।

## ১৯৩২ সালের ১২ জুন

সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৩২ সালের ১২ জুন। সন্ধে নামতেই প্রীতি গেছে ধলঘাটে গোপন এক বৈঠকে যোগ দিতে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সকলে খেতে বসেছে। তখন সবেমাত্র রাত্রি আটটা বেজেছে। সকলকে খাবার পরিবেশন করে দিয়ে প্রীতি নিজেও খেতে বসে গেছে। এমন সময় বাইরে কীসের যেন শব্দ পাওয়া গেল। অপূর্ব উঠে এসে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—পুলিশ আর মিলিটারিতে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। ফিরে এসে সে মাস্টারদাকে বলল খাওয়া শেষ করা যাবে না—উঠে পড়ুন সকলে এখনই গা-ঢাকা দিতে হবে।

তা শুনে মাস্টারদা তখুনি নির্দেশ দিলেন চল সবাই প্রথমে ওপরে উঠে যাই। খাবার-দাবার ফেলে সকলেই ওপরে উঠে গেলেন, হাতে সকলেরই পিস্তল।

পুলিশ দলের নেতা ক্যাপ্টেন ক্যামেরন চিৎকার করে বলছেন—"বাড়িটে কোন্ হায়—দরওয়াজা খোল—জলদি খোল।" বাড়ির ভেতর থেকে কোনো শব্দই নেই। দুমদাম লাথি পড়তে লাগল। শেষে দরজাটাই ভেঙে পড়ল। ক্যামেরন ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে সিঁড়িটার দিকে তাঁর নজর পড়ল। উনি তখুনি তরতর করে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ক্যামেরন তখনো পর্যন্ত বাংলার বিপ্লবীদের ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেননি। দোতলায় উঠে একটু মুখ বাড়াতেই ওপর থেকে নির্মল সেনের পিস্তলের গর্জন। 'মাই লর্ড' ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলারই সুযোগ পেলেন না ক্যামেরন সাহেব। ঠিক মাথায় গুলি লাগায় গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলেন। —একেবারে নিথর-নিশ্চল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তবে আব দেরি নয়—এবার পালাতেই হবে। এবার মাস্টারদা বললেন, ওবা কোন্ দিকটায় সংখ্যায় বেশি লক্ষ করেছ কি কেউ! দাঁড়ান, দেখে আসি, ওরা কোন্ দিকটায় সংখ্যায় বেশি। দেখার জন্য নির্মল সেন বারান্দার টিনে উঠতেই টিনের শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি এসে নির্মল সেনকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। চোখের জল মুছতে মুছতে মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা নীচে নেমে এলেন। খিড়কির দরজা দিয়ে আর বাড়ির পেছনের গড়টা পেরিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে তাঁরা সব এগিয়ে চললেন। জঙ্গলের ভেতর শব্দ শুনে সৈন্যরা আবার এক ঝাঁক গুড়ি ছুড়ল। বীর বিপ্লবী অপূর্ব সেন পড়ে গেলেন। ধুঁকতে ধুঁকতে অপূর্ব বললেন—মাস্টারদা আপনারা চলে যান। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়ে যাব। মাস্টারদা কাঁদতে কাঁদতে প্রীতিকে নিয়ে ব্রিটিশ বেষ্টনী ভেদ করে সেই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

## ১৩ জুন, ১৯৩২ সাল

পরের দিন (১৩ জুন) প্রীতি নিজের বাড়িতে বসে আছে, এমন সময় কানে এল পুলিশের বুটের আওয়াজ। তারপর প্রীতিদের বাড়ি তল্লাশি চলল ঘণ্টাখানেকের ওপর। অবশ্য কিছুই পাওয়া গেল না। খবর ছিল ধলঘাটে পুলিশ কিছু কাগজপত্র পেয়েছে। তাই এই তল্লাশি। কেননা ওই কাগজপত্রের মধ্যে কিছু প্রীতির নিজের হাতের লেখা কাগজও ছিল। ১৩ জুনের পর প্রীতিদের বাড়িতে আরও দু'এক দিন পুলিশের হামলা হয়েছিল।

কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন একটা ভিখারি ভিক্ষে নেবার ছলে এক টুকরো কাগজ প্রীতির হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। প্রীতি দরজা বন্ধ করে তখুনি চিঠিটা পড়ে ফেলল। মাস্টারদা লিখেছেন—"আত্মগোপন করো। পুলিশের নজর পড়েছে। না করলে কাজের ক্ষতি হবে। ওই ভিখারি তোমায় পথ দেখিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" ওই কাগজটা পড়ে প্রীতি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপরই গুন গুন করে গাইতে শুরু করে দিল—

শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।

সেদিন রাত্রেই প্রীতি মাস্টারদার কাছে চলে গেল। তারপর গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে মাস্টারদার সঙ্গে আত্মগোপন করার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে আত্মগোপন করে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসকদের বেশ নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ফলে ইংরেজ শাসকরাও খ্যাপা কুকুরের মতো অত্যাচার অনেক বাড়িয়ে দিল। একদিন ঘোষণাই বেরোল—''সূর্য সেনকে যে কেউ মৃত বা জীবিত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারবে তাকেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর প্রীতিলতাকে যে কেউ ধরিয়ে দিতে পারবে পাঁচ শো টাকা পুরস্কার তারও পাওনা হবে।''

কিন্তু শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেই বা কতদিন ভালো লাগে। প্রীতিলতা তাই একদিন মাস্টারদাকে ধরে বসল। ''মাস্টারদা একটা অনুরোধ করার অনুমতি দেবেন কি? আর সহ্য হয় না। আর ধৈর্য নেই আমার। একটা কাজ দিন আমায়। একটা ভয়ংকর কাজের দায়িত্ব দিন আমায়।'' ''তোমার মনে ঠিক এই অবস্থাটা আসার জন্যই আমি এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। এইবার তুমি কাজ পাবে।'' এ বড়ো ভয়ংকর কাজ—অত্যন্ত কঠিন। যে কাজে বিপ্লবীকে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন হয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

কী কাজ মাস্টারদা? আর সকলে পারবে যে কাজ আমি পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব।

আবেগের বশে বলছ না তো? পারবে তুমি সব রকম পীড়ন ও অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে?

হ্যাঁ পারব। আমার হাতে পিন ফুটিয়ে দিয়ে দেখুন—একবার দেখুন—আমার মুখ দিয়ে কিছুমাত্র শব্দ বের হয় কি না?

বেশ পরশু রাতে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে জালিয়ানাবাগের প্রতিশোধ নিতে হবে। ইংরেজ মেরে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে আসতে হবে। আর এই আক্রমণের নেতৃত্বে থাকবে তুমি। তোমার প্রথম বিপ্লবী কর্মে তুমিই হবে কমান্ডার—ভারতের প্রথম মহিলা কমান্ডার। পারবে তো? কোনরকম ভয় হচ্ছে না তো? মাস্টারদা একটু হাসলেন। আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয় পারব—এই কথা বলে প্রীতি মাস্টারদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রীতির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মাস্টারদা জানালেন আজ রাতে তাঁর কাছে কয়েকজন নাম করা বিপ্লবী আসবেন। তাদের সঙ্গে বসে তোমাকে কমান্ডার হিসেবে গুলি-গোলা, পিস্তল-রিভলভার, বোমা-বন্দুক ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সব কিছু নিখুঁত আছে কিনা বুঝে নিতে হবে।

গভীর রাতে মাস্টারদার ঘরে এসে হাজির হলেন ১২ জন অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া বিপ্লবী। আসামাত্র তাঁরা বৈঠকে বসে গেলেন। মাস্টারদা সব কিছু প্রীতি ও ওই ১২ জনকে নিজের হাতে করে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কেমন করে আক্রমণ করতে হবে। কে কোন্ দিক দিয়ে যাবে। সংকেত কী হবে? ছক এঁকে এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বোমা,

বন্দুক, গোলা-গুলি ও রিভলভার সব কিছু নিজে হাতে পরীক্ষা করে সকলকে দেখিয়ে দিলেন মাস্টারদা। প্রীতির কোমরের দুপাশে দুটো রিভলভার ঝুলবে। আর সকলের কাছে থাকবে বিভলভার, রাইফেল ও বোমা। প্রীতির দুটো হাতে থাকবে দুটো হাত-বোমা। অন্যান্যদের কাছে থাকবে বিভলভার, রাইফেল ও বাড়তি কার্তুজ।

কাল রাতে ২৩ তারিখে আবার সবাই আসবেন। আর একবার সব কিছু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। মাস্টারদা আরও বললেন যে, যদি কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তার বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হবে। আর পরশু ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে on the day of final operation সকলেই আমার এখানে চলে আসবেন বিকেল থাকতে থাকতে। তারপর আমার এখান থেকেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসার পরই পাহাড়তলি অভিমুখে রওনা হতে হবে। তারপর কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব করে বিপ্লবীরা যে যার চলে গেলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতি সকাল থেকেই নিজেই সব কাজকর্ম সেরে নিয়ে কাছাকাছি থাকা আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করে নিল। সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে মাস্টাবদার সামনে এসে দাঁড়ালেন—দলনেত্রী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। দেখে বোঝার কোনো উপায়ই নেই ইনি একজন ২০-২১ বছরের তরুণী। মনে একটা দারুণ উদ্দীপনা। মুখে তৃপ্তির হাসি। এই তো প্রীতি চেয়েছিল এতদিন। দেশের স্বাধীনতার জন্য—দেশমাতৃকার হাত থেকে শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করতে, এই সুযোগটার জন্যই তো এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। যখনই মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তখুনি বিপ্লবীর কাজ চেয়েছেন—চেয়েছেন প্রকৃত বিপ্লবীর দায়িত্ব। কিন্তু মাস্টারদাকে বোঝা দায়। এক তো কথা বলেন কম। যদি বা বলেন—বলেন একেবারে নীচু গলায়। শেষপর্যন্ত তিনিই মুখ খুললেন। বললেন ইংরেজদের জবাব দিতে আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। সেই পরিকল্পনার রূপ দেবে তুমি। কেমন খুশি তো?

আমি কি একা যাব আপনার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে?

না, তোমার সঙ্গে ছয়জনের একটি দল যাবে সেই অভিযানে। তুমিই হবে অভিযানের দলনেত্রী বা অধিনায়িকা। কি রাজি আছো তো?

প্রীতি প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে নিশ্চয় রাজি। এ তো আমার আজীবনের স্বপ্ন।

কোনো দ্বিধা, কোনো ভয়, কোনো আপত্তি থাকলে বল।

না, মাস্টারদা, কোনো আপত্তি নেই। এই রকম এক দুঃসাহসী কাজের কথাই আমি বারবার ভেবে এসেছি। আপনার আশীর্বাদে আমি সব বিপদ তুচ্ছ করতে পারব।

পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের তারিখও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল। তারিখটা হল ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

২২/৯ ও ২৩/৯ দুদিনের বৈঠকেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা হল কেমন করে আক্রমণ করতে হবে, কে কোন্ দিক দিয়ে যাবে, সংকেত কী হবে? ছক এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল

বোমা, রিভলভার, রাইফেল, পিস্তল ও গুলি সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দিলেন নিজের হাতে। প্রীতির কোমরের দুপাশে দুটো রিভলভার থাকবে। অন্য আর সকলের কাছে থাকবে রিভলভার, রাইফেল ও বোমা। প্রীতির দুহাতে থাকবে দুটো হাত বোমা।

## ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে শুতে যাবার আগে

২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর প্রীতি ডায়রি ও চিঠি লেখার প্যাড নিয়ে বসল। সে প্রতিদিন ইংরেজিতে ডায়রি লিখতে বসত। ডায়রি লেখা শেষ হলে একেবারে শেষ লাইনটা বাংলাতে লিখল—কাল ২৪ সেপ্টেম্বর একটা বিশেষ দিন। কারণ কালই তো যেতে হবে স্বাধীনতার বেদিমূলে নিজেকে উৎসর্গ করতে। পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে। তারপর ডায়রি লেখা বন্ধ করে মাকে চিঠি লিখতে বসল। একটু করে লেখে আর চোখের জল সামলায় প্রীতিলতা।

প্রীতি লিখে চলল।

"মাগো তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হল তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ। আর তোমার অশ্রুজলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছ?"

আরও খানিকটা লিখে প্রীতি লিখল—"তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না ....।"

"মাগো তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি। তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না। কী করবে মা, দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা। তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলি কাঁদবে? আর কেঁদো না মা .....।"

পরের দিন সকালটা যেন নতুন ধরনের মনে হচ্ছিল। একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে প্রীতিলতা ঘুম থেকে জেগে উঠল। পূর্বের আকাশটাকে যেন অস্বাভাবিক রকম লাল মনে হচ্ছিল। সূর্যের আশেপাশের মেঘগুলোকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। আসলে সকালটা অন্যান্য সকালের মতনই ছিল। প্রীতির মনটাই অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। প্রীতি প্রথমেই ডায়রিটা তুলে নিল। তারপরে আবার লিখল—"আজ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সাল। আজ সেই বিশেষ দিন।"

বিকেল থেকেই ওরা সবাই মাস্টারদার আস্তানায় হাজির হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে দু-একজন করে—আলাদা আলাদা রাস্তা দিয়ে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। প্রীতির সঙ্গে অবশ্য একজন আলাদা সঙ্গী রইল। প্রীতিলতা দলের অধিনায়িকা। কমান্ডার প্রীতির আদেশেই সব কাজ হবে। তার সর্বাঙ্গে

পুলিশের মতন সামরিক পোশাক। খাঁকি ট্রাউজাব, শার্ট ও সামরিক টুপি। তাকে তখন ঠিক মিলিটারি পুলিশের মতন দেখতে লাগছে।

রাত আটটা নাগাদ পুরো দলটাই ইউরোপিয়ান ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। চারদিক অন্ধকার, বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাতে মাটি ভিজে গিয়েছিল। সেজন্য জুতোর আওয়াজ তেমন ওঠেনি।

ওরা ক্লাবের খুব কাছাকাছি গিয়ে ক্লাবটাকে প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে অপেক্ষা করতে লাগল দলনেত্রী প্রীতিব নির্দেশের জন্য। ক্লাবঘরে তখন সাহেব-মেমদের জোর নাচ-গান, হৈ-হুল্লা শুরু হয়ে গেছে। তাস, জুয়া, মদ সবেরই ফোয়ারা চলছে। তার সঙ্গে আবার সাহেব-মেমদের নাচগান ও আনন্দের যেন হাট বসে গেছে।

প্রীতিলতা ঘড়ি দেখল। ৯টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। প্রীতি ঠিক করল ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা বারোটার ঘরে গেলেই আক্রমণ শুরু হবে। তখন আর পাঁচ মিনিট বাকি মাত্র।

চার মিনিট বাকি—আরও কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল তারা। আর এক মিনিট মাত্র বাকি .....।

পঞ্চাশ সেকেন্ড-ত্রিশ সেকেন্ড-দশ সেকেন্ডে এলেই প্রীতি বাঁশিটা মুখে তুলে নিল, পি-পি-ই-ই—। একটা টাইম বোম ক্লাব ঘরের মধ্যে আগেই রাখা হয়েছিল, .... সেই বোমাটা ফাটল প্রচণ্ড শব্দ করে। আর বাঁশির শব্দ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব বিপ্লবীরা ক্লাবঘরের দরজা আর জানলাগুলোব দিকে দৌড়ে ছুটে গেল।

প্রথম হাত-বোমাটা ছুড়ল দলনেত্রী প্রীতিলতা নিজে। তারপর চলল বোমার পর বোমা। আর অবিবত পিস্তলের গুলি। চেঁচামেচি, চিৎকার, বুকফাটা কান্না ও অসহ্য যন্ত্রণার কাতরানি। ধোঁয়ায়-ধোঁয়া। চারদিক অন্ধকার। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন সাহেব-মেম গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। কয়েকজন পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। চারদিক থেকে হাহাকার রব জায়গাটাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। সাড়ে তেরো বছর পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের যেন উপযুক্ত প্রতিশোধই নেওয়া হল।

এই সময় দলনেত্রী প্রীতিলতা ক্লাব ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে সব্যসাচীর মতো দু-হাতে গুলি চালাচ্ছেন। আধ ঘণ্টা ধরে এই গুলি ছোড়ার ঝড় চলেছিল। শব্দ শুনে আর পলাতক দারোয়ানের মুখ থেকে শুনে ইংরেজ বাহিনী ক্লাব রক্ষা করতে ক্লাবের দিকে দ্রুত দৌড়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ দলনেত্রী প্রীতিলতার বাঁশি বেজে উঠল। সবাই প্রীতির কাছে ছুটে আসতেই দলনেত্রী বললেন—ভাই সব তোমাদের জীবনগুলো অত সস্তা নয়। আরও অনেক পথ যেতে হবে—অনেক লড়াই করতে হবে। তাই ভাইসব—মহেন্দ্র, সুশীল, শান্তি, কালী ও প্রফুল্ল তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা সবাই তোমাদের জীবন নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও। দলনেত্রী হিসেবে তোমাদের কাছে আমার আদেশও

বটে। মনে রেখো আমরা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সৈনিকমাত্র। এ বাহিনী অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত করতে চায়। আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সবে মাত্র শুরু করেছি। এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে বহুদিন ধরে। তাই বলছি তোমরা সবাই চলে যাও এখান থেকে। সকলে আত্মগোপন করো।

বন্ধুরা সবাই সরে পড়ল। এদিকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গাড়িগুলো তখন ক্লাবের গেটের কাছে এসে পড়েছে। প্রীতি দেখল চারদিক থেকে বহু লোক ক্লাবের দিকে ছুটে আসছে।

দুজন বিপ্লবী বলল—প্রীতিদি চলুন। ধরা পড়ে যাবেন যে। জবাবে প্রীতি বললেন—তোমরা যাও .....। এই রিভলভারটা নাও.....। মাস্টারদাকে দিও। আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো আমি তাঁর নির্দেশ অক্ষবে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছি। বিপ্লবীরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দেখে প্রীতিলতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সব কাজ শেষ। সঙ্গীরাও সব চলে গেছে। রয়ে গেছেন শুধু প্রীতিলতা একা। ওদিকে ইংরেজ সার্জেন্ট উইলিস প্রায় এসে পড়েছে। না, প্রীতি ধরা দেবেন না। পকেটের সায়ানাইডের শিশিটার সব বিষটাই মুখে পুরে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। সার্জেন্ট উইলিস এসে দেখলেন দুঃসাহসী এক নারী। মৃত, কিন্তু মুখে বিজয়িনীর হাসি।

## ডায়রি ও চিঠি

১৩-১৪ জুন, ১৯৩২ প্রীতির বাড়িতে তল্লাশি করে যে ডায়রিটা পাওয়া যায় সেটি এবং মৃত প্রীতিলতার পোশাক তল্লাশি করে যে চিঠিটি ও এক টুকরো কাগজ পাওয়া যায় তা পড়ে ইংরেজ সার্জেন্ট উইলিসের মনোভাব কী হয়েছিল এখানে দেখা যেতে পারে—

ডায়রি—"আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে আমি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক। এ বাহিনী অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশ জননীকে মুক্ত করতে চায়। ....... আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি ......।"

ইংরেজ সার্জেন্ট উইলিস ডায়রিটা পড়ছেন আর ভাবছেন এ কী লেখা। পরাধীন দেশের একটি মেয়ে কোথা থেকে পেল এমন সাহস। অগ্নিকন্যাই বটে, দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু মুখে লেগে আছে দৃপ্ত হাসি। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। পরনে মিলিটারি পোশাক, মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গেছে এই চিঠি।

উইলিস পড়তে লাগলেন—

**"—ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার শত্রু। কোটি কোটি নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাদের সব রকম দুঃখ দৈন্যের মূলে ইংরেজ শাসন। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে, মানুষের জীবন নেওয়া কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধা দিলে তাকে যেমন করে হোক সরিয়ে দিতে হবে।"**

দীর্ঘ চিঠি প্রীতি লিখেছেন—

" ............ আজ দেশের মেয়েরা প্রতিজ্ঞা করেছে তারা পিছিয়ে থাকবে না। স্বাধীনতার যুদ্ধে তারা ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে। যত কঠিন হোক। যত বিপজ্জনক হোক, সব কাজ তারা করবে ....... ।"

উইলিস চিঠি বন্ধ কবল। এই বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল তাব। .....।

আর ছোট্ট কাগজের টুকরোতে লেখা ছিল—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া—
বাহির হনু তিমির রাতে, তরণীখানি বাহিয়া।

এইসব বীরাঙ্গনাদের স্মরণে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত রচনার উল্লেখ করে এই প্রতিবেদন শেষ করি—

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটীকা
ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি
জাগো মাতা জাগো কন্যা বধূ জায়া ভগ্নী
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সমবেগে জাগো পদদলিতা
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।।

## আঠারো

# বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
সব দিতে হবে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেই বাংলা পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছিল। ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষকেও পরতে হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ। কিন্তু এই বাংলাদেশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলাবাহুল্য, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই বাংলাই। নারী-পুরুষ সমবেতভাবেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল। সন্ত্রাসের নায়িকাদের মধ্যে যেমন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাশ ও উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতির নাম অমর হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি সন্ত্রাসবাদ পরিহার করেও যেসব বীরাঙ্গনারা জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে গেছেন মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে অন্যতমা। আর একটি দিক থেকেও এঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তা হল এই যে ওইসব নায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তখনকার নিরিখে শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা ও আধুনিকা। কিন্তু মাতঙ্গিনী ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরা রমণী। তবে নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন ভারতের নারীদের মুকুটমণি স্বরূপা—'The Joan of Arc of India.' বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (করো, না হয় মরো)। স্বীকার করতেই হয় যে মাতঙ্গিনী জীবন বিসর্জন দিয়ে এই মন্ত্রের আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ছোট্ট গ্রাম হোগলা। মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার এলাকাধীন। ওই গ্রামে অতি গরিব এক চাষি পরিবারে জন্মেছিলেন মাতঙ্গিনী। তখনকার দিনে অনেক ভদ্র পরিবারের মধ্যেও জন্মতারিখ রাখা হত না। আর মাতঙ্গিনীর জন্ম তো অতি গরিব ও নিরক্ষর এক চাষি পরিবারে। তবুও ঐতিহাসিকরা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে বার করেছেন তাঁর জন্মের সালটি। সেটি হল ইংরাজির ১৮৭০ সাল। তবে সঠিক তারিখটি আজও জানা যায়নি। তাঁর বাবার নাম ছিল ঠাকুরদাস মাইতি। চাষবাস করে তিনি কোনরকমে সংসার চালাতেন। মায়ের নাম ছিল ভগবতী মাইতি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ও মায়ের নামের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল।

গরিব চাষির ঘর। তার ওপর আবার কন্যা সন্তান। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের মধ্যেই লেখাপড়ার তেমন চল ছিল না। সুতরাং মাতঙ্গিনীরও লেখাপড়া হয়নি একেবারেই। এগারো বছর বয়স হতে না হতেই বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। পাশেই আলিনান

গ্রাম। পাত্র ওই গ্রামেরই ত্রিলোচন হাজরা। কিন্তু মাতঙ্গিনীর বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হল না। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই স্বামীকে হারালেন তিনি। ছেলে-মেয়েও কিছু হয়নি। সাত বছরেই সংসার-জীবন শেষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষা নিযে নিলেন। ভাবলেন ধর্ম-কর্ম করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

ওই সময়ের কিছু আগে-পরে স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হবেন—জননী-জন্মভূমি। তাঁর পুজো করো সকলে।" স্বামীজির কথাটা মাতঙ্গিনীকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন দেশকে বিদেশির শাসনমুক্ত করে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছুই থাকতে পারে না। তাই সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সে সুযোগ সত্যিই এল যখন গান্ধীজি পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০-৩৪) ঢেউ মেদিনীপুরেও আছড়ে পড়ল। এদিকে বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুরের শাসনব্যবস্থা তখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে সন্ত্রাসবাদীদের দাপটে। তিন-তিনজন জাঁদরেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—পেডি, ডগলাস ও বার্জ প্রাণ হারিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। এক কথায় বলা যায় শাসককুল মেদিনীপুরের নাম শুনলেই বিশেষভাবে আতঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়তেন।

১৯৩০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হল লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন। দেশবাসীর পক্ষে সমুদ্র-জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা তখন বেআইনি ছিল। দেশের যে যে জায়গায় লবণ তৈরির সুযোগ ছিল সত্যাগ্রহীরা সেইসব জায়গায় লবণ তৈরি করে আইন-অমান্য করতে লাগলেন। মেদিনীপুরের কাঁথিতেই প্রথম লবণ তৈরি শুরু হল। খবর পেয়েই পুলিশ গ্রামে ঢুকল। ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। নানান অত্যাচার শুরু করে দিল। তবুও মেদিনীপুর শায়েস্তা হল না। শাসককুল চাইল লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকার তাদের হাতে থাকুক। কিন্তু দেশের মানুষ চাইল লবণ তৈরির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা।

আইন অমান্য আন্দোলনে মাতঙ্গিনীও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আলিনান গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। খবর পেয়েই পুলিশ এল। মাতঙ্গিনী গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে রইলেন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরাও। তাঁরাও গ্রেপ্তার হলেন। এ দুর্ভোগ অবশ্য বেশিক্ষণ সইতে হয়নি। কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে দেওয়া হল।

পরবর্তী ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৪/৩৫ সালে। অবিভক্ত বাংলার লাটসাহেব মি. অ্যান্ডারসন গোঁ ধরেছেন তমলুকে দরবার করবেন। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। মেদিনীপুরের বরাবরই রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য। মেদিনীপুরবাসীরা তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাটসাহেবকে এই দরবার তারা কিছুতেই করতে দেবে না। মেদিনীপুরবাসীরা দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা

আর কিছুতেই ইংরেজদের গোলামি করতে রাজি নয়। এদিকে ইংরেজ সরকারও তাদের সংকল্পে অটল। সুতরাং সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

লাটসাহেব এলেন জেদের বশে। তমলুকে দরবার তিনি করবেনই। দরবার বসার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। কে তোয়াক্কা করে কয়েকটা কালা নেটিভের প্রতিবাদের। পুলিশ ও প্রশাসনের মনোভাব অনেকটা একই রকমের। এমন সময় হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও—ফিরে যাও। তোমার কোন কথা আমরা শুনতে রাজি নই। ঢের হয়েছে। তোমাদের দাসত্ব আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমরা চাই তোমাদের হাত থেকে মুক্তি। বন্ধ করো তোমাদের শোষণ ও লুণ্ঠন। বন্ধ করো তোমাদের পুলিশি জুলুম। লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও।" আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, বন্দে মাতরম, ধ্বনিতে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল দরবারের দিকে। শত শত পুলিশও হাজির। হাতে তাদের লাঠি ও বন্দুক। শোভাযাত্রীদের পথ আটকাল ওই পুলিশবাহিনী। পুরোভাগেই ছিলেন—মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার কিন্তু তাঁকে আর এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হল না। রীতিমতো বিচার হল। মাতঙ্গিনী দুমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিচারের রায় ঘোষণার পর হাসিমুখে বলেছিলেন তিনি—"দেশের জন্য, দেশকে ভালোবাসার জন্য দণ্ডভোগ করার চেয়ে বড়ো গৌরব আর কী আছে?"

মাতঙ্গিনীকে অমর করে রেখেছে ১৯৪২ সালের অগাস্ট বিপ্লব। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র—"ভারত ছাড়ো" বা কুইট্ ইন্ডিয়া (Quit India) এই ধ্বনি দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেশ প্রস্তুত নয় অথবা আমার অন্তর থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না বলে গান্ধীজি চার বছর বৃথা দেরি করে ফেললেন। অবশেষে ১৯৪২ সালের ৯ অগাস্ট তারিখে ওই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহাত্মাজি—"ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দেন। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল জাতির জনকের আবেগ। হিংসা ও অহিংসা একসূত্রে গাঁথা হয়ে যাওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা এক নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজেহাল ইংল্যান্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করার একটা সুবর্ণসুযোগ দেখা দেয়। অবশ্য ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে দেরিতে শুরু করার জন্যই সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর। অগাস্ট বিপ্লবের জোয়ার তখন মেদিনীপুরে আছড়ে পড়েছে। ঠিক হয়েছে এক সঙ্গে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া হবে।

মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছাসেবকদের বোঝালেন গাছ কেটে ফেলে রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ করে দিতে হবে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে

হবে। পাঁচদিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়ে তমলুক থানা এবং একইসঙ্গে সমস্ত সরকারি অফিসগুলি দখল করে নিতে হবে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ২৯ সেপ্টেম্বর পাঁচটি দিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল তমলুক অধিকার করতে। হাজার হাজার মেদিনীপুরবাসী শামিল হয়েছিলেন ওই শোভাযাত্রায়। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। মুখে গর্জন ধ্বনি—"ইংরেজ ভারত ছাড়ো—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—বন্দে মাতরম্।"

পশ্চিমদিক থেকে এগিয়ে এল আট-দশ হাজার মানুষের এক বিরাট শোভাযাত্রা। গুর্খা ও ব্রিটিশ গোরা সৈন্যরা তৈরি হল অবস্থার মোকাবিলার জন্য। হাঁটু মুড়ে বসে গেল তারা। তারপরই তাদের বন্দুকগুলো গর্জে উঠল। মারা গেলেন পাঁচজন। আহত হলেন আরও বেশ কয়েকজন। আহত রামচন্দ্র বেরার দেহটা টানতে টানতে থানার সামনে এনে ফেলে রাখল কোন এক ব্রিটিশ টমি। জ্ঞান ফিরে আসতেই সবার অলক্ষ্যে রামচন্দ্র বেরা বুকে হেঁটে থানার দিকে এগিয়ে চলল। থানা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই উল্লাসে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন—"থানা দখল করেছি।" তারপরই তাঁর শরীর নিথর নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তর দিক থেকে আসছিল মাতঙ্গিনীর দলটি। তারা থানার কাছাকাছি আসতেই পুলিশ ও মিলিটারি অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন কিছুটা পিছুটা হঠে গিয়েছিল। তাদের সতর্ক করে দিয়ে মাতঙ্গিনী বললেন—"থানা কোন্ দিকে ? সামনে, না পেছনে? এগিয়ে চলো। হয় থানা দখল করো, নয়ত মরো। বলো—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—'বন্দে মাতরম্।"

বিপ্লবীদের সম্বিত ফিরে এল। তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে থাকল—"এগিয়ে চল। ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। —বন্দে মাতরম্।" আবার এগিয়ে যেতে লাগল তারা জলপ্রপাতের বেগে। ওদিকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল বৃষ্টির মতো।

উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা দলটির পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। বয়স বাহাত্তর কি তিয়াত্তর। তবুও ছুটে চলেছেন উল্কার বেগে। বাঁ-হাতে বিজয় শঙ্খ—ডান হাতে জাতীয় পতাকা। আর মুখে ধ্বনি—"ইংরেজ ভারত ছাড়ো—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—বন্দে মাতরম্।"

একটি বুলেট পায়ে লাগতেই হাতের শাঁখটি মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে বাঁ-হাতটা নুয়ে পড়ল। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলে চলেছেন—"ব্রিটিশের গোলামি ছেড়ে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করো—তোমরা সব আমাদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে হাত মেলাও।" প্রত্যুত্তরে উপহার পেয়েছিলেন কপালবিদ্ধ করা তৃতীয় বুলেটটি। প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতীয় পতাকাটি তখনও তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা ছিল।

এইভাবে কত স্নেহময়ী জননী ও মমতাময়ী ভগিনী যে দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কোনদিনও লেখা হবে না। তাই বিদ্রোহী কবি নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়—

কোন কালে একা, হয়নি কো জয়ী,
পুরুষের তরবারি—
শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে,
বিজয়লক্ষ্মী নারী।
কোন্ রণে কত খুন দিলো নর—
লেখা আছে ইতিহাসে,—
কত নারী দিলো সিঁথির সিঁদূর,
লেখা নাই তার পাশে।

## উনিশ

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকজন বীরাঙ্গনা

অন্তবিহীন নয়ত অন্ধকার—
কঠিন আঘাতে ভাঙ্গিবে বন্ধ দ্বার।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অভ্যুত্থান বলা যায় কিনা ঐতিহাসিকদের কাছে এটি একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ওই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর অবিস্মরণীয় বীরগাথার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হয়ে যাবে। বস্তুত তিনিই ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শহিদ। আশ্চর্যের বিষয়—নেতাজি সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ শাসককুলের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিলাদের নিয়ে গঠিত পরিপূরক অংশটির নাম রেখেছিলেন—রানি ঝাঁসি রানি রেজিমেন্ট। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে ওই রেজিমেন্টের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যিনি তাঁরও নাম ছিল—লক্ষ্মী স্বামীনাথন।

স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁদের দত্তক-পুত্র দামোদরেরই সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় লর্ড ডালহাউসি তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) প্রয়োগের মাধ্যমে ঝাঁসি রাজ্যটি দখল করে নিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সুযোগে লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসির স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইংরেজদের ঝাঁসি থেকে বিতাড়িত করেন। পরে মহাবিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়র দুর্গটি দখল করে নেন। শেষপর্যন্ত অবরোধকারী বিশাল ইংরেজ বাহিনী ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে ইংরেজ সৈনিকদের তরবারির আঘাতে তাঁর মাথা লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। পুরুষের বেশে ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনি দিবারাত্র নিজের সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতেন। ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ বলেছিলেন যে,—"রানীই ছিলেন ওই বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ ও অসমসাহসী নেত্রী।"

ইতিহাসের দিক থেকে পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন নির্বাসিতা অসামান্যা বিপ্লবী নেত্রী—মাদাম ভিকাজি রুস্তাম কামা, তাঁকেই তো বলা হয় ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের জননী। ১৯০৭ সালের ৭ অগাস্ট—(মতান্তরে ১৯০৫ সালের অগাস্ট মাসে) জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি একটি তেরঙা পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। পতাকাটির রং ছিল—লাল, সবুজ ও হলুদ এবং মধ্যে লেখা ছিল—"বন্দে মাতরম্।" এটিকেই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকা বলে গণ্য করা হত। মাদাম কামা ব্রিটেনে Free India Society প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে ব্রিটেনের

দমননীতির হাত থেকে রেহাই পেতে প্যারিসে চলে আসেন এবং সেখান থেকেই ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

বাংলার বিপ্লববাদের প্রথম যুগে অনুশীলন সমিতির যে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন আইরিশ দুহিতা—মিস মার্গারেট নোবল—পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা—ভগিনী নিবেদিতা। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর ৬টি খণ্ডই তাঁর কাছে ছিল। প্রথম খণ্ডটি তিনি বাংলার বিপ্লবীদের উপহার দেন। ওই খণ্ডটি পাঠ করে বাংলার বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। পরে ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি হবার আগেই তিনি বাকি পাঁচটি খণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই বিশিষ্ট বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহার দিয়ে অন্য সব বিপ্লবীদের পাঠ করার সুযোগ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যান। তিনি যে কেবলমাত্র বিপ্লবীদের প্রেরণাই জুগিয়েছিলেন তা কিন্তু ঠিক নয়। কত বিপ্লবীকে যে নিজের আশ্রয়ে লুকিয়ে রেখে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তারও কোন হিসেব করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আর এক মহীয়সী আইরিশ মহিলার কথা না উল্লেখ করলে অন্যায় হয়ে যাবে। এই আইরিশ মহিলাটির নাম—শ্রীমতী এলিস। যৌবনে ভারতীয় ব্যারিস্টার জাফর আলিকে বিয়ে করে ভারতে এসেছিলেন। শেষ জীবনটা সংসার ত্যাগ করে এলাহাবাদে একান্তে সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনযাপন করে গেছেন। ভারতবর্ষকে ভালোবেসে মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। নাম নিয়েছিলেন—সাবিত্রীদেবী। ভারতবর্ষের সমাজ ও দর্শন বিষয়ক বই ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী পাঠিকা। বড়োলাট আরউইনের ট্রেন ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টায় জড়িত যশপালকে আশ্রয় দেওয়ায় ১৯৩২ সালের ২৩ জানুয়ারি পুলিশ তাঁকে ও যশপালকে গ্রেফতার করে। আশ্রয়দাত্রী হিসেবে তাঁর ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। হাজতে আটক থাকার সময় তাঁর দুই অনুগামী—কৃষ্ণশঙ্কর শ্রীবাস্তব ও কাশীনাথ পাণ্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যখন বলেন—"মা তুমি শক্ত হও" তখন ঝলসে উঠে তিনি বলেছিলেন—"শক্ত হবার কথা কী বলছো? আমি তো জন্মই নিয়েছি আইরিশ কারাগারে—আমি তো আইরিশ কারাগারেরই লালিতা কন্যা।"

সাজানো সংসার পেতে—শশধর আচার্যের স্ত্রী সেজে—কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের বিদুষী শিক্ষিকা সুহাসিনী গাঙ্গুলী কীভাবে বাংলার বিপ্লবীদের রক্ষা করেছিলেন তাও তো আজ ইতিহাস। সকলের কাছে পুঁটুদি নামে পরিচিতা সুহাসিনী গাঙ্গুলীই তো চন্দননগরের গোপন আস্তানায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষালদের আশ্রয় দিয়ে পুলিশকে বহুদিন বোকা বানিয়ে রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়ে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেও মাথা নত করেননি, মুখ খোলেননি কিছুতেই।

কেউ কি কোনদিন ভুলতে পারবেন অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহিদ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারিণী—চট্টগ্রামের নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিসট্রেস প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদারকে? গুরু সূর্য সেনের কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিতা প্রীতিলতা চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব ধ্বংস করার সময় পুলিশের হাতে ধরা না দিতে সায়ানায়িডের ক্যাপসুল মুখে পুরে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। তাঁর পরনে ছিল খাঁটি সামরিক পোশাক—খাঁকি শার্ট ও ট্রাউজার্স এবং মাথায় সামরিক টুপি। মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রীতিলতা তাঁর জীবনটা উৎসর্গ করে গেলেন দেশমাতৃকার পাদপদ্মে। পবে তাঁর পোশাক তল্লাসি করে পুলিশ যে ছোট্ট কাগজের টুকরোটি পেয়েছিল সেটিতে লেখা ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরই দুটি লাইন—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া—
বাহির হনু তিমির রাতে, তরণীখানি বাহিয়া।।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নাযক মাস্টারদার অপর বীরাঙ্গনা শিষ্যাটির নাম কল্পনা দত্ত—পরবর্তী জীবনে যিনি হযেছিলেন কল্পনা যোশী। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সূর্য সেন ছিলেন গৈরালা গ্রামের গৃহবধূ ক্ষিরোদপ্রভা বিশ্বাসের আশ্রয়ে। মাস্টারদার মাথার দাম তখন দশ হাজার টাকা। অর্থের লোভে ওই গ্রামেরই নেত্র সেন গোপনে পুলিশকে খবরটা জানিয়ে দেয়। পুলিশ এসে বিশ্বাস বাড়িটি ঘিরে ফেলে। কল্পনাকে কোন রকমে বাড়িটির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে সূর্য সেন নিজে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। চারমাস পরে কল্পনাও ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়।

বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনও অবশ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে পুলিশের কাছ থেকে নয়, বিপ্লবীদের হাত থেকে। সূর্য সেন ধরা পড়ার কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন রাত্রে নেত্র সেন যখন পরমানন্দে খেতে বসেছেন তখন এক কোপে তাঁর মুণ্ডটি ভাতের থালার ওপর গড়াগড়ি দিয়েছিল।

কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা সরকারি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির দুটি ছাত্রী কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরীর রিভলভারের গুলিতে নিজের বাড়িতেই নিহত হয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্স ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে। শান্তির বয়স তেরো এবং সুনীতির চোদ্দো হলেও ইংরেজ জজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন কী ধাতুতে গড়া ওই দুই বালিকা। বিচার চলার সময় একদিন বসার জন্য চেয়ার না থাকায় তাঁরা দুজনেই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেকে জজসাহেবকে বাধ্য করেছিলেন চেয়ার দেওয়ার হুকুম দিতে।

অন্য আর একদিন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এস. ডি. ও. নেপাল সেন যখন সাক্ষী দিচ্ছিলেন তখন শান্তি ও সুনীতি একসঙ্গে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন—'Great liar! Great liar!' শেষপর্যন্ত নাবালিকা বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি হওয়ায় তাঁরা দুঃখ করে বলেছিলেন—"আমাদের খুব আশা ছিল ফাঁসির দড়িটা আমরা নিজেদের হাতেই গলায় পরতে পারব। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।"

১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ঠিক ৩টে ১৫ মিনিটে শুরু হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন। নির্বিঘ্নে চলেছিল ৪টে ২৫ মিনিট পর্যন্ত। তারপরই এক মহিলা গ্র্যাজুয়েটের অ্যাকাডেমিক গাউনের খস্ খস্ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে উপস্থিত দর্শকেরা দেখলেন যে এক সদ্য-স্নাতক সুশ্রী তরুণী দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে যেতে বাংলার গভর্নর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে হাতের রিভলবার থেকে পর পর চারটি গুলি ছুড়লেন। কিন্তু জ্যাকসন সাহেব চকিতে টেবিলের আড়ালে সরে যেতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় একটি গুলিও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং গভর্নর সাহেব প্রাণে বেঁচে যান। সদ্যস্নাতক তরুণীটি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যান। ডায়োসেশন কলেজের ছাত্রী এবং সদ্য-স্নাতক একুশ বছর বয়সী ওই সুশ্রী তরুণীটির নাম—কুমারী বীণা দাশ। ইনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাশের কনিষ্ঠা কন্যা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বীণা মাত্র একুশ বছর বয়সেই জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ করে রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

এরপর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে শুরু হল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। কিন্তু শত নিপীড়নেও বীণা ছিলেন নিরুত্তর। তখন চেষ্টা হল পিতাকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে কন্যার মুখ খোলানোর। কিন্তু শাসকদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল বেণীমাধববাবু ঘৃণা ভরে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করায়। ইতিমধ্যে তিনি একদিন সারা রাত জেগে মেয়ের জন্যে লিখে ফেললেন পঁচিশ পাতার এক ঐতিহাসিক বিবৃতি। আদালতে বীণার মুখ থেকে ওই অসাধারণ বিবৃতিটি শুনে ভারত ও ইংল্যান্ডের অনেকেই বলেছিলেন—"এ তো বিবৃতি নয়, এ হল ভারতের মর্মবাণী।"

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জাফরানি রঙের খদ্দরের শাড়ি পরিহিতা সুশ্রী বীণা যখন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলে চলেছেন—"যে সরকার ত্রিশ কোটি মানুষকে পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে সেই অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল আমার সংগ্রাম", তখন ওই অগ্নিকন্যার মুখখানি লক্ষ করে তাঁরই ডায়োসেশন কলেজের শিক্ষিকা মিস্টার ডরোথি বলে উঠেছিলেন—"দ্যাখ! দ্যাখ! বীণাকে ঠিক যেন ম্যাডোনার মতো দেখাচ্ছে।"

৬ তারিখে খবরটা শুনেই মিস্টার ডরোথি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। পরের দিনই (৭ তারিখে) জেল হাজতে গিয়ে বীণাকে দেখে বলেছিলেন—"Bina dear, I love you so much! How could you do it?" জবাবে বীণা বলেছিল—"Sister, I love you no less, but I love my country more."

রায় বের হয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি। বীণার শাস্তি হয়েছিল ৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

৪ মে, ১৯৩৪ সাল। ভবানী ভট্টাচার্য, রবি ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ও উজ্জ্বলা মজুমদার হাজির হলেন দার্জিলিং-এ। ভবানী ও রবি উঠলেন লুই জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে। আর মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা স্নো ভিউ হোটেলে। উজ্জ্বলার সঙ্গের হারমোনিয়ামটি দেখে

মনে হবে যে গান-বাজনার প্রতি উজ্জ্বলার বুঝি অসাধারণ ঝোঁক। কিন্তু আসলে ওই হারমোনিয়ামটির ভেতরেই লুকোনো আছে যতসব মারণাস্ত্র।

বাংলার গভর্নর অ্যান্ডারসন সাহেব পর পর দুটো অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন এই পাকা খবরটা পেয়েই চার বিপ্লবী এসে হাজির হয়েছেন দার্জিলিং-এ। ৭ তারিখে ফ্লাওয়ার শো একজিবিশন এবং ৮ তারিখে লেবং-এ ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতা। ৭ তারিখের অনুষ্ঠানে শত চেষ্টার পরও লাটসাহেবের কাছাকাছি পৌঁছোনো গেল না। তাই তাঁকে রিভলভারের নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল না। অগত্যা ৮ তারিখে লেবং-এর ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার দিনটির অপেক্ষায় থাকতেই হল। রবি ও ভবানী সুবিধেমতো জায়গায় আসন গ্রহণ করতেই উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন কলকাতা ফেরার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি স্টেশনের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

যথা সময়ে লেবং রেস-কোর্সে হাজির হয়ে গেলেন বাংলার মহামান্য লাটসাহেব অ্যান্ডারসন। ঘোড়-দৌড় শেষ হতেই অ্যান্ডারসন সাহেব সেই পুরস্কার দিতে উঠলেন অমনি গর্জে উঠল দুই বিপ্লবী—রবি ও ভবানীর হাতের রিভালভার দুটি। আহত অ্যান্ডারসন সাহেব ধরাশায়ী। তবে শেষপর্যন্ত চিকিৎসার গুণে প্রাণে বেঁচে গেলেন। এদিকে রবি ও ভবানী হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন। তখুনি খোঁজ পড়ল কোথায় গেল সেই খুব ফর্সা আর পুরু কাঁচের চশমা ও পিঙ্ক রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি? শিলিগুড়ি স্টেশনে নজরে পড়েছিল একটি খুব ফর্সা মেয়ে। কিন্তু তার পরনে ছিল না পিঙ্ক রঙের শাড়ি আর চোখেও ছিল না পুরু কাচের চশমা। তবে পুলিশ উজ্জ্বলার সন্ধান পেয়েছিল ঠিক দশ দিন পরে—১৮ মে তারিখে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শোভারানী দত্তের বাড়িতে। বিচারে উজ্জ্বলার শাস্তি হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একনিষ্ঠ কর্মী সুরেশ মুজমদারের কন্যা ছিলেন এই উজ্জ্বলা। ওঁদের ওয়ালিউল্লা লেনের বাড়িটি ছিল সব পলাতক বিপ্লবীদেরই স্থায়ী আশ্রয়স্থল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীরাঙ্গনাদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, শান্তি ঘোষ সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাশ ও উজ্জ্বলা মজুমদার প্রমুখেরা যেমন ইতিহাস হয়ে গেছেন সন্ত্রাসবাদী নায়িকা হিসেবে ঠিক তেমনি অহিংসার পথে জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন ভারতের জোয়ান অব আর্ক-মাতঙ্গিনী হাজরা।

১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি আইন অমান্য আন্দোলনের শরিক হয়ে নিজের হাতে লবণ তৈরি করেছিলেন মাতঙ্গিনী। পুলিশ এসে গ্রেফতার করেছিল তাঁকে। কিন্তু কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ওই দিন থেকেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল গান্ধী-বুড়ি।

১৯৩৪-এর জানুয়ারি মাস। অবিভক্ত বাংলার গভর্নর অ্যান্ডারসন সাহেব দরবার করতে এলেন তমলুকে। এদিকে তমলুকবাসীদের ধনুর্ভাঙা পণ কিছুতেই লাটসাহেবকে

দরবার করতে দেওয়া হবে না। হাজারকণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"লাটসাহেব ফিরে যাও—বন্ধ করো তোমাদের শোষণ ও লুণ্ঠন—বন্দে মাতরম্।" শোভাযাত্রার পুরোভাগেই ছিলেন মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করল। বিচারে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল দু-মাসের।

তবে মাতঙ্গিনীকে অমর করে রেখেছে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ২৯ সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা রওনা হয়ে গিয়েছিল তমলুক থানা দখল করতে। উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এসেছিল যে দলটি সেটিরই পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। বয়স তিয়াত্তর। তবুও এগিয়ে চলেছেন উল্কার বেগে। এক হাতে বিজয় শঙ্খ। অন্য হাতে জাতীয় পতাকা। আর মুখের ধ্বনি—'ইংরেজ ভারত ছাড়ো, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, বন্দে মাতরম্।"

একটি বুলেট পায়ে লাগতেই হাতের শাঁখটি মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে বাঁ-হাতটি নুয়ে পড়ল। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে বলে চলেছেন—"ব্রিটিশের গোলামি ছেড়ে গুলি ছোড়া বন্ধ করো—তোমরা সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে হাত মেলাও।" প্রত্যুত্তরে উপহার পেয়েছিলেন কপালবিদ্ধ করা তৃতীয় বুলেটটি। প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তবে জাতীয় পতাকাটি তখনও তাঁর ডান হাতের মুঠোয় ধরা ছিল।

এবার আরও দু-জনের কথা বলে আমার এ প্রতিবেদন শেষ করব। তাঁরা হলেন অরুণা গাঙ্গুলী (আসফ আলি) ও লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সায়গল)। দু-জনেই রূপকথার দুই রাজকন্যা।

অরুণা গাঙ্গুলীর জন্ম পাঞ্জাবে। তাঁর বাবা পেশায় ডাক্তার ছিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান ব্যারিস্টার, ১৯৪৬-এর কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী, আজাদ হিন্দের তিন অফিসারের বিচার উপলক্ষ্যে গঠিত কৌসুলি বোর্ডের অন্যতম সদস্য—আসফ আলির সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় অরুণা হয়ে যান—অরুণা আসফ আলি।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী হিসেবে অরুণা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগকে এমন বিড়াল-ইঁদুর দৌড় করিয়েছিলেন যে ১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা ব্রিটিশ পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে যখন তিনি প্রকাশ্যে দেখা দিলেন তখন তাঁর ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। স্থায়ীভাবে দিল্লিতেই বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন দিল্লির মেয়রও (Mayor) নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৯১-এ ভারত সরকার তাঁকে "ভারতরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৯৬ সালে এই রূপকথার অগ্নিকন্যার জীবনাবসান হয়।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী (মহিলা বিভাগ), আবার মহিলাদের নিয়ে গঠিত ঝাঁসির রানি বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে লড়াই করতে করতে ভারত অভিযানে রওনা হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ভারতে এসে সহকর্মী অফিসার প্রেমকুমার সায়গলের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় হয়ে যান লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সায়গল) বা লক্ষ্মী সায়গল। যে তিন আজাদ হিন্দ অফিসারের লালকেল্লায় বিচার হয়েছিল তাঁদেরই একজন ছিলেন এই প্রেমকুমার সায়গল।

স্বাধীনতার পর ভারতে এসে মিসেস সায়গল ভারত সরকারের করুণা থেকে বঞ্চিত আজাদ হিন্দের জোয়ান ও অফিসারদের স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে নিয়োগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল নেতাজির আদর্শ ও স্বপ্নকে নতুন প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ১৯৪৬ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় তাঁকে অন্যান্য আজাদ হিন্দের অফিসার ও জোয়ানদের সঙ্গে প্রথম দেখেছিলাম এবং দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওই দিন নেতাজির পঞ্চাশতম জন্মদিনে আজাদ হিন্দের সদস্যদের কলকাতায় র‍্যালি। উচ্ছ্বাস আর আবেগের জোয়ারে সেদিন সারা কলকাতা তথা সারা বাংলা উত্তাল। শোভাযাত্রাটির দৈর্ঘ্য ছিল শ্যামবাজার থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমানের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) পর্যন্ত। জনতার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কোন বাড়িরই নীচেরতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত তিল ধারণের স্থান ছিল না। আমি দু-মাস পরে বি.এ. পরীক্ষায় বসব। পড়া ছেড়ে হাজির হয়েছিলাম সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম দিকের একটা মেস-বাড়ির বারান্দায়। সেখান থেকে স্বচক্ষে সব দেখেছিলাম। আজও চোখ বুঁজলেই সেই স্বপ্নের দিনটা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। যত আনন্দ-ততই কান্না। আনন্দ তিন বীর আজাদি সেনাপতির মুক্তিলাভে। কান্না—যেহেতু তারা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাজিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারেনি। কী স্বপ্নই না দেখেছিল তারা। আর শেষপর্যন্ত কী পেল তারা—শুধুই বঞ্চনা আর অবহেলা।

তারপর গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে মিসেস সায়গলকে দেখেছি প্রায় প্রতি বছরই নেতাজি ভবনে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠানে। বিশেষত ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে প্রতি বছরই উপস্থিত থেকে ভাষণ দিয়েছেন। বলেনও বেশ ভালো।

গভীর পরিতাপের বিষয় শ্রীমতী সায়গল আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাননি বলার মতো তেমন কোনো স্বীকৃতি বা পুরস্কার। ২০০২ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। তবুও বলব যে আজও পর্যন্ত তিনি যে জীবিত আছেন এটাই তাঁর দেশবাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে বিপিনদার মন্ত্রশিষ্য নিবারণচন্দ্র ঘটকের মামিমা দুকড়িবালা দেবীর নাম উল্লেখ না করলে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। বিপিনদার কাছেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা দুকড়িবালাদেবীই মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেছিলেন। রডা কোম্পানি

থেকে লুঠ করা অস্ত্রের কিছুটা তাঁর হেফাজতে রাখা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং সব অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তারপর শত অত্যাচারেও পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও বার করতে পারেনি।

এইভাবে কত স্নেহময়ী জননী ও মমতাময়ী ভগিনী যে দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন সে ইতিহাস হয়তো কোনোদিনই লেখা হবে না। তাই বিদ্রোহী কবি নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয় যে—

কোন্ রণে কত খুন দিলো নর।
লেখা আছে ইতিহাসে—
কতো নারী দিলো সিঁথির সিঁদূর,—
লেখা নাই তার পাশে।
কতো মাতা দিলো হৃদয় উপাড়ি
কতো বোন দিলো সেবা
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে
লিখিয়া রেখেছে কেবা?

কুড়ি

# শতবর্ষের আলোয় বঙ্গভঙ্গবিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)

## পটভূমি

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সচেতনতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙালিই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। আবার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও ছিল বাঙালিদেরই হাতে। এক কথায় বলা যায় যে তখন থেকেই বাঙালি গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে পথ দেখাত। তাই বড়োলাট কার্জন মনে করতেন বাঙালিই হল সকল অশান্তির উৎস। আর তাই বাঙালিকে দুর্বল করে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আমলে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবটি কার্যকবী করা হয়। ওই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা তথা ভারতে যে আন্দোলনের সূচনা হয় সেটিই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন নামে ইতিহাসে পরিচিত।

## বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার হোতা ছিলেন না। তাঁর শাসনকালের অনেক আগে থেকেই বেশ কয়েকবার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা ও আসাম একজন লে. গভর্নরের অধীনে শাসিত হত। কিন্তু এত বড়ো একটা প্রদেশের শাসনভার কেবল একজন লে. গভর্নরের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না। তাই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বলে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ও ময়মনসিং জেলা দুটিকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লে.গভর্নর অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার আবার নতুন করে প্রস্তাব দেন। শেষপর্যন্ত ঠিক হয় যে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিং জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে যায়। এমনকি ইউরোপীয়দের মুখপত্র—ইংলিশম্যান পত্রিকা এবং ইউরোপীয় বণিক সংঘগুলিও ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। অগত্যা সরকার বাধ্য হয়ে পরিকল্পনাটি বাতিল করে গোপনে বঙ্গভঙ্গের একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে। নতুন পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হয় যে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহি বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ জেলা ও দার্জিলিং—অর্থাৎ কিনা উত্তর ও পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে—'পূর্ববঙ্গ ও

আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। এর রাজধানী হবে ঢাকা এবং এর শাসনভার থাকবে একজন লে. গভর্নরের হাতে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গড়ে উঠবে মূল বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী হবে কলকাতা।

### বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কার্জনের যুক্তি

(ক) প্রথমত, একজন লে. গভর্নরের পক্ষে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত এত বড়ো একটি প্রদেশের শাসনভার বহন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। (খ) দ্বিতীয়ত, কলকাতা কেন্দ্রিকতার জন্য পূর্ববঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যায় উন্নতি বাধা পাচ্ছে। (গ) তৃতীয়ত, মুসলিমপ্রধান পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক সুবিধা হবে। সুতরাং সরকারি মতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার ক্ষেত্রে অবহেলিত আসাম প্রদেশের উন্নতি এবং ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম ও ওড়িয়া সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য বঙ্গভঙ্গ অপরিহার্য।

সাম্প্রতিককালে কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিগুলি মেনে নিয়ে বলেছেন যে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলনের পশ্চাতে কোনো আদর্শবাদ বা মহৎ প্রেরণা ছিল না। বঙ্গভঙ্গের ফলে সমাজের তথাকথিত এলিট গোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাঁরাই এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। (ক) প্রথমত, বিক্রমপুর ও পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুরা আশঙ্কা করে যে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে উভয় বাংলায় নিম্ন-সরকারি পদগুলি যা প্রায় তাঁদের একচেটিয়া হয়ে গেছে সেগুলি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। (খ) দ্বিতীয়ত, যেসব জমিদারের দুই বাংলায় জমিদারি ছিল তাঁরা দুই প্রদেশে জমিদারি পরিচালনার জন্য বেশি আমলা, উকিল প্রভৃতি রাখতে বাধ্য হবেন। এতে তাদের প্রশাসনিক খরচ বেড়ে যাবে। (গ) তৃতীয়ত, ভাগ্যকুলের রায় পরিবার কলকাতায় একচেটিয়া পাট ও চালের ব্যাবসা করতেন। নতুন প্রদেশ গড়ে উঠলে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকা ও চট্টগ্রামের উত্থানের আশঙ্কায় তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। (ঘ) চতুর্থত, কলকাতার আইনজীবীরা পূর্ববঙ্গে তাঁদের মক্কেল হারাবার এবং (ঙ) পঞ্চমত, কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পূর্ববঙ্গে তাদের বাজার হারাবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। (চ) ষষ্ঠত, যেসব রাজনৈতিক নেতা পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলার আইনসভায় নির্বাচিত হবার স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত শঙ্কিত হন এবং (ছ) সপ্তমত, কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পাবার সম্ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

**প্রকৃত বা আসল কারণ ঃ বলাবাহুল্য, বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জন শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা বললেও তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর বক্তব্যও কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সময়ে সর্বস্তরের বাঙালির মধ্যে যে ঐক্য সংহতি ও স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়েছিল কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা তা বুঝতেই পারেননি। এই ঐক্যবোধ ও আত্মসচেতনতাই বাঙালিকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে**

উৎসাহিত করেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমত, ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বাংলার গভর্নর Andrew Fraser-কে লিখেছিলেন—"পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির বাঙালিরা রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়। অতএব তাদের বাকি প্রদেশ থেকে পৃথক করার প্রস্তাবের স্বপক্ষে এর চেয়ে দামি কোন যুক্তি থাকতে পারে না।" কার্জনের স্বরাষ্ট্র-সচিব রিজলি (Rislay) লিখেছিলেন—"ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি। বিভক্ত বাংলা নানা টানা-পোড়েনে পর্যুদস্ত হবে।" এটা খুব খাঁটি কথা এবং বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে এটাই সবচেয়ে জোরালো যুক্তি (৬ ডিসেম্বর, ১৯০৪ সাল)। দ্বিতীয়ত, বাংলার বিশাল আয়তনই যদি মূল সমস্যা হত তাহলে জাতীয় কংগ্রেস গৃহীত প্রস্তাবটি মেনে নিয়ে বাংলা থেকে উড়িষ্যা ও বিহারকে পৃথক করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের এক সঙ্গে রাখা যেতে পারত। আসলে কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যমণি বাঙালিকে দুর্বল করে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বলতর করে দেওয়া। বলাবাহুল্য, কার্জনের পরিকল্পনা কার্যকর হলে নবগঠিত দুটি প্রদেশেই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে তাদের গুরুত্বই হারিয়ে ফেলত এবং এতে জাতীয় কংগ্রেসও দুর্বল হয়ে যেত। তৃতীয়ত, কেবল এই-ই-নয়, বাংলাকে দু-টুকরো করে লর্ড কার্জন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেছিলেন যে এই ভেদনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকে (supporter) পরিণত করতে পারবেন। চতুর্থত, বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে কার্জন আসামের চা-বাগানগুলির ব্রিটিশ মালিকদের স্বার্থের কথাই বেশি করে চিন্তা করেছিলেন। ওইসব চা-বাগানের ইংরেজ মালিকরা কার্জনকে বোঝান যে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে রেলপথে চট্টগ্রামের বন্দরের সঙ্গে যদি যুক্ত করা হয় তাহলে আসাম থেকে কলকাতা বন্দরে চা আনার খরচ অনেক কমে যাবে। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ ভাইসরয় শুধু ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ সম্পর্কেই বেশি সচেতন ছিলেন।

**১৯০৫ সালের মে মাস থেকেই বঙ্গভঙ্গের এই নতুন পরিকল্পনা কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে বাঙালি জাতি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতির এই সমবেত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। এই ঘোষণার প্রতিবাদে প্রথমে সারা বাংলায় এবং পরে গোটা ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে তা স্বদেশি আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করে।**

**বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)—লর্ড কার্জন বলেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ একটি স্থায়ী ঘটনা। —"The Partition of Bengal is a settled fact" এর কোন নড়চড়**

হবে না। বাংলা তথা ভারতের সেই সময়ের অবিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্জনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন—"I will unsettle the settled fact"—"আমি এই স্থায়ী ঘটনাকে অস্থায়ী করে দেব।" বস্তুত বঙ্গীয় তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। বাংলার তথা ভারতের এই বিক্ষুব্ধ জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন বাংলার "মুকুটহীন রাজা" (uncrowned king) সুরেন্দ্রনাথ। বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন এক প্রবল রূপ ধারণ করেছিল।

সর্বস্তরে আন্দোলনের প্রভাব—১৯০৫-এর ৬ জুলাই কৃষ্ণ কুমার মিত্রের *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বঙ্গের সর্বনাশ' শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ৮ জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে মোঘল বা পাঠান আমলেও বাংলার এত বড়ো সর্বনাশ কখনও হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর *বেঙ্গলি* পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে "বিরাট জাতীয় দুর্দৈব" (A great national disaster) বলে অভিহিত করে লেখেন "আমরা অপমানিত, লাঞ্ছিত, ও প্রতারিত। সরকার যদি এখনও বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মত পরিবর্তন না করেন, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন পথে মোড় নেবে। সারা ভারতে আগুন জ্বলবে।" বাংলার অন্যান্য পত্রিকাগুলি, এমনকি ভারত ও ভারতের বাইরে ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলি যথা—ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান, পাইওনিয়ার, ক্যাপিটল, লন্ডন ডেইলি, টাইমস প্রভৃতিও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি ও সরকারি আমলাতন্ত্র এবং কলকাতা হাইকোর্টও সরকারি হঠকারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এই আন্দোলন কেবল ইংরাজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান, ধনী, দরিদ্র, সাধারণ শ্রমজীবী চাষি, মজুর, জমিদার, ছাত্র ও নারী সমাজও এই আন্দোলনে শামিল হয়। দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দেয়। ম্যাঞ্চেস্টার টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক নেভিনসন এই উন্মাদনাকেই New Spirit বলেছেন। ১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেন—"হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্ব শ্রেণির জনসাধারণ এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। এই বিক্ষোভ কেউ জোর করে তৈরি করেনি। এই বিক্ষোভ স্বতঃফূর্ত ও সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত।" প্রথম পর্যায়ে নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং পরে চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পাল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

## ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান

**১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন) সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড কার্জনের আদেশে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল। সেই দিনই সারা দেশে হরতাল ও অরন্ধন পালিত হল। মা-বোনেরা বঙ্গলক্ষ্মীব্রত গ্রহণ করলেন। জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ অবিভক্ত বাংলার**

অখণ্ড প্রাণসত্তাকে এক সূত্রে গেঁথে দেওয়ার জন্য রচনা করেন "রাখি সংগীত"। তাঁর নেতৃত্বে দেশবাসী গ্রহণ করল রাখিবন্ধন পরিকল্পনা। তাঁর নেতৃত্বেই এক বিরাট মিছিল খালি পায়ে গঙ্গা স্নানে যায়। স্নান শেষে রাখি সংগীতটি গাইতে গাইতে সারা শহর পরিক্রমা করে এবং পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দেয়। রাখি হল ঐক্যের প্রতীক—ভ্রাতৃত্বের প্রতীক—দুই বঙ্গের মিলনের প্রতীক। তারপর পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক বিরাট মিছিল সারিবদ্ধ হয়ে গানটি গাইতে গাইতে পৌঁছে গেল আপার সারকুলার রোড ও গড়পাড় রোডের সংযোগস্থলে। সেখানে অসামান্য পণ্ডিত ও দেশবরেণ্য নেতা আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে ফেডারেশন হলের (মিলন মন্দিরের) ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হল। অনুষ্ঠান শেষে পঞ্চাশ হাজার মানুষের সেই বিশাল জনসমুদ্র এগিয়ে চলল বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে। পুরোভাগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবির সুরে সুর মিলিয়ে সেই বিশাল জনতা গান ধরেছিল—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান,
তুমি কি এমনি শক্তিমান?
আমাদের ভাঙ্গা-গড়া, তোমার হাতে, এমন অভিমান,—
তোমাদের এমনি অভিমান?

গানটির শেষে ছিল—

আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে,
বোঝা তোর ভারী হলেই, ডুববে তরীখান—
তোমাদের এমনি অভিমান?

প্রথম গানটি শেষ হলেই বিশাল জনসমুদ্র দ্বিতীয় গানটি ধরেছিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে—
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

তারপর পশুপতি বসুর বাড়িতে পৌঁছে সেই বিশাল জনসমুদ্র মিলিত কণ্ঠে আবার গাইতে শুরু করল রাখি সংগীত—

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—হে ভগবান।

গানটির শেষে ছিল—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই-বোন—
এক হউক—এক হউক—এক হউক হে ভগবান।

বাস্তবিকই কবি সেদিন সারা বাংলায় এক অভাবনীয় প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত গানে ও কবিতায়, সুরে ও কণ্ঠস্বরে সেদিন যে কী উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ কল্পনা করাও বেশ কঠিন ব্যাপার। অনুষ্ঠান শেষে মাত্র এক ঘণ্টায় জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

**স্বদেশি আন্দোলনের কার্যক্রম** ঃ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলনে তিনটি কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। (১) স্বদেশি, (২) বয়কট এবং (৩) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বয়কটের মাধ্যমে জাতি বিদেশি সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে। আর স্বদেশির মাধ্যমে জাতি মেতে ওঠে সৃষ্টির আনন্দে। এক কথায় স্বদেশি ও বয়কট হল একই অস্ত্রের দুটি দিক। স্বদেশি হল ইতিবাচক বা গঠনমূলক। আর বয়কট হল নেতিবাচক। জাতীয় শিক্ষা হল সকল বিদেশি প্রভাব বর্জন করে জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

**Doctrine of Passive Resistance** ঃ ১৯০৭ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল *বন্দেমাতরম্* পত্রিকায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' শিরোনামায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় অরবিন্দ ঘোষ বিদেশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও আইন-ব্যবস্থা বর্জন করে সম্পূর্ণ দেশীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে ওইসব প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান জানান। তাঁর হাতে স্বদেশি ও বয়কটের আদর্শ এক সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত হয়।

**বয়কট** ঃ সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কৃষ্ণ কুমার মিত্র সম্পাদিত *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক বয়কটের কথা ঘোষণা করা হয়। বয়কট মন্ত্র প্রচারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আন্দোলনের প্রথম পর্বে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৬ জুলাই খুলনা জেলায় বাগেরহাট শহরে এক বিরাট জনসভায় বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১ জুলাই দিনাজপুরের মহারাজের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় বয়কটের এগারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সব প্রস্তাবে বলা হয়, সমস্ত অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা বোর্ড, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা পদত্যাগ করবেন এবং আগামী এক বছর কাল জাতীয় শোক পালিত হবে। পরে কলকাতা, ঢাকা, বীরভূম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং সমগ্র বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**ছাত্র ও নারী সমাজ** ঃ বয়কট আন্দোলন সফল করতে ছাত্ররা পরম উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিল। জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের মতে তারা ছিল এই আন্দোলনের স্ব-নিয়োজিত প্রচারক (self-appointed missionaries)। সমস্ত রকম বিদেশি দ্রব্য বর্জন, বিদেশি পণ্যের দোকানের সামনে পিকেটিং অথবা বিদেশি পণ্যে অগ্নি সংযোগ করে তারা ব্রিটিশ শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

বাংলার নারীসমাজ সেদিন মিহি বিলাতি শাড়ি ছেড়ে মোটা তাঁতের শাড়ি ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। তাঁরা সেদিন কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলেছিলেন এবং রান্নাঘরে বিদেশি চিনি, লবণ ও অন্যান্য মশলার প্রবেশ বন্ধ করেন। ওড়িয়া পাচকরা বিদেশি পণ্য রান্নায় ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। মুচিরা বিদেশি জুতো মেরামত করতে রাজি হয়নি। এমনকি ছয় বছর বয়েসের ছোটো রুগ্‌ণ মেয়ে পর্যন্ত বিলাতি ওষুধ খেতে রাজি হয়নি। ধোপারা বিদেশি কাপড় কাচতেও রাজি হয়নি। বাস্তবিকই বয়কট হয়েছিল একেবারেই সর্বাত্মক।

এই প্রথম বাংলার মেয়েরা পর্দা ত্যাগ করে পিকেটিং ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন—সরলাদেবী চৌধুরানী, হেমাঙ্গিনী দাশ, লীলাবতী মিত্র, কুমুদিনী বসু, সুবালা আচার্য ও নির্মলা সরকার। আর পুরুষেরাও বিদেশি ভাষা, খেতাব, আইন-আদালত, আইনসভা ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান থেকেও পদত্যাগ করেছিলেন।

**কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ঃ** কৃষক ও শ্রমিকরা এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ না দিলেও নেতারা অবশ্যই শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ড. সুমিত সরকারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে যেসব শ্রমিক ধর্মঘট হয় স্বদেশি নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেন। ওই সময় শ্রমিক নেতা হিসেবে তিন ব্যারিস্টার—অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুসুম রায় চৌধুরী ও অপূর্ব কুমার ঘোষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রেল শ্রমিকদের আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ নেতারা যোগদান করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিলকের গ্রেপ্তার ও মান্দালয়ে নির্বাসনের পর বোম্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলন ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল।

**মুসলিম সমাজ ঃ** হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হলেও বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলিম ও অশিক্ষিত কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোশিয়েশানের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করা হয়। আবুল হালিম গজনভি ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স খুলে যশস্বী হন। মৌলবি মুজিবর রহমান *দ্য মুসলিম* নামের পত্রিকা প্রকাশ করে সকলকে সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। ময়মনসিং, বরিশাল ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে মসজিদে মসজিদে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়। ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ দিতে আব্দুল রসুল বলেন, "হিন্দু ও মুসলমান আমাদের উভয়ের একই মাতৃভূমি—বাংলাদেশ।"

**স্বদেশি ঃ** স্বদেশি ছিল বয়কটেরই পরিপূরক। বিলাতি বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশির বিস্তার চলতে থাকে। বলাবাহুল্য, ১৯০৫ সালের আগে আমেরিকা, আয়ারল্যান্ড ও চিনের সংগ্রামীরা এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের বহু আগেই মহারাষ্ট্রে

গোপাল রাও দেশমুখ, জি. ডি. যোশী, এম. জি. রানাডে, এবং উত্তব ভারতে স্বামী দয়ানন্দ, বাংলায় রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা স্বদেশির আদর্শ প্রচার করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশির আদর্শকে এক নতুন তাৎপর্য দান করেছিল।

**দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঃ** স্বদেশির প্রেরণায় এই সময় দেশে বহু নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গলক্ষ্মী মিল ও মোহিনী মিল। হাওড়া ও ধনেখালিতে তাঁতিরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের তাঁত শিল্প ও মিলগুলিতে নবজীবনের সূচনা হয়। স্বদেশি মূলধনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংক, ইনসিওরেন্স অফিস ও জাহাজ কোম্পানি এবং সাবান, চিনি, গুড়, চামড়া, দেশলাই এবং ওযুধ কোম্পানি গড়ে উঠতে থাকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল কেমিকেলস। ডাঃ নীলরতন সরকার জাতীয় সাবান কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হয় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ নামে দেশীয় হাসপাতাল। পাঞ্জাবে গড়ে ওঠে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। মাদ্রাজে স্থাপিত হয় স্বদেশি জাহাজ কোম্পানি। জামশেদজি টাটা জামশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশির বিস্তারের জন্য ব্রতী সমিতি, বন্দেমাতরম সম্প্রদায়, সন্তান সম্প্রদায়, স্বদেশ বান্ধব সমিতি, সুহৃদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশি দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য বাংলার শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে বহু স্বদেশি দোকান খোলা হয়। সরলাদেবী চৌধুরানী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশি আদর্শ সফল করতে ছাত্র ও যুবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বদেশি পণ্য বিক্রি করে আসত। এই কাজে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি (১৯০২) এবং অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটির (১৯০৫) ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়।

**সাহিত্য-সংস্কৃতি ঃ** স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় এক নতুন জোয়ার আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অক্ষয় কুমার মৈত্র ও মুকুন্দ দাশ তাঁদের জাতীয়তাবাদী সৃষ্টির মাধ্যমে সারা দেশে দেশপ্রেমের প্লাবন বইয়ে দেন। ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদার প্রমুখের শিল্প চেতনায় ও শিল্প কার্যে স্বদেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞান চর্চা ও শিল্প ক্ষেত্রেও যুগান্তর ঘটে যায়।

**জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ** ছাত্রদের বিরুদ্ধে দমননীতির বাড়াবাড়ি নেতাদের জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপনে বাধ্য করে। জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে জাতীয় বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সুবোধচন্দ্র মল্লিক, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং আরও লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর দানে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ন্যাশানাল মেডিকেল স্কুল ও বিজ্ঞান কলেজ প্রভৃতি।

জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য স্থাপিত হল National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

স্বদেশি আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমিতির মাধ্যমে। জেলায় জেলায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে একে গণ-আন্দোলনে পরিণত করেছিল। পূর্ববঙ্গ ছিল আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি। বিশেষত বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে যে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন তার ১৫৯টি শাখা জেলার অভ্যন্তরেও স্বদেশি আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল চারণ কবি মুকুন্দ দাশের যাত্রাপালা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে।

**বাংলার বাইরে আন্দোলনের প্রসার ঃ** স্বদেশি আন্দোলন বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতে বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাংলার বাইরে আন্দোলন প্রসারে বাল গঙ্গাধর তিলকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে স্বরাজের দাবিতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার সম্ভাবনা। বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির নেতৃত্বে এই আন্দোলন ক্রমশ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

**সরকারি দমননীতির স্বরূপ ঃ** দমননীতির মাধ্যমে নেতাদের বিনা বিচারে আটক ও নির্বাসন দেওয়া শুরু হয়। তিলকের ছয় বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ১৯০৮ সালে মান্দালয়ে নির্বাসিত করলে বোম্বাই-এর কয়েক লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। ২৬ জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষে শ্রমিকদের এই প্রথম ধর্মঘট।

**ছাত্রদের বিরুদ্ধে দমন ও পীড়ন ঃ** ছাত্রদের বিরুদ্ধেও কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯০৫-এর ১০ অক্টোবর বাংলার মুখ্যসচিব কার্লাইল ছাত্র আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনামা জেলা প্রশাসনগুলিতে পাঠিয়ে দেন। এটিই ইতিহাসে কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলার নামে পরিচিতি লাভ করে। সারকুলারটিতে বলা হয় যে, যেসব স্কুলের ছাত্ররা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সেইসব স্কুলের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হবে এবং সব রকম সরকারি সাহায্যও বন্ধ হয়ে যাবে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে অন্যরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। একুশে অক্টোবর শিক্ষা অধিকর্তা কলকাতার অধ্যক্ষদের পিকেটিং-এ লিপ্ত ছাত্রদের বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব লায়ন (Lyon) আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্ররা সরকারি পদ লাভের অযোগ্য বিবেচিত হবে বলে ঘোষণা করেন। বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

**সরকারি তোষণনীতি ঃ** সরকার এক দিকে দমননীতি আর অন্যদিকে ১৯০৯-এর মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তন করে আন্দোলন ব্যর্থ করতে চেষ্টা করে। নরমপন্থী নেতারা

ও মুসলিম লিগ ১৯০৯-এর সংস্কার গ্রহণ করলেও চরমপন্থী নেতৃত্ব মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রত্যাখ্যান করেন। দমননীতির ফলে আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ বা Revolutionary Terrorism.

**স্বদেশি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার কারণগুলি ঃ** কয়েকটি কারণে ১৯০৮ সালের পর স্বদেশি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। প্রথমত, তোষণনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার নরমপন্থী কংগ্রেসীদের আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদেরও মূল স্রোত থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল ইংরেজ শাসকরা। তৃতীয়ত, প্রথম দিকের আবেগ ও উদ্দীপনা হারিয়ে গেলে গ্রাম্য কৃষক ও সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। গবেষক ড. সুমিত সরকার বলেছেন সুনির্দিষ্ট কৃষি-ভিত্তিক কর্মসূচির অভাবে গ্রাম্য কৃষকরা আশাভঙ্গ হয়েছিল। চতুর্থত, আন্দোলনের নেতাদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন বলেও তাদের হতাশা বেড়ে যায়। তাছাড়া আন্দোলনের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ঝোঁকটাই ছিল আন্দোলনের প্রধানতম দুর্বলতা। ফলে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। এই সুযোগে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল নিখিল ভারত মুসলিম লিগ। তাছাড়াও ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করে কুচক্রী সরকার জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়নি। শেষপর্যন্ত সরকার আন্দোলনকারীদের মূল দাবি মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ settled fact unsettled হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কুচক্রী ইংরেজ একই সঙ্গে আবার বাঙালিদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে দিয়েছিল।

**মূল্যায়ন ঃ** কার্জন চেয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালিদের দুর্বল করে দেওয়া এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু কার্জনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আবার বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি—"স্বরাজ" লাভ করা যায়নি। তাছাড়া বাঙালি জাতির গুরুত্ব ও প্রভাব নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে দিয়ে। তবে এসব সত্ত্বেও বঙ্গভবিরোধী আন্দোলন ভারতের রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

**প্রভাব ঃ প্রথমত, স্বরাজের দাবিতে নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের এটিই হল প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এতদিন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন সমাজের ওপরের স্তর ছাড়িয়ে নীচুতলার স্তরে প্রসারিত হয়ে যায়।**

**দ্বিতীয়ত,** স্বদেশি আন্দোলনের শুরুতে নেতৃত্ব ছিল নরমপন্থীদের হাতে। তবে নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি বা ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের চেতনা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জন্ম নিল চরমপন্থী গোষ্ঠী। শেষপর্যন্ত ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

**তৃতীয়ত,** আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ শাসকরা অত্যন্ত কঠোর দমন ও পীড়নের আশ্রয় নেয়। যার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভব হয়েছিল বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের। ফলে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছিল ভারতের চারদিকে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন লোকমান্য তিলক। তারপরই উল্লেখ করতে হয় অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পালের কথা।

**চতুর্থত,** সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবের কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। স্বদেশি ভাবধারায় রচিত হতে থাকে একের পর এক নাটক, গান, কবিতা, উপন্যাস ও যাত্রাপালা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত প্রমুখের রচনা। চারণ কবি মুকুন্দ দাশের স্বদেশি গান দেশপ্রেমের জোয়ার এনে দিয়েছিল গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র।

**পঞ্চমত,** এই স্বদেশি আন্দোলনের ফলেই সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনেরও একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। সব জায়গায় না হলেও কোন কোন জায়গায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

**ষষ্ঠত,** আন্দোলনের সময় দেশীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, তার উদ্যোগে শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল', 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ', 'বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট' প্রভৃতি। বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটই পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও আরও কয়েকটি জাতীয় স্কুল বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

**সপ্তমত,** আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়েছিল। হার মানতে হয়েছিল সসাগরা পৃথিবীর সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেনকে।

**আন্দোলনের কয়েকটি দুর্বলতা—স্বদেশি আন্দোলনের কয়েকটি দুর্বলতার কথা এখানে না উল্লেখ করা অন্যায় হয়ে যাবে। আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাই ছিল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদিতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। আন্দোলনের নেতৃত্বে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য—'গণপতি উৎসব', 'শিবাজী উৎসব', ও 'রাখীবন্ধন' প্রভৃতি হিন্দু আচার অনুষ্ঠান আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ও আকর্ষণ অনেক স্তিমিত করে দিয়েছিল।**

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল গঙ্গা স্নান, অরন্ধন ও রাখি বন্ধনের মাধ্যমে। ফলে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কাজে কাজেই তারা আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া আন্দোলনেব কর্মসূচির মধ্যে আরও একটি দুর্বলতা ছিল। তা হলে গ্রাম্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির একান্ত অভাব। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশ বান্ধব সমিতি সীমিত ক্ষেত্রে তেমন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তা সর্বত্রগামী হতে পাবেনি।

কিছু কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বদেশি আন্দোলনকে আবেদন-নিবেদন-ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি থেকে মুক্ত করে গণআন্দোলনে পরিণত কবে দিযেছিল। পরিশেষে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বদেশি আন্দোলনের জন্যই বাংলার তাঁত, রেশমশিল্প ও অন্য কিছু কিছু কারিগরি শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

আসল কথাটা এবার বলা যাক। ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলন, ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন—তিনটি আন্দোলনের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল? কবিব মতে অবশ্যই স্বদেশি আন্দোলন। বেশ কিছু আধুনিক ঐতিহাসিকরা কবির মতকেই সমর্থন জানিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং গান্ধীজি পর্যন্ত স্বীকার কবেছেন যে স্বদেশি আন্দোলনই পরবর্তীকালের সব আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। তাই অবাক বিস্ময়ে কবি লিখেছিলেন—

কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি—
এক তারে কভু ছিলো না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে—
সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।

## একুশ

# স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিমন্যু ঃ বাঘা যতীন

আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন এক বিরাট পুরুষ, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আবার তাঁরই মধ্যে লুকিয়ে ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও মানবদরদী এক মহামানব। সরকারি চাকুরে হয়েও কীভাবে যে তিনি বিপ্লবের কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতেন, কিংবা অতি সন্তর্পণে বা গোপনে একের পর এক গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতেন, এবং নিজের ও সহ-বিপ্লবীদের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা, বোমা বানানো ও ছোঁড়ার কৌশল এবং রিভলভার ও রাইফেল চালনায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করতেন তা শুনলে বাস্তবিকই অবাক হয়ে যেতে হয়। যাঁর শরীরে ছিল সিংহের মতো শক্তি, হাত দুটি ছিল লোহার মতন শক্ত। তাঁরই অন্তরটি ছিল বাঙালি মায়ের মতনই স্নেহের ফল্গুধারা। তাছাড়াও বিপ্লবী জীবনের চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মাঝেও তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন অতুলনীয় এক সাহিত্যপিপাসু মন। যা দেখা গিয়েছিল একমাত্র মুঘল সম্রাট বাবরের চরিত্রে। বাবর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধ শিবিরে বসেই কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনী বা বাবরনামা বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বই যতীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে তিনি নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে যেতেন। প্রায়ই দেখা যেত অবসর মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তাঁর অতি প্রিয় দুটি লাইন তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করছেন—

ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি, সৌরভে আকুল?

### বাল্য পরিচয়

কুষ্ঠিয়া জেলার কয়াগ্রামে জন্ম হয় যতীন্দ্রনাথের। ছোটো বয়সে নাম ছিল "জ্যোতি"। বাবার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মা শরৎশশী দেবী। বড়ো দিদির নাম বিনোদবালা দেবী। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যতীন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম ইন্দুবালা দেবী। তাঁর ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম তেজেন্দ্রনাথ ও কন্যার নাম আশালতা দেবী।

কয়াগ্রামে 'নবজাগরণ' সভা বসত। শিলাইদহ থেকে কয়াগ্রামে তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওই নবজাগরণের সভায় যোগ দেবার সময়ে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি নতুন যা কিছু কবি শোনাতেন তাই জ্যোতির মাথায় ঘুরে বেড়াত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে।

## বুড়ি ও যতীন্দ্রনাথ

ছেলেবেলা থেকেই যতীন্দ্রনাথের নানান সৎগুণে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। একবার যতীন্দ্রনাথ খেয়া পার হয়ে কুষ্টিয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন সন্ধে প্রায় নেমে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এক বুড়ি বলে উঠল তুলে দাওনা বাছা। যতীন এগিয়ে গেলেন বুড়ির দিকে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলেন যে একটি বুড়ি তার ঘাসের বোঝাটা তার মাথায় তুলে দিতে সবাইকে অনুরোধ করছে। কিন্তু বোঝাটায় এত জল আর কাদা লেগেছিল যে ইচ্ছে থাকলেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছিল না।

যতীনকে দেখে বুড়িটা বলল—সাহেব বাবু, ঘাসের বোঝাটা আমার মাথায় তুলে দাও না বাছা। সাঁজ হয়ে গেল যে।

যতীন সেদিন দামি সাহেবি পোশাক পরে অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন। সন্ধে হয়ে গেছে দেখে বুড়িটা অসুবিধেতে পড়ে যাবে বুঝে যতীন এগিয়ে এলেন এবং ঘাসের বোঝাটা মাটি থেকে তুলে নিলেন। তুলে নিয়েই বুঝলেন বোঝাটা এত ভারী যে এই বোঝা তো বুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই বুড়িকে বললেন—চল এত বড়ো আর ভারী বোঝাটা আমিই তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। যতীনের কোট-প্যান্ট জল ও কাদা লেগে নোংরা হয়ে গেল। কিন্তু যতীন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। আর বুড়ি তখন লজ্জায় কেবল 'ইয়া আল্লা'—'ইয়া আল্লা' বলতে বলতে যতীনের পেছন পেছন চলতে লাগল। তারপর বাড়ি পৌঁছে বুড়ির হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে যতীন ফিরে গেলেন।

## শুধু ছুরি নিয়ে প্রায় খালি হাতে বাঘ মেরেছিলেন

যতীনের ছেলেবেলা থেকেই সকলে বুঝেছিলেন যে যতীন সাধারণ মানুষ নয়। সে অনায়াসে একদিনে ষাট-সত্তর মাইল সাইকেলে ঘুরে আসতে পারে। চলন্ত ট্রেন থেকে হাসতে হাসতে লাফিয়ে নেমে পড়তে পারে। বন্দুক, রিভলভার ও পিস্তল চালানোয় তাঁর জুড়ি ছিল না। আর ঘুঁসির জোরের কথা বলার কোনো অপেক্ষাই থাকে না।

একদিন বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হওয়ায় যতীন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন। এদিকে সেইদিন সকালেই কলুপাড়া থেকে কয়েকজন লোক এসে বলে গেছে যে কদিন ধরে একটা বাঘ বেশ উৎপাত করে যাচ্ছে। কদিন ধরেই গোয়াল থেকে গোরু মেরে নিয়ে যাচ্ছে। যতীনদাদা যাতে ওটাকে মারার ব্যবস্থা করেন সেজন্যই আমরা তাঁকে ডাকতে এসেছি। যতীন্দ্র অনেক রাত্রে ফিরেছেন বলে ওঁর মামাতো ভাই যতীনকে না ডেকে নিজেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন। একটু আগে একটা বেতবনের কাছে বাঘটাকে ঘুমোতে দেখেছে অনেকে। তাই দল বেঁধে সকলেই চলল সেই বেতবনের কাছে। মানুষের আসা-যাওয়া ও কথা-বার্তার আওয়াজ শুনে বাঘটার ঘুম ভেঙে যায়। সে তখন রাস্তা দিয়ে দৌড়োতে থাকে। যতীনের মামাতো ভাই ফণীন্দ্র তখন বন্দুকের গুলি চালায়। কিন্তু নিশানা

ঠিক না হওয়ায় গুলিটা বাঘের গায়ে একটা আঁচড় কেটে বেরিয়ে যায়। ক্ষেপে গিয়ে বাঘটা রাস্তার ওপর দিয়ে আরও জোরে দৌড়োতে থাকে। ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে সব কিছু শুনে যতীন্দ্রনাথ একটা ছুরি নিযে একটা দাঁতন কেটে নিয়ে দাঁতন করতে করতে কলুপাড়ার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

একটু এগোতেই হৈ চৈ শুনতে পেয়ে যতীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে বাঘটাকে দেখা গেছে। এমন সময় দেখতে পেলেন বিরাট একটা জনতার সামনে যতীনের দাদা বন্দুক বাগিয়ে ওঁর দিকেই ছুটে আসছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঝোপ থেকে একটা বিরাট বাঘ যতীনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। যতীন তখন তৈরিই ছিল না। তবু সে তখন এক ঝটকায় বাঘটাকে ফেলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা দুই থাবা দিয়ে যতীনের কাঁধটা চেপে ধরে ওঁর টুঁটিটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করল। যতীন সঙ্গে সঙ্গেই তার লোহার মতো শক্ত দুই হাত দিয়ে বাঘের গলাটা এমনভাবে চেপে ধরল যাতে তার মুখটা যতীনের গলা পর্যন্ত পৌছোতে না পারে।

যতীনের গায়ে সিংহের শক্তি। তাই বাঘটা কিছুতেই ওঁর গলা কামড়াতে পারল না। ততক্ষণে দলের সকলে ওঁব কাছে চলে এসেছে। কিন্তু গুলি করতে পারছে না, পাছে গুলি যতীনের গায়ে লেগে যায়। এদিকে যতীন আর বাঘটাব মধ্যে তখন জোর লড়াই শুরু হয়ে গেল। একবার বাঘটা ওপরে উঠে আসেছ। পরক্ষণেই যতীন ওপরে উঠে আসছে। হঠাৎ যতীনের মনে পড়ে যায় তার পকেটে ছুরি আছে একটা। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে বাঘের গলাটা চেপে রেখে অন্য হাতে ছুরিটা বের করে নেয় ও দাঁত দিয়ে খুলে ফেলে। তারপর কালবিলম্ব না করে ছুরিটা বাঘের গলায় বসিয়ে দেয়। তারপর পাগলের মতো যতীন অবিরত বাঘটাকে ছুরি দিয়ে মারতে থাকে। বাঘটাও যতীনকে ছেড়ে না দিয়ে তার থাবা দিয়ে যতীনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত অবিরত ছুরির ঘায়ে বাঘটাই মবে যায়।

তখন জনতার সকলেই ছুটে এসে যতীনকে মাটি থেকে তুলে ধরে। যতীনের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। অঝোরে রক্ত ঝরছে। তবুও মুখে হাসি তাঁর। তারপর তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে নিয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। অনেকদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে দেশবাসী তাঁর নাম দেয়—"বাঘা যতীন"।

## যতীন্দ্রনাথ ও আটজন ইংরেজ গোরা

**একবার এক বাঙালি যুবক সরকারি কাজে দার্জিলিং যাচ্ছিল। শিলিগুড়িতে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল তখন। ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে এমন সময় যুবকটি শুনতে পেলেন— একটু জল দাও খুব তেষ্টা পেয়েছে। ক্ষীণ কণ্ঠে একজন অসুস্থ মহিলা জল চাইছেন। তা শুনে যুবকটি আর থাকতে পারলেন না। অসুস্থ ভদ্র মহিলার স্বামীর হাত থেকে একটা**

ঘটি নিয়ে এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে জল আনার জন্য দৌড় দিলেন। কারণ গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, জলের জায়গাটাও প্ল্যাটফরম থেকে অনেক দূরে। যুবকটির তাই ওই সময় দিক-বিদিক জ্ঞান ছিল না। একদিকে আটজন ব্রিটিশ গোরা পল্টন প্ল্যাটফরমের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছিল। তাড়াতাড়িতে যুবকটি একজন পল্টনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলেন। তবে একটু থেমে যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে I am sorry বলে মাফ চেয়ে নেন।

ইংরেজদের তখন দারুণ দাপট, কেননা সসাগরা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটারই তারাই মালিক তখন। আমরা তাদের প্রজা বলে তারা আমাদের মানুষ বলে গণ্যই করত না। আর তাই যুবকটির ক্ষমা চাওয়ার কোনো মূল্যই দিল না সেই গোরা পল্টনটি। সে করল কী যুবকটিকে Dam Native বলে গালাগালি দিয়ে তার হাতের ছড়িটা দিয়ে যুবকটির পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল। অপমানে যুবকটির চোখ-মুখ দিয়ে রাগে আগুন বেরোতে লাগল। কিন্তু তখন কিছু না বলে মহিলাটির জন্য জল আনতে চলে গেলেন। কারণ অসুস্থ মহিলাটির জন্য জল আনাই ছিল অনেক বড়ো কর্তব্য। তবে সেই গোরা পল্টনটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলেন চিনে রাখার জন্য।

জল নিয়ে ফিরে এসে মহিলার স্বামীর হাতে ঘটিটা তুলে দিয়েই ছুটে চলে গেলেন সেই গোরা পল্টনদের কাছে। তারপর যে গোড়া পল্টনটা ছড়ি দিয়ে মেরেছিল তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—এবার একবার শেষ বারের মতো ঈশ্বরের নাম নাও। বলেই প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁসি মেরে বসলেন সেই গোরা সায়েবটার নাকের ওপর।

My God! বলে সায়েবটা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর তার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল।

ওই গোরাটার অবস্থা দেখে বাকি সাতজন গোরা যুবকটিকে চারদিক থেকে মহাভারতের অভিমন্যুর মতো ঘিরে ফেলে যুবকটিকে মারতে গেল। যুবকটি তখন বেপরোয়া ঘুঁসি চালাতে লাগলেন। কারুর নাকে—কারুর চোখে—কারুর রগে—কারুর চোয়ালে। কিছুক্ষণ ধরে শুধু দুম-দাম ঘুঁসি চলতে লাগল। একদিকে আটজন গোরা পল্টন অন্যদিকে এক অভিমন্যু যুবক। বাঙালি যুবকের ঘুঁসির জোরে যে এরকম হতে পারে তা ওই গোরা পল্টনদের ধারণারই বাইরে ছিল।

ব্যাপার দেখে খুব ভিড় জমে গেল। ট্রেনের জানালাগুলো থেকে অসংখ্য মুখ বেরিয়ে এল কী হচ্ছে তা দেখতে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল কী ওই একজন ভারতীয় যুবকের কাছ থেকে মার খেয়ে ওই আটজন ইংরেজ গোরা পল্টনই মাটিতে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল। অথচ ওই ভারতীয় যুবকটি তখনও পর্যন্ত প্রায় অক্ষত অবস্থায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যুবকটিকে ধরতে স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন।

নির্ভীক যুবকটি স্টেশন মাস্টারকে বললেন—"আমি সরকারি কাজে দার্জিলিং যাচ্ছি। এই দেখুন আমার কার্ড আর দার্জিলিং-এর ঠিকানা। আপনি আমায় কোনমতেই আটকাতে

পাবেন না। ওই জানোয়ারগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি। ওই জানোযারগুলোকে বলবেন একটু ভদ্র, সভ্য হতে আর আমার নামে মামলা রুজু করতে।" এই কথাগুলো বলেই যুবকটি গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

স্টেশন মাস্টার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো কার্ডটার ওপরে লেখা নামটা পড়লেন। দেখলেন লেখা রয়েছে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বুঝতেই পারলেন যে ইনি আর কেউ নন, ইনিই মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, যাঁকে সবাই বাঘা যতীন নামে চেনে। এঁর কথা শুনলে বা ভাবলে আমাদের মহাভারতের অভিমন্যুর গল্প সত্যি বলে বিশ্বাস করতে আর এতটুকু অসুবিধা হয় না।

আমার প্রিয় পাঠকবর্গ। তোমরা হয়তো অনেকেই শুনেছো বা বইতে পড়েছো— আলেকজান্ডার, বানা প্রতাপ, শিবাজি, নেপোলিয়ন বা গ্যারিবল্ডির কথা। ওঁরা যে ধরনের বীর ছিলেন, আমাদের যতীন্দ্রনাথও অনেকটা সেই রকমের বীর ছিলেন। তাঁর শরীর ও মনের শক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতেন। মহান বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষই বলেছিলেন— "যতীনই শেষপর্যন্ত ভাবতে বিপ্লব ঘটিয়ে স্বাধীনতা আনতে পারবে। ওকে যেন সবাই নেতা বলে মেনে নেয়।"

পাঠকরা নিশ্চয় যতীন্দ্রনাথ বনাম আটজন গোরা পল্টন মামলার কী হয়েছিল শেষপর্যন্ত তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন? উৎসুক হয়ে থাকারই তো কথা। তবে শুনুন।

যতীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ ফিরে আসার কদিন পরে আদালতের সমন পেলেন। সমন পেয়েই যতীন্দ্রনাথ তাঁর ওপরওয়ালাকে সেটি দেখালেন। ওপরওয়ালা মি. হুইলার সাহেব সেটি দেখেই সামরিক বিভাগের বড়ো কর্তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—"ওদের মামলা তুলে নিতে বলুন। লজ্জা করে না আটজন ইংরেজ একজন বাঙালির হাতে মার খেয়েছে। মুখ দেখাবে কী করে? আমরাই বা মুখ দেখাব কী করে?"

শেষপর্যন্ত আর মামলা করা যায়নি। মানে মানে মামলা তুলে নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ গোরাদের মার হজম করতে হয়েছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের কিছু আগে থেকেই তিনি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এবং প্রায় সকলেরই অজান্তে নিজেকে বিপ্লবের কাজে সঁপে দেন। যতীন ওই সময় ২৪-পরগনা, হুগলি, নদিয়া, যশোহর ও খুলনায় বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে থাকেন। সে-যুগে তাঁর মতো নেতা বোধহয় কেউই ছিলেন না। তাঁর নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের পর থেকে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলোর মন্ত্র হয়েছিল এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে পটাশিয়াম সায়ানাইডের বিষ। অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের গুলি করেই বিষ মুখে দিতে হবে, বেঁচে থাকা চলবে না কিছুতেই। তাহলে বিপ্লবীরা ধরা পড়ে যাবে, মাঝপথে বিপ্লব নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মঘাতী সৈনিকদের-সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বলে কিছু থাকবে না। দেশ উদ্ধারের ব্রত নিয়ে তাদের সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে হবে।

## দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যা

মানিকতলা বোমার মামলায় ১৯০৮ সালে যখন সব নেতারা ধরা পড়েন তখন একমাত্র যতীন্দ্রনাথই ধরা পড়েননি। কেউ বুঝতেও পারেননি যে তিনি বাইরে থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছিল বিশ্বাসঘাতক দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জীকে। এই দেশদ্রোহী দারোগাই পুরস্কারের লোভে প্রফুল্ল চাকীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। যতীন্দ্রনাথ একদিন এক চেলাকে বললেন নন্দলালকে মৃত্যুদণ্ড দাও।

শেয়ালদার কাছে সার্পেনটাইন লেন থেকে বেরিয়ে একদিন নন্দলাল ব্যানার্জী ডাকবাক্সে একটা চিঠি ফেলতে যাচ্ছিলেন। তখন সন্ধে নেমে এসেছে। পেছন থেকে শোনা গেল রিভলভারের গর্জন—গুড়ুম। নন্দলাল মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে শুধু বলতে পেরেছিল নিজের নাম ও বাড়ির ঠিকানা। তখন সেই বিপ্লবী ছেলেটিই নন্দলালের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন নন্দলাল ব্যানার্জীর কী হয়েছে দেখে আসুন।

এরপর যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড হল আশু বিশ্বাসের, মানিকতলা বোমার মামলায় যিনিই ছিলেন সরকারি পক্ষের উকিল। ইনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করেছিলেন। চারু বসু নামে এক বিপ্লবী তাঁকে গুলি করে মেরেছিলেন। এর পর এল সামশুল আলমের গুলি খেয়ে মরার পালা। সামশুল ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপার। অত্যাচারী শাসক হিসেবে তিনি ইংরেজ শাসকদেরও টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। একবার পিপাসার্ত এক বিপ্লবী জল খেতে চাইলে আলম সেই বিপ্লবীর মুখে প্রস্রাব করে দিয়ে বলেছিলেন—"এই নে জল খা।" মানিকতলা বোমা মামলায় আটক বহু বিপ্লবীকে তিনি ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিলেন। বিপ্লবীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপতির সামনেই আলমকে লক্ষ করে গান ধরতেন—

ওহে সামশুল!
তুমি সরকারের শ্যাম—আমাদের শূল!
কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু—
তুমি দেখবে চোখে সরষে-ফুল!
ও-হে-সাম-শুল।।

কিন্তু সামশুলকে কিছুতেই বাগে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত ঘুঘু। পুলিশ ও সেপাই অষ্টপ্রহরই তাঁকে ঘিরে থাকে। বাড়ি থেকে অন্য সময় বেরোন না তিনি। যতীন্দ্রনাথ বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। কে পারবে এই ঘোড়েল ও সর্বজননিন্দিত পুলিশ অফিসারটিকে পরলোকের পথটি চিনিয়ে দিতে? শেষে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ঢাকার বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত তাঁকে অভয় দিলেন। বললেন—দাদা আমায় একবার দায়িত্ব দিয়ে দেখুন না। তাই হল।

তারিখটা ছিল ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি। বীরেন্দ্র ও তাঁর এক বিপ্লবী বন্ধু দুপুববেলা হাইকোর্টে গেলেন। সহকর্মীটি দূর থেকে সামশুল আলমকে চিনিয়ে দিলেন। বীরেন্দ্র আদালতকক্ষের বারান্দায় অপেক্ষায় রইলেন। এমন সময় সামশুল একটা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন। বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত তাঁর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি মি. সামশুল আলম? হ্যাঁ! বললেন সামশুল আলম।

আপনার একটা চিঠি আছে। এই কথা বলে বীরেন্দ্র পকেট থেকে চিঠির বদলে বের করলেন সামশুলের যম—একটা রিভলভার। তারপরই গুড়ুম। একেবারে বুকে ঠেকিয়ে ধবে গুলি করলেন বীরেন্দ্র। ওতেই শেষ। সিঁড়ির ওপরই লুটিয়ে পড়লেন সামশুল। খুন খুন বলে তখনই চিৎকার উঠে গেল চারদিকে। পুলিশ আর্দালিরা বীরেনকে ধরতে তখুনি ওর পেছন ছুটে গেল। বীরেন গুলি চালাতে চালাতে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ধরা পড়ে গেল।

পুলিশ প্রথমে ভালো ব্যবহারের সঙ্গে অত্যাচার মিশিয়েও বীরেনের কাছ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। পরে অমানুষিক থার্ড ডিগ্রি অত্যাচার চালিয়ে তার কাছ থেকে যতীন্দ্রনাথের নামটা শুধু বের করে নিতে পেরেছিল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই যতীন্দ্র হঠাৎ গ্রেফতার হলেন। তবে অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় মুক্তি পেয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আর এক সাংঘাতিক অভিযোগ উঠল। তিনি নাকি সৈন্যদলের জাঠ বাহিনীতে বিদ্রোহে উৎসাহ দিচ্ছেন। ইংরেজ শাসকরা ভয়ে জাঠ বাহিনীটাই ভেঙে দিলেন।

১৯১২-১৩ সালে যতীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে লেগে গেলেন। ঠিক করলেন ভারতের সব দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবেন তিনি। আরও ঠিক করলেন যে, বড়ো বড়ো ইংরেজ শাসকদের অর্থাৎ লাটসাহেবদের মেরে এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে হবে যে ইংরেজ শাসকদের মনে ভয় ধরে যাবে। ভয়েই তারা কিছু অধিকার ছাড়তে বাধ্য হবে। সময়টাও অনুকূল হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। বলকান যুদ্ধকে ঘিরে ইউরোপেও কেমন যেন একটা ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল বড়ো বড়ো শক্তিগুলোর মধ্যে। জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ামের ভয়ে ইংরেজ অন্যান্য শক্তিগুলো ভয়ে তটস্থ। বাস্তবিকই ইংল্যান্ডের পক্ষে ঘর সামলানোর প্রয়োজনটা বেশ জরুরি হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই তো সুযোগ। ইংল্যান্ডকে তার দুর্বলতম মুহূর্তে আঘাত করাই তো উচিত হবে। এতেই তো ইংরেজ সরকার অচল হয়ে যাবে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমরা জিতে স্বাধীন হয়ে যাব।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই অনুকূল পরিবেশে মহাবিদ্রোহী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথ সারা ভারতবর্ষের সৈন্যদলকে দিয়ে আবার বিদ্রোহ করবার কাজে লেগে গেলেন। এক সঙ্গে রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে, রেলের ব্রিজ

ভেঙে ফেলে, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ইংরেজদের আটকে ফেলতে হবে। তারপর দেশি সেপাই ও বিপ্লবীদের মিলিত আক্রমণে ইংরেজদের তছনছ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে।

ঠিক এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল—ইংরেজ বনাম জার্মানি। ইংরেজ সৈন্যরা ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের শত্রু হল ইংরেজ, আর তার শত্রু হল জার্মানি। অতএব জার্মানি অবশ্যই ভারতের বন্ধু হবেই। যতীন্দ্রনাথ অতঃপর জার্মানি থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হলেন। জার্মানরাও ইংরেজদের জব্দ করার জন্য ভারতের বিপ্লবীদের হাতে রাইফেল, বোমা, রিভলভার, বুলেট এবং টাকা-কড়ি তুলে দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল।

## রডা কোম্পানির অস্ত্রশস্ত্র লুঠ

এর আগে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই কলকাতার রডা কোম্পানির অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ বিপ্লবীরা লুঠ করে লুকিয়ে ফেলেছিল। সেইসব অস্ত্রের মধ্যে মাউজার নামে এক রকম ভয়ংকর পিস্তল ছিল। সেগুলোকে রাইফেলের মতন ব্যবহার করা যেত।

১৯১৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু একজন সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ

জার্মানরা "ম্যাভেরিক" ও "এস হেনরি" নামের দুটো জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল। কীভাবে সেগুলি খালাস করে নেওয়া হবে জিজ্ঞেস করলেন বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। যাদুগোপালকে যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তুমি সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে তোমার দলবল নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। কিছু অস্ত্রশস্ত্র সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে নৌকো করে। হাজার হাজার রাইফেল-পিস্তল-গুলি-গোলা-বারুদ সব ছড়িয়ে দেব সারা ভারতবর্ষে। লক্ষ লক্ষ টাকাও আসছে। ভারতকে স্বাধীন করার এরকম সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে? বললেন বজ্রকণ্ঠে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ। তারপর বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, তুমি গোয়ায় চলে যাও। ওখানে এক জাহাজ-ভর্তি রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল ও গোলা-বারুদ নামবে। আর আমি বালেশ্বরের সমুদ্রের ধারে ঘাঁটি বেঁধে ম্যাভেরিক জাহাজের সমস্ত অস্ত্র নামিয়ে নেব। তারপর রাসবিহারী বসু পাঞ্জাব মেল আটকে দিয়েছে জানলেই শুরু হবে আমাদের কাজ অর্থাৎ বিদ্রোহ। এক ঘণ্টায় দখল হয়ে যাবে ফোর্ট উইলিয়াম। যুদ্ধে জয় হলে স্বাধীনতার স্বর্গ ভোগ করব। আর হেরে গেলে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে সোজা স্বর্গে চলে যাব। আর যদি ব্যর্থ হই, তবুও এই আদর্শে দেশ জাগবেই। ভারত স্বাধীন হবেই।

## কাপ্তিপোদায় যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চার শিষ্য

বালেশ্বরেব কাছে কাপ্তিপোদার অদুরে চাষাখণ্ড অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথ থাকেন সাধুর বেশে গেরুযা পরে। লোকে তাঁকে সাধুবাবা বলে। মানুষের দুঃখে শোকে তিনি এগিয়ে যান। যত্ন নিয়ে তিনি রোগীর সেবা করেন, ওষুধ দেন। তিনি তাঁর চারজন শিষ্যকে নিয়ে থাকেন ওখানে। লোকে বলে সাধুবাবার আশ্রম। কিন্তু ওই আশ্রমেই মজুত আছে হাজার হাজার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও গোলা-বারুদ।

এদিকে নানান সূত্রে ব্রিটিশ শাসকরা খবর পায় যে জার্মানরা জাহাজে করে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে ভারতের বিপ্লবীদের জন্য। এই খবর শুনে ইংরেজরাও মাঝ সমুদ্রে ''ম্যাভেরিক'' ও ''এস হেনরি'' জাহাজ দুটো আটক করে অস্ত্রশস্ত্র সব নামিয়ে নেয়। ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য জার্মানদের পাঠানো অস্ত্র আর ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছোয় না।

বহু জায়গায় তল্লাশি চালাতে চালাতে ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগ এখবরও পেয়ে যায় যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে কাপ্তিপোদায় এক আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের বড়ো কর্তারা—ডেনহ্যাম, টেগার্ট ও লোম্যান প্রভৃতির চোখ সাফল্যের আনন্দে জ্বল জ্বল করে ওঠে। তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে এবার তাঁরা যতীন্দ্রনাথকে অবশ্যই ধরতে পারবেন।

## 'বুড়িবালামের যুদ্ধ' ঃ নব ভারতের হলদিঘাট

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তাবা কালবিলম্ব না করে বালেশ্বর থেকে কাপ্তিপোদা অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন বিশাল বাহিনী। ঘোড়সওয়ার, হাতি, তিনশো রাইফেলধারী সৈন্য, প্রচুর গোলা-বারুদ, টর্চলাইট ও লোক-লস্কর।

কাপ্তিপোদার অদুরে চাষাখণ্ডে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। চিত্তপ্রিয় ছুটে এসে যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—দাদা, ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি? যতীন্দ্রনাথ বললেন, তাই তো, এতো হস্তিবাহিনীর গলার ঘণ্টা। চলো জ্যোতিষ ও নীরেনকে ডেকে নিয়ে আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়কে নিয়ে তিনি তালডিহির দিকে সরে গেলেন। এখান থেকে তাঁর চার শিষ্যকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু পালালেন না। শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াতে আর মন চায় না। এবার এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের কাজটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যা দেশবাসীকে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন কথাটার মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবে।

অতঃপর যতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পার্বত্য-জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ওদিকে ইংরেজরা প্রচার করে দিয়েছে কয়েকজন বাঙালি ডাকাত এদিকে পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছে। যে বা যারা ধরিয়ে দিতে পারবে তাদের মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেওয়া

হবে। এটাই ছিল ইংরেজদের একটা মারাত্মক কৌশল। বিপ্লবীদের 'ডাকাত' বলে প্রচার করে ভারতবাসীদের অনায়াসে বিভ্রান্ত করা যেত। জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করার আগেই যতীন্দ্রনাথদের দু-একবার ঘিরে ফেলেছিল। তখন ওঁরা গুলি চালিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চলতে চলতে বিপ্লবীরা বুড়িবালাম নদীর কাছে একটা ফাঁকা মাঠে কয়েকটা বিরাট বিরাট উই-ঢিবি দেখতে পেলেন।

ঠিক আছে। যতীন্দ্রনাথ বললেন, ওই ঢিবিগুলোর আড়ালে ট্রেঞ্চ বানিয়ে এসো আমরা অপেক্ষা করি। যুদ্ধ যখন করতেই হবে, একজন দারোগা দূর থেকে যতীন্দ্রনাথদের অনুসরণ করছিল। সে পুরস্কারের লোভে ইংরেজ বাহিনীকে খবর দিয়ে দেয় যে উইঢিবির পেছনে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছে। ইংরেজ বাহিনীর নেতা লেফটেনান্ট রাদারফোর্ড এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিলবি সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন ওই উইঢিবিগুলোর দিকে।

দূর থেকে উইঢিবিগুলো দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান লেফটেনান্ট রাদারফোর্ড আদেশ দিলেন ফায়ার—এক সঙ্গে একশো রাইফেল গর্জে উঠল।

যতীন্দ্রনাথ তো আর সোজা যোদ্ধা নয়। পাঠকদের তো আগেই বলেছি তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়নের তুলনা করা হয়। তিনি তা কাজেই দেখিয়ে দিলেন। কোনো উত্তরই দিলেন না তিনি ইংরেজ বাহিনীর গুলি চালানোর। ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। ওরা ভেবেছিল বিপ্লবীদের কাছে রিভলভার ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং ইংরেজ বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে এগোতে লাগল। যখন ওরা গুলির আওতার মধ্যে এসে গেল তখন যতীন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠের আদেশ শোনা গেল—ফায়ার।

ধপা ধপ শব্দ হতে লাগল। ধপ করে রাদারফোর্ডের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা গুলি খেয়ে কাদায় পড়ে যেতে লাগল বিপ্লবীদের একটা গুলিও ব্যর্থ হল না মনে হল।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সাল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে প্রথম প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছিল ওইদিন। পরে সেই যুদ্ধ চট্টগ্রাম হয়ে সুভাষচন্দ্রের হাত ধরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছিল—সে কথা যেন আমরা সকলেই মনে রাখি। এ কথা ভোলার কোনো উপায় নেই। এ যে ঐতিহাসিক সত্য।

কাদায় তাঁর সৈন্যদের গড়াগড়ি খেতে দেখে রাদারফোর্ড তাঁর সৈন্যদের কিছুটা পিছু হঠে আসার নির্দেশ দেন। পাঁচজন বাঙালি বিপ্লবী ইংরেজ বাহিনীর তিনশো সৈনিকের সঙ্গে যে অসাধারণ যুদ্ধ করেছিলেন তার কোন নজিরই বোধহয় ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। তাই তো অবাক বিস্ময়ে নজরুল এই যুদ্ধকে বলেছেন "নবভারতের হলদিঘাট।"

যতীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন অত কম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং প্রায় অভুক্ত অবস্থায় তাঁদের পক্ষে বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানো তো অসম্ভব ব্যাপার। তাই যতীন্দ্রনাথ বললেন গুলি একেবারেই নষ্ট করো না। হঠাৎ সাঁ করে একটা গুলি এসে যতীন্দ্রনাথের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাই

উড়িয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কাউকে কিছু না বলে এক হাতে গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে চললেন।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীব কানের পাশ দিয়েই একটা গুলি চলে গেল। চিত্তপ্রিয় মাথাটা নামিযে নিতে না নিতেই আর একটা বুলেট তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। চিত্তপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের কোলেব ওপর ঢলে পড়লেন। প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুর পরেও যতীন্দ্রনাথের চোখের জল ফেলার এতটুকুও সময় নেই। শুধু স্নেহময়ী জননীর মতো চিত্তপ্রিয়ের কপালে ও মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন গুলি চালাতে চালাতে।

তিন ঘণ্টা ধরে চলেছিল এই অসম যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এক পাও এগোতে পারেনি। তাছাড়া ইংরেজ পক্ষের যে কত লোক মারা পড়েছিল তা গোনা যায়নি। চার ইংরেজ সেনাপতি ডেনহাম, টেগার্ট, লোম্যান ও কিলবি অবাক হয়ে ওই পাঁচ বাঙালি বিপ্লবীর কাণ্ড দেখছিল আর অবাক হয়ে ভাবছিল—ওই পাঁচজন বাঙালি বিপ্লবীই যদি এমন অসাধারণ কাণ্ড ঘটাতে পারে তাহলে সবাই এক হলে কী হবে?

ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের পিঠে ও চোয়ালে আরও দুটি গুলি এসে বিঁধে গেল। তাছাড়া মনোরঞ্জন ও নীরেনেরও দু-দুটো গুলি লেগেছে। এদিকে জ্যোতিষ যতীন্দ্রর সেবা করতে লাগল। কারণ বিপ্লবীদের সব অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়ায় তাদের আর কিছুই করার নেই।

বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গেছে বুঝতে পেরে ইংরেজরা পুরো বাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আবার সেই সপ্তরথীর মতন যতীন্দ্রনাথদের ঘিরে ফেলল। বর্তমান যুগের অভিমন্যু যতীন্দ্রনাথের তখন প্রাণটুকুই মাত্র ধুক্ ধুক্ করছে। মোটামুটি সকলেই ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। চিত্তপ্রিয় তো আগেই শেষ হয়ে গেছে। সব দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে দেখে যতীন্দ্রনাথ মি. কিলবিকে বললেন—এ ব্যাপারের সব দায়িত্বই আমার। আমার সহযোগীদের বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। তারা যা করেছে আমার নির্দেশেই করেছে। এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকার যেন আমার সহযোগীদের ওপর কোনরকম অবিচার না করেন। এইটুকুই সরকারের কাছে আমার শেষ অনুরোধ।

ক্ষতবিক্ষত যতীন্দ্রনাথকে সংকটজনক অবস্থায় বালেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। শাসকদের মতলব কোনরকমে যতীন্দ্রনাথকে সারিয়ে তুলে ফাঁসি দেওয়া। কিন্তু পরের দিনই মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে গেলেন। তারিখটা ছিল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল।

বিচারের প্রহসনের পর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্র দাসগুপ্তের ফাঁসি হয়েছিল। জ্যোতিষ পালের হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। জেলে অকথ্য অত্যাচারে জ্যোতিষ পাল উন্মাদ হয়ে যান। মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে শুনে সারা ভারতবর্ষে নেমে এসেছিল নিদারুণ শোকের ছায়া। অনেকেই সকলের সামনে রাস্তা ঘাটে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। খবরটা সত্যি কিনা যাঁরা জানতে গেলেন তাঁদের কাছে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মি. টেগার্ট স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন—"অত বড়ো বীর যোদ্ধা তিনি তাঁর জীবনে

দেখেননি। যতীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় যিনি আমাদের বিরুদ্ধে ট্রেঞ্চ কেটে আসল যুদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীন দেশে এমন বীর জন্মালে সে দেশ ধন্য হয়ে যেত। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।''

চার্লস টেগার্টের কথার প্রতিধ্বনি করে কাজী নজরুল ইসলাম বুড়িবালামের যুদ্ধের নাম দিয়েছেন—'নবভারতের হলদিঘাট'। আর লিখেছেন—

অভিমন্যুর দেখেছিস রণ?
যদি দেখিসনি, দেখিবি আয়
আধা পৃথিবীর রাজার হাজার
সৈনিকে চারি তরুণ-হটায়।

বিদ্রোহী কবি আরও লিখেছেন—

বালাশোর-বুড়িবালামের তীর—
নবভারতের হলদিঘাট।
উদয় গোধূলি রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যেথা অস্তপাট।

আর একজন ইংরেজ সেনাপতি স্বীকার করলেন যে এমন বিপ্লবী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিয়ে শিষ্যদের মুক্ত করে নিজের প্রাণ দেওয়ার কথা তিনি কখনও শোনেননি। এই দৃষ্টান্তে ভারত জেগে উঠবে। খুব বেশিদিন আর ভারতকে পরাধীন থাকতে হবে না। পুরুষ সিংহ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সম্মুখ সমরে নিজের জীবন দিয়ে ভারতকে স্বাধীনতার পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

সকালে সন্ধ্যায় শুতে যাবার আগে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। বলা উচিত, 'হে বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার ত্যাগ যেন আমরা কখনও না ভুলি'। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত তাঁর গ্রামের একজন পাগল চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে গান গাইতেন আপন মনে—

যতি মুখুজ্জে কোথায় গেল, যতি মুখুজ্জে কোথায় গেল!
কোথায় গেল, কোথায় গেল আর এল না, কোথায় গেল?

(বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, *শহীদের রক্তে রাঙা*, পৃঃ ৮৯)

সবশেষে উল্লেখ করি চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সব হারানোর গান কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ''বুড়িবালামের তীরে'' কবিতার অংশ বিশেষ—

বুড়ি বালামের তীরে
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা
রাঙালে ধরিত্রীরে
সম্মুখ রণে যুঝি প্রাণপণে
যুদ্ধ করিলে বীরের দল

মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে
মুক্তির হোমানল।।

কুটিরে কুটিবে ছড়াবে আগুন
সাঁঝের আকাশ তলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে
কহিবে অশ্রুজলে।
পিতা শুনাইবে পুত্ররে তার
ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা
বুড়ি বালামেব তীরে,
সেই মরণেব অমর কাহিনী
ছন্দে বচিবে কবি
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে, বীবের
শেষ বিদায়ের ছবি
চারণ গাহিবে পথে পথে
সেই মৃত্যুর জয়গান
যে গান শুনিয়া হৃদয়ে আবেগে
জাগিবে তরুণ প্রাণ।
প্রতাপ, মোহন, সীতারাম
আর মীর মদনের পাশে
রক্ত আখরে তোমাদের কথা
লেখা রবে ইতিহাসে।।

## বাইশ

# 'মাস্টার-দা' সূর্য সেন এবং চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ

জন্ম—১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ। রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রাম, জেলা চট্টগ্রাম। রাজমণি সেন ও শশীবালা দেবীর চতুর্থ সন্তান সূর্যকুমার সেন। অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই গ্রামেই জন্মেছিলেন বাংলার বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন। মৃত্যু—১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি রাত্রি সাড়ে বারোটায়—ফাঁসিতে। বাঙালির কাপুরুষতার বদনাম নিজের জীবন দিয়ে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন মাত্র ৪০ বছর বয়সে এই অসম সাহসী দেশপ্রেমিক মহাপ্রাণ। ইতিহাসের কাছে বাঙালির একটাই পরিচয় ছিল সেটা হল কাপুরুষতার পরিচয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দস্যুবৃত্তি ছাড়া বাঙালির সাহস বলতে আর কিছুই ছিল না।

বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে চট্টগ্রামের উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন ১৯১৮ সালে। অল্পদিনেই সূর্য সেন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে খুবই শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হয়ে ওঠেন। অচিরেই সূর্য সেন ছাত্রদের প্রিয় "মাস্টার-দা" হয়ে উঠলেন। সবাই তাঁকে মাস্টার-দা বলে ডাকে। ক্রমে এই নামই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

সূর্য সেনের মাথার মধ্যে তখন কেবলই স্বাধীনতার আগুনভরা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। একদিকে দেশের চরম দারিদ্র্য, অপমান, অসহায়তা, অশিক্ষার অন্ধকার, অপরদিকে বিদেশি শাসকদের অবাধ লুণ্ঠন, অত্যাচার আর চোখরাঙানি। এসব কিছুতেই সহ্য হয় না সূর্য সেনের। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন তাঁর স্বপ্নের নায়ক। দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের জীবনকথা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস তাঁর জীবনদর্শন সম্পূর্ণ পালটে দিল। তিনি দৈনিক গীতা পাঠ করেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর জড়ত্ব দূর করে শত্রুনিধনে অস্ত্র ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিপ্লবাত্মক ও সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বানসম্বলিত রচনাগুলি সূর্য সেনকে উজ্জীবিত করে তোলে।

ইতিমধ্যে দাদা-বৌদির চাপে পড়ে সূর্য সেন বিবাহ করলেন চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়া গ্রামের ষোড়শীকন্যা পুষ্পকুন্তলা দত্তকে। কিন্তু তাঁর বৈবাহিক জীবন বলতে কিছুই ছিল না। পুষ্পকুন্তলার জীবনের সব স্বপ্ন ফুলসজ্জার রাত্রেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ফুলসজ্জার রাত্রেই স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। সানাই-এর সুর নয়, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, বোমার বিস্ফোরণ, কামানের গর্জন, পিস্তলের আওয়াজ তাঁর কানে সংগীতের মূর্ছনার মতো মধুর বলে মনে হতে লাগল।

ভারতে তখন বহু গুপ্ত সংগঠন। বাংলায় যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, আত্মোন্নতি সমিতি এবং পাঞ্জাবে সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংঘেব নাম ছিল ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। মাস্টারদা'র নেতৃত্বে ১৯২১ সালে চট্টগ্রামে যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিপ্লবী দল গঠিত হয় তাতে যোগ দেন—অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেন, অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষ। ১৯২২ সাল থেকেই মাস্টারদা'র বিপ্লবী পরিকল্পনা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে প্রায় দশ হাজার নিরস্ত্র মানুষের একটি সভার ওপর সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ডায়ার হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় পঞ্চাশটি রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করে দিলেন। হাজারের ওপর মানুষ ঘটনাস্থলেই মারা পড়ল। কত যে আহত হয়েছিল তারও কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাসে এমন বর্বরতার আর কোন নজির আছে কি-না সন্দেহ। প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষের মানুষ। বিশ্বকবি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশের দেওয়া 'নাইটহুড্'। গর্জে উঠেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলও যখন তিনি বজ্রকণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন—

> কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
> রক্ত-জমাট, শিকল-পূজার, পাষাণ-বেদী।

চট্টগ্রামের ন্যাশনাল হাইস্কুলের ছাত্রদের সভায় পৌরোহিত্য করলেন অঙ্কের শিক্ষক সূর্য সেন—যিনি সকলের কাছে তখন "মাস্টারদা" নামেই পরিচিত। ছাত্ররা স্থির করল সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাবে। মাস্টারদা বললেন—"যারা ঘাতক—তাদের কাছে প্রতিবাদে কোনই কাজ হয় না। প্রয়োজন জীবনপণ সংগ্রাম।" সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য ইস্তফা দিলেন শিক্ষকতায়।

## চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ঃ ১৮ এপ্রিল ১৯৩০

এগারো বছর পরের কথা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। রাত তখন ১০টা। চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিস থেকে—বিপ্লবীরা চারভাগে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথম দলটি দখল করবে পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগারটি। দ্বিতীয়টির ওপর দায়িত্ব পড়ল অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগারটি দখল করা। তৃতীয় দলটির ওপর দায়িত্ব পড়ল পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাবটি আক্রমণ করা। চতুর্থটির কাজ হবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধ্বংস করা। কয়েকদিন আগেই অন্য আর একটি দল রেললাইন উপড়ে দিয়ে এসেছে।

খাঁকি পোশাকে একেবারে মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে চলেছে পঞ্চাশজন বিপ্লবী অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারটি দখল করতে। টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিল রাইফেলধারী এক প্রহরী। কোনো কিছুর বোঝার আগেই তাকে লুটিয়ে পড়তে হল বিপ্লবীদের গুলিতে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে উচ্চরিত হল—"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস

হোক—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—বন্দে মাতরম্।" গুলির আওয়াজ এবং সমবেত জয়ধ্বনিতে শত শত পুলিশ প্রহরী নিমেষে গা-ঢাকা দিল। তারপর বড়ো বড়ো হাতুড়ির আঘাতে অস্ত্রাগারের তালাগুলি ভেঙে পড়ল। বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল অসংখ্য মাস্কেট্রি রাইফেল, রিভলভার ও কার্তুজ।

লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি চলল অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগারটি দখল করতে। লোকনাথ বলকে রাইফেলধারী প্রহরী কোন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার মনে করে অভিবাদন জানাল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বিপ্লবীদের গুলিতে সে হল ধরাশায়ী। ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা পাঠান প্রহরীর দল কালবিলম্ব না করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। ভারপ্রাপ্ত অফিসার সার্জেন্ট ফেরল রিভলভার হাতে ছুটে এলেন। কিন্তু তাঁকেও শেষ শয্যা নিতে হল বিপ্লবীদের গুলিতে।

এবার অস্ত্রাগারটির দরজা ভাঙার পালা। জাহাজ-বাঁধা মজবুত দড়ি দিয়ে দরজার হাতল দুটোকে বাঁধা হল, একটা মোটর গাড়ির সঙ্গে। তারপর মোটরগাড়িটি চালিয়ে দেওয়া হল উর্ধ্বগতিতে। সশব্দে দরজাটি ভেঙে পড়ল। অসংখ্য রাইফেল, রিভলভার ও লুইস-গান দখলে এসে গেল। কিন্তু কার্তুজ? কার্তুজের অভাবে কি সব মাঠে মারা যাবে? অগত্যা বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কব্জা করে নিয়ে অস্ত্রাগারটিতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইলকিনসন। বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারাল তাঁর ড্রাইভার ও আর্দালি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অন্ধকারে কোনরকমে গা-ঢাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন প্রভৃতি দুঃসাহসী তরুণদের পাঠানো হয়েছিল। তারা কিন্তু শুধু হাতেই ফিরে এল গুড্-ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে ক্লাব বন্ধ থাকায়। তারপরই অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করা হল—মাস্টার-দা হলেন সর্বাধিনায়ক।

**জালালাবাদের যুদ্ধ ঃ** হঠাৎ ভেসে এল লুইস-গান থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণের আওয়াজ। তখন জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীরা আরও কিছু অস্ত্র-শস্ত্র কব্জা করে নিয়ে পরিকল্পনা মতো পুলিশ-লাইনেও আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটাল হিমাংশু সেন। পেট্রল ঢালতে গিয়ে খানিকটা নিজের গায়েই ঢেলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ তাকে একটা মোটরগাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটল আশ্রয়ের সন্ধানে। তাঁদের সঙ্গে গেলেন আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল। বাকি দলটি ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে মূল বাহিনীটি ফতেয়াবাদ হয়ে পৌঁছে যায় জালালাবাদ পাহাড়ে। আহার নেই, নিদ্রা নেই, এমনকি তৃষ্ণার জল পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে। তবুও কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিক তরুণদের উৎসাহের অন্ত নেই।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করার দায়িত্বে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি ও তাঁর দল-বল টেলিফোন অপারেটারকে ক্লোবফর্ম করে টেলিফোন বোর্ডটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তাঁর প্রেরিত বিপ্লবীদের আর একটি দল শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে টেলিগ্রাফেব তাব কেটে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

তারিখটা বাইশে এপ্রিল। সন্ধে হয় হয়। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিপ্লবীরা বিশ্রাম করছিল পাহাড়ের বুকে বসে। সবার মনে একই প্রশ্ন কখন দখল করবে তারা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, জেলখানা, কোর্ট-কাছারি ও কোষাগার—অর্থাৎ সরকারি মালিকানার প্রতীক সব কিছু। হঠাৎ তাদের নজরে এল পাহাড়ের ঠিক নীচ দিয়ে যে রেল-লাইনটা গেছে এঁকে-বেঁকে সেখানে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। তারপর ওই ট্রেন থেকে নেমে এল অসংখ্য গোরা সৈন্য। মাস্টারদা লোকনাথ বলকে ওই গোরা সৈন্যদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব দিলেন। সুযোগ বুঝে লোকনাথও হুকুম দিলেন—"ফায়ার"। বিপ্লবীদের হাতের মাস্কেট্রি রাইফেলগুলো সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল। হতচকিত গোরা সৈন্যরা নিমেষে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরে নতুন উদ্যমে আক্রমণ করল—অসংখ্য মেশিনগানের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটি মাত্র রাইফেলের অবিশ্বাস্য অসম প্রতিরোধ।

লুটিয়ে পড়ল লোকনাথের ভাই ১৪ বছরের টেগরা—জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম শহিদ। তারপর একে একে শেষ শয্যা নিলেন ত্রিপুরা সেন, নির্মল লালা, বিধু ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, অর্ধেন্দু দস্তিদার, শশাঙ্ক দত্ত, মধুসূদন দত্ত, মতি কানুনগো, পুলিন বিকাশ ঘোষ, জিতেন্দ্র দাসগুপ্ত আর প্রভাস বল। লোকনাথ কিন্তু বলেই চলেছেন—"যতক্ষণ না শত্রু পক্ষের কামান স্তব্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যাও গুলি ছোঁড়া।"

শেষপর্যন্ত হলও তাই। গোরা সৈন্যরা অসমসাহসী কয়েকটি তরুণ দেশপ্রেমিকের কাছে হার মানতে বাধ্য হল, মেশিনগানধারীরাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল মাস্কেট্রি রাইফেলধারীদের দাপটে। ৬৪ জন গোরা সৈন্য প্রাণ হারাল ওই অসম যুদ্ধে।

শত্রু-রক্তে রক্ত-তিলক পরিবে কা'রা?
ভিড় লাগিয়াছে ছুটে দিকে দিকে সর্বহারা।।

............................... ..................................

আঁধার কৃষ্ণ মহিষ-অসুর বধিতে কৃষ্ণ খড়্গাধর
শবের শ্মশানে হয়ত উদিবে সেদিন শুভ্র গৌরী-হর।।

(কাজী নজরুল ইসলাম, *রক্ত তিলক-প্রলয়শিখা*)

**চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযান সফল হবার পর মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে কয়েক দিনের জন্য স্বাধীন বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়েছিল। সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা চট্টগ্রামে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা ওড়ালেন। গণতন্ত্রী বাহিনীর প্রধান মাস্টারদা সূর্য সেন ঘোষণা করলেন যে, চট্টগ্রাম শহর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আজ থেকে**

স্বাধীন। দিনটা ছিল ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০। চট্টগ্রামের বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকারের সুপ্রিম কমান্ডার মাস্টারদা সূর্য সেন সহযোদ্ধা বিপ্লবীদের উদ্দেশে সেদিন যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটি উদ্ধৃত করলাম ঃ

প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ,

ভারতের বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর উপর ন্যস্ত। ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চাকাঙক্ষা পরিপূর্ণ করবার জন্য আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছি। আজ বিশেষ গৌরবের কথা, আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলি অধিকার করেছে। শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত, শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত, বহির্জগতের সঙ্গে তারবার্তা বিচ্ছিন্ন, রেললাইন উৎপাটিত ও মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত। বাইরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শত্রুর সেনাবাহিনী পরাস্ত। চট্টগ্রামে অত্যাচারী বিদেশি সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

বিশ্বের গোচরার্থে ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর শাসন ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে। চট্টগ্রাম ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবু আশা ও ভরসা করা যায় আজকের জয় ব্রিটিশ দস্যুর কবল থেকে অচিরে ভারতমাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ আগুন প্রজ্বলিত করার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি, সূর্য সেন এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রী বাহিনীর বর্তমান পরিষদই সামরিক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্নলিখিত জরুরি কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে—

১। আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

২। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হবে।

৩। অভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করতে হবে।

৪। সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে।

৫। এই সামরিক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামের প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবি রাখে, এবং দেশসেবকদের ও যাদের অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত আছে, তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহচর্য প্রত্যাশা করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনিশ্চিত জয়ের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে চল, এস আমরা সমস্বরে বলি—

ব্রিটিশ দস্যুর প্রতি কিছুমাত্র করুণা নয়!
বিশ্বাসঘাতক ও লুণ্ঠনকাবী দল সমূলে নিশ্চিহ্ন হোক!
সামরিক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হোক!!!
বন্দে মাতরম্

(সূত্র ঃ অনন্ত সিংহ, *সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা*, পৃঃ ৩৫৯ ও স্বপন মুখোপাধ্যায়, *মাস্টারদা সূর্য সেন*, পৃঃ ৫৭)

## বিদ্রোহ পরবর্তী পরিস্থিতি

জালালাবাদ পাহাড়ে কালক্ষেপ করা কোনোমতেই উচিত নয় বিবেচনা করে আবার শুরু হল অজানা পথ-পরিক্রমা। কী করুণ অবস্থা, জালালাবাদে পড়ে রইল প্রিয় সহযোগীদের মৃত দেহগুলি। নিজেরাও রণক্লান্ত। পা যেন আর চলছেই না। কিন্তু ওই অবস্থাতেও কাঁধে নিয়ে চলতে হচ্ছে দুই আহত সহযোগী বিনোদবিহারী দত্ত ও বিনোদ চৌধুরীকে এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামগুলি। সারারাত চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে মাস্টারদা সঙ্গীদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন আর এক পাহাড়ের গুহায়।

অম্বিকা চক্রবর্তীকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে আসা হয়েছিল জালালাবাদ পাহাড়ে। শেষ রাতে জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখলেন ধারে কাছে কোথাও কেউ নেই। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত নেই তাঁর। অগত্যা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে অবতরণের চেষ্টা শুরু করে দিলেন।

১৮ই এপ্রিল অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হিমাংশু সেনকে সরাবার পর অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল মূল দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। শেষে ঠিক করেন কলকাতা যাবেন। চট্টগ্রাম থেকে আট মাইল দূরে পুঁটিয়ারি স্টেশন থেকে টিকিট কাটেন। সন্দেহ বশে স্টেশনমাস্টার অশ্বিনী ঘোষ ট্রেনের গার্ড ফেরেবাকে ওই চারজনের খবর জানিয়ে দেন। রাত দুটোর সময় ফেনী স্টেশনে বিশাল এক পুলিশবাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলে। তখন চার বিপ্লবীই হাতের রিভলভার চালিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দেন। পরে তাঁরা একে একে মিলিত হয়েছিলেন চন্দননগরে। মাস্টারদা আশ্রয় নিয়েছিলেন কোয়েপাড়া নিবাসী বিনয় সেনের বাড়িতে। লোকনাথ বল ও অন্যান্য সঙ্গীরা ওখানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

**৫ মে ১৯৩০ দ্বিতীয়বার ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রচেষ্টা ঃ** ৫ মে তারিখে রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী, মাস্টারদার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে। কিন্তু পারা গেল না চারদিকে পুলিশ ও মিলিটারি ঘিরে থাকায়। ফিরে এসে তাঁর ছয় জন আশ্রয় নিলেন রজত সেনেরই বাড়িতে। পুলিশ কীভাবে যেন খবর পেয়ে মাঝরাতে রজত সেনের বাড়িটি ঘিরে ফেলল। তখন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কর্ণফুলী

নদীতে একটা শাম্পানে চড়ে বসেন। শাম্পানটি যখন কর্ণফুলীর মাঝ বরাবর পৌছেছে তখন পুলিশ ও মিলিটারি একটা লঞ্চে চড়ে বিপ্লবীদের ধাওয়া করে। তীরে উঠেও বিপ্লবীদের হদিস করতে না পেরে তারা রব তোলে—'ডাকাত'-'ডাকাত'। ধরা পড়ে যান সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী। কিন্তু বাকি চারজন জলধা গ্রামে প্রবেশ করে আশ্রয় নেন একটা ঝোপের মধ্যে। কালারপোল নামে একটি কাঠের সেতুর উপর। পুলিশ ও মিলিটারি ওই ঝোপটি যথারীতি ঘিরে ফেলে। শুরু হয় রাইফেল ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে চারটি মাত্র রিভলভারের এক অসম ও দুঃসাহসিক যুদ্ধ। পুলিশ থেকে আদেশ হয়—"আত্মসমর্পণ করো।" জবাব আসে গুলির আওয়াজে। কিন্তু কতক্ষণই বা চলতে পারে ওই অসম যুদ্ধ? রিভলভারের গুলি শেষ হতেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে চারবন্ধু পরস্পরকে গুলি করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। এটাই হল ঐতিহাসিক কালারপোল যুদ্ধ।

**চন্দননগরের যুদ্ধ ঃ** এরপর মাস্টারদার নির্দেশে লোকনাথ বল এলেন চন্দননগরের গোপন আস্তানায়। কী জানি কোন্ সূত্রে যেন খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট পয়লা সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে চন্দননগরের ওই গোপন আস্তানাটি ঘিরে ফেলেন। শুরু হয়ে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে চারটি মাত্র রিভলভারের এক অকল্পনীয় যুদ্ধ। জীবন ঘোষাল বুলেটের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন—লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও আনন্দ গুপ্ত। ৯ই অক্টোবর ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। জালালাবাদ যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নগুলি তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি তাঁর শরীর থেকে। পয়লা ডিসেম্বর মাস্টারদার নির্দেশে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তী বাংলা পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল অত্যাচারী ক্রেগকে হত্যা করতে বেরিয়ে ভুলক্রমে মারলেন রেলওয়ে পুলিশ ইনস্পেকটর তারিণী মুখার্জীকে। দুজনেই ধরা পড়ে গেলেন।

**বত্রিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা, মাস্টারদা কিন্তু তখনও জেলের বাইরে**—ইতিমধ্যে মামলা শুরু হয়ে গেছে—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ বত্রিশ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে। মাস্টারদা কিন্তু তখনও জেলের বাইরে থেকে নিত্য নতুন পরিকল্পনা এঁটে চলেছেন।

**ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো হত্যা ঃ** ১৯৩১ সালের ২৮ অক্টোবর। ঢাকার কুখ্যাত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো নিহত হলেন সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের গুলিতে। আর কুমিল্লার ডি.এস.পি. প্রাণ হারালেন শৈলেশ রায়ের হাতে। পুলিশ ওই হত্যাকারী বিপ্লবীদের কোন খোঁজই পেল না।

গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার আসানউল্লা ছিলেন চট্টগ্রামবাসীদের কাছে অত্যাচারের জীবন্ত বিগ্রহ। মৃতপ্রায় অম্বিকা চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের পর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন এই আসানউল্লা খান। জ্ঞান হারাবার আগে অম্বিকা চক্রবর্তী খাবার জল চাইলে তাঁর সর্বাঙ্গে প্রস্রাব করে দিয়ে অট্টহাস্য করে আসানউল্লা বলেছিলেন—"নে জল খা।"

১৯৩১ সালের ৩০ অগাস্ট। নিজাম পল্টন মাঠে এক ফুটবল চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল খেলা। পুরস্কার বিতরণ করবেন সকলের ঘৃণিত ওই আসানউল্লা খান। হঠাৎ রিভলভারের গুলির আঘাতে আসানউল্লা শেষ শয্যা নিলেন। হত্যাকারী ১৩-১৪ বছরের এক বালক—হরিপদ ভট্টাচার্য।

**কানুনগোপাড়ার গোপন আস্তানা ঃ** এর পর মাস্টারদা এলেন কানুনগোপাড়ার গোপন আস্তানায়। তারকেশ্বর বিশ্বাস ও ধীরেন দে এলেন মাস্টারদার নির্দেশ নিতে। ফেরার পথে মনে হল কে যেন অনুসরণ করছেন তাঁদের। বুঝলেন অনুসরণকারী আর কেউ নয়—সাধারণ পোশাকে কুখ্যাত দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তারকেশ্বরের হাতের রিভলভার গর্জে উঠল। দারোগা বাবু সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে ধূলিশয্যা নিলেন।

**ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষ ঃ** পরবর্তী ঘটনা ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষ। ধলঘাটের সাবিত্রী দেবীর বাড়ি তখন পলাতক বিপ্লবীদেব তীর্থস্থান। সূর্য সেন, অপূর্ব সেন ও নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত তখন ওখানেই। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন রাত দশটায় বিশাল এক গোর্খা বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বাড়িটি ঘিরে ফেলেন। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ক্যামেরন সাহেব স্বয়ং নিহত হলেন, ওদিকে প্রাণ হারালেন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। তবে প্রীতিলতা ও কল্পনাকে নিয়ে মাস্টারদা কোনক্রমে উধাও হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তৃতীয় বারের বার ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পড়ল অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহিদ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারিণী এবং চট্টগ্রাম নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদারের ওপর। কেননা, মাস্টারদার শেষ কাজটা ছিল তখনও বাকি। ওই শেষ কাজটা হল ফিমেল অ্যাকশান বা মেয়েদের দিয়ে শক্তির খেলা দেখানো। খবরটা শোনামাত্র প্রীতিলতার আনন্দ যেন আর ধরে না। যেন ওই সৌভাগ্যের জন্যই তিনি এতদিন প্রতীক্ষায় ছিলেন। আরও ঠিক হল যে তাঁর সঙ্গে থাকবেন মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী, কালিপদ দে, পান্না সেন, প্রফুল্ল দাশ ও বীরেশ্বর রায় প্রভৃতি কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী বীর।

রাত তখন দশটা। পানোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের নাচ-গানের হুল্লোড় বেশ জমে উঠেছে। মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে ভেতরে ঢুকে পড়ল যেন নাচ দেখার উৎসাহে। দুজনেরই সঙ্গে আছে রিভলভার। পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন প্রীতিলতা ও অন্যান্য সঙ্গীরা। হঠাৎ গোটা হলঘরটা কেঁপে উঠল একটা বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া ও অবিরাম গুলি বর্ষণ। ভীত ও সন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ নর-নারীদের অনেকেই দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে করতে প্রাণ হারাল। এইভাবেই যেন দেওয়া হল জালিয়ানওয়ালাবাগের উপযুক্ত জবাব।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র চৌধুরী উন্মত্তের মতো ছুটে এসে খবর দিলেন যে মিলিটারি এসে গেছে। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা হাতের রিভলভার মহেন্দ্রর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"মাস্টারদাকে আমার প্রণাম দিও। আর আমার আদেশ তোমরা এখুনি চলে যাও—এক মুহূর্তও দেরি করো না—দলনেত্রী হিসেবে এই আমার নির্দেশ।" একটা চাপা কান্না বুকে নিয়ে মহেন্দ্র ও সঙ্গীবা সব চলে গেলেন। তারপরই মিলিটারির হাতে ধরা না পড়ার জন্যই মাস্টারদার কাছে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিতা প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল মুখে পুরে দিয়ে সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাতে একুশ বছরের প্রীতিলতা নিজেকেই উৎসর্গ করে গেলেন। পরনে ছিল তাঁর খাঁটি সামরিক পোশাক—খাকি শার্ট ও ট্রাউজার্স এবং মাথায় সামরিক টুপি। পরে তাঁর পোশাক তল্লাসি করে পুলিশ ছোট্ট যে কাগজের টুকরোটি পেয়েছিল সেটিতে লেখা ছিল বিশ্বকবিরই কবিতার দুটি লাইন—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া—
বাহির হনু তিমির রাতে, তরণীখানি বাহিয়া।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩-এর সেই ভয়ংকর রাতটা—ইতিমধ্যে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত, ফণী নন্দী প্রভৃতির বিরুদ্ধে দ্বীপান্তরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু কোথায় সেই নাটের গুরু সূর্য সেন বা মাস্টারদা?

মাস্টারদা তখন গৈরালা গ্রামের গৃহবধূ ক্ষিরোদপ্রভা বিশ্বাসের আশ্রয়ে। তাঁর সঙ্গেই আছেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাশগুপ্ত ও মণি দত্ত। বিপ্লবী ব্রজেন সেনের দাদা ওই গ্রামেরই বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন্ পুরস্কারের লোভে পুলিশকে খবরটা জানিয়ে দেয়। ১৯৩৩-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি মাঝ রাতে ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লির নেতৃত্বে এক বিশাল গোর্খা বাহিনী বিশ্বাস বাড়িটি ঘিরে ফেলে। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড গুলি বিনিময়। প্রচণ্ড গুলি বিনিময় চলতে থাকা অবস্থাতেই কল্পনা ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা পেছনের ডোবা সাঁতরে ও বাঁশের বেড়া টপকে কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু মাস্টারদা ধরা পড়ে যান।

বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন অবশ্য তাঁর পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে নয়। বিপ্লবীদের হাত থেকে। ৯ জানুয়ারি ১৯৩৪ রাত্রে নেত্র সেন যখন খেতে বসেছেন তখন এক কোপে তাঁর মুণ্ডটি ছিন্ন হয়ে ভাতের থালায় গড়াগড়ি দিয়েছিল বিপ্লবী কিরণ সেনের হাতের অস্ত্রাঘাতে। কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদারও ধরা পড়ে গিয়েছিলেন তিন মাস পরে—১৯৩৩-এর ১৯ মে তারিখে। বিচারের প্রহসনের পর মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। আর কল্পনার হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মাস্টারদা ফাঁসির কিছু পূর্বে চট্টগ্রাম জেলে বসে যে বাণীটি তাঁর সহকর্মী বিপ্লবীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল ঃ

"আমার তোমাদের উদ্দেশ্যে শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এই তো সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এই তো সময়।

কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা, আমার ভাই বোনেরা, তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভোর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মত সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানি না কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—কখনো পিছিয়ে যেও না। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কথা কোনদিনই ভুলে যেও না। জালালাবাদ, জুলধা, কালারপোল, চন্দননগর, গৈরালা ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সবসময় মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদিমূলে সে সব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো।

আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে—এই আমার একান্ত আবেদন। যারা কারাগারের ভিতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ।

বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে। আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্। জয় ভারত। বন্দে মাতরম্।

তোমাদের 'মাষ্টার দা'

১১ জানুয়ারি, ১৯৩৪

(স্বপন মুখোপাধ্যায়, 'মাস্টারদা সূর্য সেন'—গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনী)

অচৈতন্য অবস্থায় মাস্টারদাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভোররাত্রে।

**১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালের ভোররাত্রি। মাস্টারদার ধ্যানভঙ্গ হল মিলিটারিদের বুটের শব্দে। বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—"বন্দে মাতরম্"। জেলখানার অন্য বন্দিরা বুঝতে পারল সব কিছু। জেলের ভেতর থেকে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল—"বন্দে মাতরম্"—"মাস্টারদা জিন্দাবাদ"। জেলখানার বাইবে থেকেও ভেসে এল একই ধ্বনি। গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে দেখে মাস্টারদাকে চুপ করতে বলা হল। কিন্তু কে কার কথা**

শোনে। উন্মত্ত মিলিটারিরা তখন তাঁরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত অচৈতন্য মাস্টারদাকেই ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে অমৃতলোকের সঙ্গী হয়েছিলেন তারকেশ্বর দস্তিদারও।

পরের দিন শেষ রাতে (১৩/১/১৯৩৪) মৃতদেহ দুটি একটি বাক্সে ভরে একটা জাহাজে তোলা হল। তারপর ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই বাক্স দুটি গভীর সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। শঙ্কিত ও দিশেহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে মৃতদেহ দুটির সৎকার করার সাহসই পায়নি।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে লিখলেন—

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়,—
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে,
গুলি-বন্দুক-বোমার আগুনে—
আজও রোমাঞ্চকর।

আর নজরুল নমস্কার জানালেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়—

শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার।
না-আসা দিনের সূর্য-সে তুমি, তোমারে নমস্কার

(নজরুল ঃ নমস্কার-*প্রলয়শিখা*)

মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের এই মহান অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ঃ

১. সূর্য সেন
২. অম্বিকা চক্রবর্তী
৩. অনন্ত সিংহ
৪. লোকনাথ বল
৫. নির্মল সেন
৬. গণেশ ঘোষ
*৭. মধু দত্ত
*৮. উপেন ভট্টাচার্য
*৯. বিধু ভট্টাচার্য
১০. পরেশ রায়
১১. দেবপ্রসাদ গুপ্ত
১২. নারায়ণ সেন
১৩. মনোরঞ্জন সেন
১৪. রজত সেন
১৫. হিমাংশু সেন
১৬. বিধু সেন
১৭. সৌরেন্দ্র দত্তচৌধুরী
১৮. সুবোধ চৌধুরী
১৯. শ্রীপতি চৌধুরী
২০. শশাঙ্ক দত্ত
২১. ফণীন্দ্র নন্দী
২২. অমরেন্দ্র নন্দী
২৩. সুধাংশু বসু
২৪. নিতাই পদ ঘোষ
২৫. বিনোদ চৌধুরী
২৬. সুবোধ বল
২৭. শৈলেশ্বর চক্রবর্তী
২৮. মণীন্দ্র গুহ
২৯. স্বদেশ রায়
৩০. দ্বিজেন দস্তিদার
৩১. মহেন্দ্র চৌধুরী
৩২. কৃষ্ণ চৌধুরী
৩৩. দীপ্তিমেধা চৌধুরী
৩৪. অশ্বিনী চৌধুরী
৩৫. আনন্দ গুপ্ত
৩৬. অর্ধেন্দু দস্তিদার
৩৭. হেমেন্দু দস্তিদার
*৩৮. প্রভাস বল
৩৯. বিনোদ দত্ত
*৪০. ট্যাগরা বল (হরিগোপাল)
৪১. বনবিহারী দত্ত

৪২. পুলিন ঘোষ
৪৩. মলিন ঘোষ
৪৪ নির্মল লালা
৪৫ মতি কানুনগো
৪৬. ত্রিপুরা সেন
৪৭. ফকির সেন
৪৮. জিতেন দাসগুপ্ত
৪৯. রণবীর দাসগুপ্ত
৫০. ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য
৫১. ভবতোষ ভট্টাচার্য
৫২. সুবোধ রায়
৫৩. শান্তি নাগ
৫৪. সুরেশ দেব
৫৫. ধীরেন দে
৫৬. সুকুমার ভৌমিক
৫৭. সহায়রাম দাস
৫৮. সীতারাম বিশ্বাস
৫৯. ননীগোপাল দেব
৬০. সরোজ গুহ
৬১. হরিপদ মহাজন
৬২ হিমেন্দু দস্তিদার
৬৩. অমরেন্দ্র নন্দী
৬৪. অর্ধেন্দু গুহ
৬৫. কালীপদ চক্রবর্তী
৬৬. বিজয়কৃষ্ণ আইচ
৬৭ শঙ্কর সরকার
৬৮. সুশীল দে
৬৯. সুকুমার ভৌমিক
৭০. সৌরীন দত্ত
৭১. ব্রজেন সেন
৭২. সুশীল দাসগুপ্ত
৭৩. তারকেশ্বর দস্তিদার
*৭৪. মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত
৭৫. সুবোধ মিত্র
৭৬. জীবন ঘোষাল
৭৭. কল্পনা দত্ত
৭৮. প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার
৭৯. অনুরূপ সেন
৮০. নগেন সেন

* যুদ্ধ করতে করতে এঁরা প্রাণ দেন।

[তথ্যসংগ্রহ ঃ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, 'সূর্য সেন', শ্রী অরবিন্দ ভবন গ্রন্থাগার]

## তেইশ

# রাইটার্স বিল্ডিংস-এ অলিন্দ যুদ্ধ (১৯৩০)

ওরা দুপায়ে দলে মরণ শঙ্কারে—
সবারে ডেকে গেলো শিকল ঝংকারে।

অগ্নিযুগ! একটা ছোট্ট কথামাত্র। কিন্তু তারই মাঝে লুকিয়ে আছে গভীর দেশপ্রেম, অসামান্য ও অমানুষিক নির্যাতনের করুণ কাহিনি। লুকিয়ে আছে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে শত-সহস্র কিশোর ও তরুণরা কীভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন। প্রমাণ রেখে গেছেন— "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" আজ এক বাক্যে সবাই স্বীকার করছেন যে ওইসব মৃত্যুপাগল দামাল ছেলেরাই দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে গেছেন।

ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ—অত্যাচারী জে. এফ. ল্যোম্যান এবং ঢাকারই সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ই. হডসনকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করে অনন্য বিপ্লবী বিনয় বসু অসামান্য কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শেষপর্যন্ত হাজির হন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একনিষ্ঠ কর্মী রাজেন গুহের মেটিয়াবুরুজের বাড়িতে। রাজেন গুহের স্ত্রী সরযূদেবী বিপ্লবীদের কাছে একাধারে স্নেহময়ী জননী ও মমতাময়ী বৌদিদি।

এখন শুরু হল শলাপরামর্শ। কেমন করে বিনয়কে রক্ষা করা যাবে? প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মাদ ব্রিটিশ রাজের পুলিশ যেভাবে তার পেছনে লেগে আছে দিনের পর দিন তাতে তার পক্ষে বেশিদিন গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকা মোটেই সম্ভব হবে না।

সুভাষচন্দ্র বললেন গোপনে এবং ছদ্মবেশে বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। একই মতামত দিলেন সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎবাবু, পি. সি. রায়, লেডি অবলা বসু ও আরও কয়েকজন কৃতী মানুষ। শরৎবাবু বিনয়কে বিদেশে পাঠানো এবং পড়ানোর সব খরচপত্র তিনিই বহন করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। তা জেনে আচার্য পি. সি. রায় শরৎবাবুর কাছে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন। এমনকি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অন্যতম সিনিয়র সদস্য হরিদাস দত্ত মহাশয় অসামান্য দক্ষতায় পরের দিনই ভোর পাঁচটাতেই বিনয়ের জন্য জাহাজে ইতালি যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন বিনয় নিজেই। সে বলল বিদেশে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে দেশের মুক্তির জন্য কাজ করা সম্ভব হলে বিদেশে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন সে কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই নেই। বরং দেশে থেকেই করা সম্ভব এমন কোনো অভিযানের কথা চিন্তা করাই উচিত বলে মনে করি। অবশেষে ঠিক হল সেই ভয়ংকর পরিকল্পনাটি— রাইটার্স অভিযান। ইংরেজ শাসকদের সবচেয়ে বড়ো

ঘাঁটি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ওপর আঘাত হানা। অভিযানে প্রথম লক্ষ্য হল কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন সাহেব। আলিপুর জেলের রাজবন্দিদের ওপর যিনি অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে গেছেন। এমনকি সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা পর্যন্ত রেহাই পাননি তাঁর অত্যাচারের হাত থেকে। সেইসব অন্যায় ও অকথ্য অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে তো আজ সবার আগে।

ইতিমধ্যে নিউ পার্ক স্ট্রিটের বিপ্লবীদের আর এক গোপন আস্তানায় এসে হাজির হলেন দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত। খুদে দার্শনিক ও কবি দীনেশ সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। হাতে তার বিশ্বকবির বই পড়লে সে নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে যায়। অনেক সময়ই দেখা যেত আপন মনে দীনেশ কবিগুরুর কবিতা থেকে আবৃত্তি করছে আর অভিভূত বাদল তন্ময় হয়ে তা শুনছে। *প্রবাসী* পত্রিকায় দীনেশের লেখা কবিতা ও গল্প প্রায়ই প্রকাশিত হয়। তারই উপযুক্ত শাকরেদ বাদল তখনও পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র। আর বিনয় তখন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। কতই বা বয়স তাদের তিনজনের। বিনয় বাইশ। দীনেশ কুড়ি। আর বাদল আঠারো মাত্র। বয়স ও অভিজ্ঞতার বিচারে বিনয়কেই দলনায়ক নির্বাচিত করা হয়।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর অন্যতম নেতা প্রফুল্ল দত্ত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সাহায্যে রাইটার্সের ভেতরের যাবতীয় খুঁটিনাটির একটা নিখুঁত নকশা পাওয়া গেল। তৈরি করানো হল দামি সাহেবি পোশাক। যাতে পোশাকের ঠাট দেখেই প্রহরীরা পথ ছেড়ে দেয়।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সকাল হতে না হতেই নিউ পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি পর্ব। দীনেশ ও বাদল শুরু করে দিল বাজি ধরে খাওয়ার প্রতিযোগিতা। দেখে কে বলবে ওই দুই সোনার টুকরো ছেলে দুটোর মনে আছে এতটুকু মৃত্যুভয়। মরণ যেন তাদের দুজনের কাছে সামান্য খেলা মাত্র। খাওয়া-দাওয়ার পর পোশাক পরা শেষ হলে বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়ে গেলেন। ছেলে দুটোকে সময়মতো পৌঁছে দিতে হবে তো। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসে নিকুঞ্জবাবু দেখেন দীনেশ তন্ময় হয়ে বিশ্বকবির—'এবার ফিরাও মোরে'—কবিতাটির অংশবিশেষ আবৃত্তি করে চলেছে। আর বাদল মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনছে। দীনেশ বলে চলেছেন—

> যে শুনেছে কানে—
> তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে,
> সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন—
> নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন—
> শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।

একটা অব্যক্ত বেদনায় নিকুঞ্জবাবুর বুকটা হাহাকার করে ওঠে। ওদিকে দীনেশেরও হুঁশ হয়। তখন সে বলতে থাকে—'Get up বাদল'। এবার যে রওনা হতে হবে ভাই। আরও বলে—"এসেছে আদেশ বন্দরের কাল হলো শেষ।"

ওদিকে মেটিয়াবুরুজের বাড়িতে সরযূদেবীও বিনয়ের জন্য ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। আস্তে আস্তে সব কিছু খেয়ে নিয়ে খাঁটি ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত হল বিনয়। তারপর মাতৃসমা বৌদিদির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে শেষ বিদায় নিল। পরক্ষণেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন সরযূদেবী।

খিদিরপুরের পাইপরোডের মোড়। এক দিক থেকে বিনয়। আর অন্যদিক থেকে দীনেশ ও বাদল এসে মিলিত হল। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চড়ে রওনা হয়ে গেল তারা ডালহৌসি স্কোয়ার অভিমুখে।

বেলা তখন ঠিক ১২টা। কারা বিভাগেব সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন (Simpson) জরুরি ফাইল নিয়ে পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট জ্ঞান গুহর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন রাইটার্সে নিজের চেম্বারে বসে। ওই সময় সারা বাংলায় চলছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাইটার্সকে তাই করে তোলা হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। হঠাৎ তাঁর চেম্বারের দরজা থেকে ভেসে এল একটা গর্জন।—"আপনার জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করুন" গর্জন শেষ হতে না হতেই দুটো করে গুলি বেরিয়ে এল তিন তিনটে রিভলভারের মুখ থেকে। টু শব্দটি পর্যন্ত করার সময় পেলেন না অত্যাচারী কর্নেল সিম্পসন।

এবার লক্ষ্য হোম সেক্রেটারি মি. অ্যালবিয়ান সার। কিন্তু কোথায় তিনি? তবে হোম ডিপার্টমেন্টের কাচের শার্সিগুলো ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়তে লাগল কয়েক মিনিট ধরে। ইতিমধ্যে অন্যদিক থেকে ছুটে এলেন—ইন্সপেকটর জেনারেল মি. জোনস্ এবং মি. ফোর্ড। তাঁরাও গুলি ছুড়লেন বেশ কয়েক রাউন্ড। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বরং বেপরোয়া বিনয়, বাদল ও দীনেশের রিভলভারের দাপটের সামনে ব্রিটিশ রাজপুরুষদেরই গা-ঢাকা দিতে হল। আতঙ্কগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পড়ে গেল বাঁচাও বাঁচাও রব।

এবার শ্বেতাঙ্গদের রক্ষা করতে ছুটে এলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এবং তাঁর সহকারী ডেপুটি কমিশনার মি. গর্ডন। তাছাড়াও ছুটে এলেন মি. বার্ট। তাঁদের পেছন পেছন ছুটে এল কয়েক কোম্পানি সশস্ত্র পুলিশ। কিন্তু কিছুই করা গেল না। বিচার-সচিব মি. নেলসন পায়ে আঘাত পেলেন। হোম সেক্রেটারী মি. অ্যালবিয়ান যিনি অল্পের জন্য বুলেট-বিদ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন। কৃষি ও শিল্পসচিব মি. টয়লামের পোশাক ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। রাজস্বসচিব মি. প্রেন্টিসও অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। তবে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন দরজার কাছাকাছি পৌঁছে। তাছাড়াও মুখ থুবড়ে পড়লেন বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজপুরুষ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বিনয়, বাদল ও দীনেশ তখনও পর্যন্ত অক্ষত।

এরপরে তারা তিনজনই ঢুকে গেল তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য পাসপোর্ট অফিসের ঘরে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব কিছু তছনছ করে দিল। এরই মধ্যে এক বিশাল

দেহী পাদ্রি মি. জনসন ড্রেনপাইপ বেয়ে নেমে এসে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেন। দেখা গেল যতসব অভিনব ও বিচিত্র দৃশ্য। ভীত ও সন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গদের কেউ কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ কিছুই করতে না পেরে চোখ বুঁজে মনে মনে যিশুর ভজনা করছেন।

অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে ডাকতে হল গোর্খা বাহিনীকে। শুরু হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ। ব্যাপারটা এমন পর্যন্ত পৌঁছে গেল যে আর তা নিছক হামলা বা সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ রইল না। এমনকি ইংরেজ শাসকদের মুখপত্র *The Statesman* পর্যন্ত এই মারাত্মক সংঘর্ষকে—'বারান্দা ব্যাটল' (Varandah Battle) নামে অভিহিত করেছিল। একদিকে সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গোর্খা সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে তিনটি কাঁচা ছেলে যাদের একমাত্র হাতিয়ার জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অদম্য সাহস। হাঁটু মুড়ে পজিশন নিয়েছে অগণিত গোর্খা সৈনিক। বিনয়, বাদল ও দীনেশ মাটিতে শুয়ে পড়ে তাদের জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই সর্বতোভাবে অসম যুদ্ধের পরেও গোর্খাবাহিনী মোটেই সুবিধে করতে পারল না। কার সাধ্য ওই তিন মৃত্যুপাগল দেশপ্রেমিকদের দাপটের সামনে দাঁড়াতে পারে? বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। সামনের জিনিসও ধোঁয়ায় ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না।

কাজেই অনিবার্যভাবেই যুদ্ধের পরিকল্পনা পালটাতে রণাঙ্গন ছড়িয়ে দিতে হল। কখনও এ বারান্দায়। আবার কখনও বা আর এক বারান্দায়। তাব মধ্যেও মাঝে মাঝে বিনয়-বাদল ও দীনেশের কণ্ঠে পবিত্র সেই মন্ত্রোচ্চারণ 'বন্দে মাতরম্'। যা আবার রাইটার্সের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

সহসা একটা গুলি এসে দীনেশের পিঠে বেঁধে গেল। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না খুদে দার্শনিক দীনেশ। বেশ কিছুক্ষণ চলেছিল ওই অসম যুদ্ধ। হয়তো আরও বেশ কিছুক্ষণ চলত যদি না গুলি সব ফুরিয়ে যেত। গুলি শেষ হতেই তিনজনে একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর তিনজনেই একসঙ্গে শেষবারের মতো 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মারাত্মক সায়ানাইড বিষের ক্যাপসুল মুখে পুরে দিল। বাদল তখুনি শেষ। কিন্তু বিনয় ও দীনেশের রিভলভারে তখনও একটা করে গুলি অবশিষ্ট ছিল। তাই বাঁচবার কোনরকম সুযোগ যাতে না থাকে সেজন্য সুনিশ্চিত হতে তারা দুজনেই নিজ নিজ কপাল লক্ষ্য করে তাদের রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিল। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বিনয়ের ছোঁড়া গুলিটা তার কপাল চুম্বন করে বেরিয়ে গেল। আর দীনেশের ছোঁড়া গুলিটা তার ঘাড়ে ছোবল মেরে উড়ে গেল। ফলে দুজনেই অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে আবার সায়ানাইড বিষের ক্যাপসুল দুটো তাদের দুজনের মুখের মধ্যে অক্ষত থেকে যাওয়ায় তারা দুজনেই জীবিত রয়ে গেল।

বাদলের মৃতদেহ পাঠানো হল পুলিশের হেপাজতে। আর বিনয় ও দীনেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শাসকদের উদ্দেশ্য তাদের দুজনকে সুস্থ করে তুলে পরে ফাঁসিতে ঝোলানো।

হাসপাতালের পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে দুই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিনয় ও দীনেশ। দুজনেরই প্রায় সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ। বিনয়ের আবার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ইংরেজ জাতির প্রতিভূ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বিনয়ের অচৈতন্য অবস্থাতেই তার ডানহাতের আঙ্গুলগুলো বার বার বুটের তলায় মাড়িয়ে থেঁতলে দিয়েছেন। সিম্পসন হত্যার জ্বালা ভুলতে না পেরে এইভাবে কিছুটা শোধ তুলেছেন।

কিন্তু বিনয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের অভিলাষ অপূর্ণই রয়ে গেল। চিকিৎসা বিভাগের মেধাবী ছাত্র বিনয়ের ভালোভাবেই জানা ছিল যে ক্ষতস্থান কোনো রকমে বিষিয়ে গেলে রোগীকে আর কিছুতেই সারিয়ে তোলা যায় না। সুতরাং তার যা করণীয় তাই সে করল। জ্ঞান হতেই মাথার ক্ষতস্থানে বারুদমাখা হাতের আঙ্গুলগুলো গভীরভাবে ঢুকিয়ে দিল। ফল সেপটিক। বাঁচার আর কোনই আশা রইল না।

তখন তার বাবা ও মাকে অনুমতি দেওয়া হল সন্তানের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করে যাওয়ার জন্য। তাঁরা এলেন। আর এলেন এক পাদ্রিসাহেব অন্তিম মুহূর্তে যিশুর বাণী শোনাতে। কিন্তু কাকে শোনাবেন তিনি যিশুর বাণী। বিকারের ঘোরে বিনয় তখন বলে চলেছে—'অ্যাটেনশান'। 'ফরোয়ার্ড মার্চ'। 'লেফট-রাইট'- 'লেফট রাইট'-'চার্জ'। বাইবেল সরিয়ে নিয়ে নিজেই সরে গেলেন পাদ্রিসাহেব। বিনয়কে স্নেহভরে ডাকলেন বিনয়ের মা। আর বললেন—"আমরা এসেছি। একবার চোখ খুলে দ্যাখ বাবা।"

এবার সত্যিই বিনয় মায়ের ডাকে চোখ খুলল। তারপর তার ডান হাতটা আস্তে আস্তে কপালের কাছে নিয়ে এল স্যালুট করার ভঙ্গিতে। তারপরই সব শেষ। নিমতলা ঘাটে অগণিত মানুষের সমাগম হয়েছিল বিনয়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। পরের দিন আবার পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল কলকাতা ও শহরতলির সর্বত্র—"Benoy's Blood Beckons FOR MORE BLOOD"—রক্ত চাই-আরও রক্ত। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। এখন উপায়?

ঘটনার ঠিক সাত মাস পরে ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসি হয়েছিল। ওই দিন ভোর পাঁচটায় সার্জেন্ট দীনেশের সেলে প্রবেশ করে দেখেন যে সে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। সার্জেন্টের পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়িয়ে 'GOOD MORNING'—বলে অভিবাদন জানায় এবং তার বৌদিকে লেখা জীবনের শেষ চিঠিটা সার্জেন্টের হাতে তুলে দিয়ে ওটি পোস্ট করে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। তারপরই বলে, চলুন কোথায় যেতে হবে আমি প্রস্তুত।

ফাঁসির মঞ্চে যাবার পথে একটা স্নানের জায়গার সামনে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিয়ম হল ফাঁসির বন্দিদের স্নান সেরে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়। তা শুনে দীনেশ বেশ

খোশমেজাজে সূর্যস্তব করতে করতে স্নান সেরে নিল। তাবপরই ধীর অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চে উঠে প্রথমেই দড়িটা চুম্বন করল। পরক্ষণেই শেষবারের মতো বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি উচ্চারণ করে নিজের হাতে ফাঁসির দড়িটা গলায় পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

সেই মুহূর্তে জেলের বাইরে ও ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেল। চারদিক থেকে ধ্বনি উঠতে থাকল—"বন্দে মাতরম্"—"দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ"। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে —দোকান-পাট, ট্রাম-বাস, স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালত সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল। বিকেলে মনুমেন্টের নীচে সমবেত বিশাল জনসমুদ্র শপথ নিয়েছিল এই বলে—দীনেশ গুপ্ত আমরা তোমায় ভুবল না—কোন দিনও ভুলব না। পরের দিন লক্ষ-কোটি দেশবাসীর প্রাণের কথাটিকে রূপ দিতে *Daily Advance* পত্রিকা বড়ো বড়ো অক্ষরে শিরোনামা লিখেছিল—"Dauntless Dinesh Dies at Dawn". জেল সার্জেন্ট পরে বলেছিলেন—আমাকে অনেকের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকতে হয়েছিল, কিন্তু এই মানুষটি যেন সবার থেকে আলাদা। ওঁর মতো মৃত্যুকে জয় করার শক্তি আর কারোর মধ্যে দেখিনি।

মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইতিহাসের হয় না। কোথায় আজ সেই মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিক বিনয়? কিংবা মৃত্যুপাগল কিশোর-বাদল? অথবা দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কবি ও দার্শনিক দীনেশ? তিন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরই আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের অক্ষয় কীর্তি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। এজন্যই তাঁদের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথাগুলি—

ওরা বীর! ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়,<br>
ওদের কাহিনী, বিদেশীর খুনে,<br>
গুলি-বন্দুক-বোমার আগুনে—<br>
আজো রোমাঞ্চকর।

এইসব দামাল ছেলেদের সমাধির ওপরই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইমারত। ওদের ঋণ অপরিশোধ্য।

## চব্বিশ

# বিয়াল্লিশের অগাস্ট বিপ্লব

জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

দিনটা ছিল ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখ। মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে প্রায় দু-লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দিচ্ছিলেন। চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে এটিই ছিল তাঁর বৃহত্তম জনসম্ভাষণ। হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন তাঁর হাতে একটি সান্ধ্য দৈনিকের সংখ্যা এগিয়ে দিলেন। ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সুভাষচন্দ্র বিশের দশকের শেষ দিকের থেকে করে আসছিলেন। বরাবরই বলে আসছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে সুবর্ণ সুযোগ।

১৯৩৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মিউনিক প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান্ধীজিকে বলেছিলেন যে, এক বছরের মধ্যেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কী গভীর জ্ঞান। আর কী অপূর্ব দূরদৃষ্টি। বছর না ঘুরতেই ১৯৩৯-এর পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখেই জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসল। তখন মুখ রক্ষা করতেই ইংল্যান্ডকে তেসরা সেপ্টেম্বর তারিখে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হল। তিনি গান্ধীজিকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, মিউনিক প্যাক্ট আসলে হল আসন্ন যুদ্ধের আগে প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে আরও বলেছিলেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে (গান্ধীজিকে) কিন্তু ব্রিটেনকে 'কুইট ইন্ডিয়া' বলে চরমপত্র (আলটিমেটাম) দিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যাবার দাবি জানাতে হবে।

কিন্তু তিনি নিজে না বলে গান্ধীজির মুখ দিয়ে কথা দুটি বলাতে চেয়েছিলেন কেন? কারণ সুভাষচন্দ্রের নিজের বিশ্বাস ছিল যে ওই কথা দুটি তিনি নিজে বললে হয়তো বিশ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কথা দুটি ওই সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখ দিয়ে বলাতে পারলে অবশ্যই বিশ কোটি মানুষ সাড়া দিয়ে ছুটে আসবে। সেজন্যই তো ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারিতে চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত সবসময়ই চেষ্টা করেছিলেন গান্ধীজিকে দিয়ে 'কুইট ইন্ডিয়া' উচ্চারণ করিয়ে ব্রিটেনকে ভারত ছেড়ে যাবার দাবি জানিয়ে চরমপত্র (আলটিমেটাম) দেওয়াতে। কিন্তু গান্ধীজির দ্বিধা কাটেনি কিছুতেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপন্ন ইংল্যান্ডকে তার দুঃসময়ে বিব্রত করা কি উচিত হবে? কাজটা কি অহিংসা নীতির বিরোধী কাজ হয়ে যাবে না? আজাদ, প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলেই দোদুল্যমান। আর জওহরলাল তো ঘোষণাই করে দিয়েছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধে বিপন্ন ইংল্যান্ডকে তার দুঃসময়ে বিব্রত করার তিনি ঘোরতর

বিরোধী। কিন্তু ১৯৪১-৪২-এর শীতকালে জাপানের হাতে মার খেতে খেতে ব্রিটেন ক্রমাগত পিছু হঠতে থাকায় যুদ্ধ ভারতের পূর্ব-সীমান্তে এসে পৌঁছে যায়। তখন ভারতের নিবাপত্তাব প্রশ্নটাই অনেক বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মি. ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও কুয়োমিংতাং চিনের (Nationalist China) রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাইশেক মিত্ররাষ্ট্র ব্রিটেনকে ভারতের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ভাবতের সঙ্গে কোনরকম রাজনৈতিক বোঝাপড়া করার ব্যাপাবে ঘোর বিরোধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. উইনস্টন চার্চিল সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতনের পরই ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে তাঁরই যুদ্ধ ক্যাবিনেটেব সদস্য স্যাব স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠান ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের পূর্ণ সহযোগিতাব বিনিময়ে যে প্রস্তাবগুলি ক্রিপস্ সাহেব ভারতের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দিতে চান তা শেষপর্যন্ত কোনো দল বা সম্প্রদায়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

যদিও কোন দল বা কোন নেতারই ক্রিপস্ প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি তবুও একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, গান্ধীজির অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারটা অবধারিত হযে উঠেছিল। তিনি সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থান কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই যা কিছু পাবার তা ওই মুহূর্তেই না পেলে তা হয়ে দাঁড়াবে—"A post-dated cheque on a crashing bank." বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে গান্ধীজি বিশ্বযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেই চাইছিলেন। আর তাঁর কথাবার্তায় ফুটে উঠছিল সুভাষচন্দ্রেরই সুর।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, গান্ধীজি আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারকে যা বলেছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে, ফিশার ১৯৪২-এর তেসরা জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত আটদিন সবরমতী আশ্রমে অবস্থান করে গান্ধীজির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গান্ধীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি ক্রিপস্ প্রস্তাবের সংশোধিত আকারের কোন প্রস্তাব আবার তাঁকে দেওয়া হয় তবে কি তিনি তা গ্রহণ করবেন? উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন—"Nothing along the lines of the Cripps offer. I want their complete and irrevocable withdrawal." গান্ধীজি আরও বলেছিলেন যে— "The original idea of asking the British to go burst upon me suddenly. It was the Cripps fiasco that inspired the idea. Hardly had he gone when it seiged hold of me." (Louis Fisher, *A Week with Gandhi*, p. 81)

"ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হবার পরই—বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে উল্লাসিত নেতাজি দেশবাসীদের উদ্দেশে বলেছিলেন—প্রিয় ভাই-বোনেরা, ক্রিপস্-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন জেনে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি। এখনো

আমাদের দেশে এমন মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের কংগ্রেসি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ বিনা শর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলতে এতটুকু বাধে না তাদের। এই সমস্ত ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে কংগ্রেসের আদর্শের কথা তাঁরা ভুলে গেছেন? কী প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে? সেদিন যুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি গৃহীত হয়নি? এমন কথাও কি বলা হয়নি যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াতে চাইলে আমরা সব শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব?"

"এম. এন. রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন বলেই ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে সহযোগিতার কথা বলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাইব।"

"ভারতের সব চাইতে বড়ো শক্তি যুব সম্প্রদায়। তাদের এখন একমাত্র কর্তব্য বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর নতুন এক স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে। ............. জয় হিন্দ!"

(কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*, পৃঃ ১২৪-২৫)

ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হবার পর সারা দেশে দেখা দেয় চরম অশান্তি। ভারতবাসী মাত্রেরই ধারণা হয় যে, ওই মুহূর্তে ব্রিটেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে ভারত জাপ-আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবে। তবে একই সঙ্গে এ আশঙ্কাও ছিল, ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় ব্রিটেন পোড়া-মাটি নীতি অবলম্বন করে ভারতের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। ওই উভয় সংকটের দোটানায় সারা দেশ নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এমনকি, 'জাতির জনক' গান্ধীজি পর্যন্ত একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। চৌরিচৌরার বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে যিনি একদিন অসহযোগ আন্দোলনই প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ১৯২২-এর ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

১৯৩৮ থেকে বার বার অনুরোধ করেও সুভাষচন্দ্র যাঁকে দিয়ে 'কুইট ইন্ডিয়া' উচ্চারণ করিয়ে ব্রিটেনকে চরমপত্র (আলটিমেটাম) দেওয়াতে পারেননি, সেই গান্ধীজিই ১৯৪২-এর ১৯ এপ্রিল তারিখে তাঁর *হরিজন* পত্রিকায় লিখলেন "আলাপ-আলোচনার আর কোন সার্থকতা নেই। আর আমি কখনও মন্ত্রীত্ব বা অন্য কোন কিছুর জন্য বড়োলাটের কাছে দরবার করতে যাব না। হয় ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ স্বীকার করে নেবে, নয়তো নেবে না। তবে এবার শুরু হবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ—Open Rebellion—আর এটিই হবে আমার জীবনের শেষ সংগ্রাম।"

১৯৪২ সালের ৬ জুলাই ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন—"সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে কোন আন্দোলন বা সংগ্রাম শুরু করা ঠিক হবে না। ওই আন্দোলন আসলে অক্ষশক্তি জোটেরই সুবিধে করে দেবে।"

জবাবে গান্ধীজি বলেছিলেন জাপান যে ভারত আক্রমণ করবেই তা কেউ জোর করে বলতে পারছে না। তবে যদি আক্রমণ কবেই তা ভারতে ব্রিটিশদের উপস্থিতির জন্যই করবে। কারণ জাপান ব্রিটেনেরই শত্রু। আমাদের নয়। এ-ব্যপারে গান্ধীজি তাঁর মতামত ছোট্ট একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"তোমরা আমার সঙ্গে না এলে আমাকে একলাই চলতে হবে। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আমাকে বাধা দেয়, এমনকি সারা ভারতবর্ষ যদি আমি ভুল করছি বলে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে, আমি এগিয়ে যাব। এগিয়ে যাব শুধু ভারতের কল্যাণের জন্যই নয়—বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে। আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আর প্রতীক্ষা করতে পারিনে। মি. জিন্নার মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা কবে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যদি আরও কালক্ষেপ করি তাহলে ঈশ্বরের নিকট শাস্তিভোগী হব।"

(কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*, পৃঃ ১২৬)।

তৎকালীন ভারত-সচিব মিঃ আমেরি হুমকি দেন যে, গান্ধীজি যদি কোন আন্দোলন শুরু কবেন তবে অত্যন্ত কঠোর হাতে তা দমন করা হবে। আমেরির হুমকির জবাবে গান্ধীজি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতে যে যুদ্ধায়োজন চলছে তা ব্রিটিশের স্বার্থেই অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চলছে। তাই ওই সমরোদ্যোগের পেছনে তাঁর কোন নৈতিক সমর্থন নেই, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্রিটিশদের উপস্থিতির জন্য জাপান ভারত-আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়েছে। ব্রিটিশ ভারত থেকে বিদায় নিলে জাপান আর ভারত আক্রমণ করবে না। আর কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যে নিজেদেব স্বার্থেই বোঝাপড়া করে নেবে এ ব্যাপারেও তিনি সুনিশ্চিত।

গান্ধীজির মানসিকতা ও নীতির এই আমূল পরিবর্তনে বিস্মিত গান্ধীবাদী কংগ্রেসিরা উপলব্ধি করেন যে, গান্ধীজি ওই মুহূর্তে সুভাষচন্দ্রের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। এক প্রমাণও পাওয়া যায় মৌলানা আজাদের আত্মজীবনীর (India Wins Freedom) পাতায় যেখানে মৌলানা সাহেব লিখেছেন—"I also saw that Subhas Bose's escape to Germany made a great impression on Gandhiji ........ and now I found a change in his outlook."

(কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*, পৃঃ ১২৭)।

১৯৪২-এর ৭ ও ৮ অগাস্ট বোম্বাইয়ে দুদিন ধরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। অবশেষে ৮-ই অগাস্টের গভীর রাত্রে ৬ই জুলাই ওয়ার্ধায় গৃহীত ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঘটলে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ....... প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়েছিল যে, জনসাধারণ যেন ধৈর্য সহকারে ও সাহসের সহিত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামে অনুগত সৈনিকের ন্যায় তাঁর আদেশ মেনে

চলে। তারা যেন মনে রাখে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় আসতে পারে যখন কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্বই হয়তো থাকবে না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘন না করে নিজেরাই কাজ করবেন। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসী সংগ্রামকালে নিজেই নিজের পথ-প্রদর্শক হবেন। সংগ্রামের মন্ত্র হবে—'Do or Die', করো, না হয় মরো।

উপস্থিত প্রতিনিধিদের সেদিন গান্ধীজি বলেছিলেন—"আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই, এমনকি আজকের রাত্রির মধ্যেই, যদি সম্ভব হয় ভোর হওয়ার আগেই। আমি আপনাদের ছোট্ট একটা মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছি। মন্ত্রটি আপনারা আপনাদের মনে গেঁথে নিন—'Do or Die' 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। হয় দেশকে স্বাধীন করব, নতুবা দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় মৃত্যু বরণ করব।" সুভাষচন্দ্র চার বছর আগে থেকেই বলে আসছিলেন দুটি কথা 'কুইট ইন্ডিয়া', ভারত ছাড়ো। চার বছর পরে গান্ধীজি তা গ্রহণ করে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন আরও দুটি কথা 'Do or Die', 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞা আর দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল জাতির জনক গান্ধীজির আবেগ।

৯-ই অগাস্টের ভোরের আলো ফোটার আগেই ব্রিটিশ শাসকরা গান্ধীজি সহ কংগ্রেসেব প্রথম সারির সব নেতাদের গ্রেপ্তার করল। কংগ্রেস দলকে বেআইনি ঘোষণা করে দলের তহবিলও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। সংবাদপত্রগুলিরও কণ্ঠরোধ হল। প্রতিবাদে ১৮ অগাস্ট থেকে পত্রিকা অফিসগুলি নিজেরাই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিল।

ব্রিটিশরাজ গান্ধীজিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম শুরু হবার কোন সুযোগই দিল না। তাই গান্ধীজির পক্ষে তাঁর জীবনের শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করার ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে গেল। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা কারারুদ্ধ বলে কি এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায়? বিশেষত যখন বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পুড়ে ইংল্যান্ড ছাই হয়ে যেতে বসেছে। অস্থিব ও চঞ্চল হয়ে উঠল বামপন্থী জনতা—বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক ও সোসালিস্ট পার্টির সদস্য ও কর্মী। তাঁরা উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন বেতারের মাধ্যমে জার্মানি থেকে পাঠানো নেতাজির নির্দেশের জন্য।

এরই সমর্থন রয়েছে Coupland-এর *Indian Politics* গ্রন্থে যখন তিনি লিখেছিলেন—"The revolutionaries of extreme left, specially in Bengal, were still ready to take their orders from Mr. Subhas Chandra Bose, even if they come over radio from Berlin." (Coupland, *Indian Politics*, p. 268).

## নেতাজির ভূমিকা

**১৯৪২-এ ৩১ অগাস্ট তারিখে আন্দোলন সম্পর্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ ও কর্মসূচি ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ রেডিওর মাধ্যমে। নেতাজি সেদিন**

বলেছিলেন—"আজাদ হিন্দ রেডিও, বার্লিন, আমি সুভাষ বলছি। বন্ধুগণ! ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে দাবাগ্নির মতো। এই সংগ্রাম এখন ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে পল্লি অঞ্চলে। ............... স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা যত বেশি আত্মবলি দেব, যত বেশি উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করব, পৃথিবীর সামনে ততই আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। .................. নেতৃবৃন্দ কারাগারে তা বলে ভয় পাবার বা হতাশ হবার মতো কিছু নেই। বরং তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও নির্যাতনের ইতিহাস সমস্ত জাতির কাছে প্রেরণা নিয়ে আসবে।"

কংগ্রেস নেতারা কারারুদ্ধ বলে বেগতিক অবস্থা বুঝেই নেতাজি স্বয়ং 'আজাদ হিন্দ রেডিও'-র মাধ্যমে সংগ্রামকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—যেমন, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা ; স্কুল-কলেজ ও কলকারখানায় লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া। ছাত্রী ও মহিলাদের মাধ্যমে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান করা এবং আন্দোলনকারীদের জন্য আশ্রয় ও সেবার ব্যবস্থা করা ; ব্রিটিশ ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতির সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করা ; ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা ; ব্রিটিশ শাসক, অফিসার ও কর্মীদের কোয়ার্টার্স ও বাসস্থান ঘেরাও করে অবিরত 'ভারত ছাড়ো' ধ্বনি দেওয়া ; যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদনে নিযুক্ত কলকারখানা, থানা, পোস্ট অফিস ও রেলস্টেশন আক্রমণ করা ; টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া; রেল লাইন উপড়ে ফেলা।

পরিশেষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—তোমাদের স্লোগান হোক 'Now or Never' এবং 'Victory or Death'.

**"বন্ধুগণ! আমি নিঃসন্দেহ যে, এই কর্মসূচি কার্যে পরিণত করতে পারলে ব্রিটিশরাজের শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়বেই। ............ সবশেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এই আন্দোলন প্রয়োজন হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তটিই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। আপনাদের বিপ্লবের বাণী হোক হয় এখন, নয়তো কখনো না। Do or Die, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। জয়হিন্দ!"**

**(শৈলেশ দে, *আমি সুভাষ বলছি*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৯)**

**নেতৃত্বহীন ও সংগঠনহীন ক্ষিপ্ত জনতা শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের নেতৃত্বে থানা, পোস্ট-অফিস ও রেলস্টেশন আক্রমণ করল। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হল। রেললাইন একের পর এক উপড়ে ফেলা হল। সরকারি কোষাগার ও সরকারের অফিস ও কোর্ট-কাছারি প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। স্কুল-কলেজ ও কল-কারখানায় লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ (তখন যুক্ত**

প্রদেশ), ওড়িশা, কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আন্দোলন গণবিদ্রোহের রূপ নিল।

জওহরলাল নেহরু ১৯৪২-এর অগাস্ট বিপ্লব সম্পর্কে লিখেছিলেন—"নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ-আয়োজন নেই, কোন মন্ত্রবল নেই, অথচ একটা অসহায় জাতি আপনা হতেই কর্মপ্রচেষ্টার অন্য কোন পথ না পাইয়া বিদ্রোহী হইল, এদৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার।" (কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*, পৃঃ ১২৯)

নেহরুজি যদি আন্তরিকভাবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতেন তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে, এই বিদ্রোহের অপ্রত্যক্ষ নায়ক ছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র। এ প্রসঙ্গে তাই অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত কংগ্রেস নেতা ড. বি. কে. কেশকার তাঁর *Netaji His Life and Work* বইটিতে যা লিখেছিলেন—"Subhasbabu had been fighting in the Congress all along for a more aggressive and realistic strategy in our national struggle. He, with other radicals and socialists, had been maintaining all along that it was during the war that we could fight the British Government. We must try to take advantage of the difficulties of Great Britain and if we lost this opportunity we might not get any for a long time to come. So, in fact, this revolutionary change in the mind of Gandhiji, which ultimately led to the movement of 1942, is a triumph of Subhas babu and other radicals." (কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*, পৃঃ ১২৯)

আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ শাসকদের মেশিনগান ব্যবহার করতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণও করতে হয়েছিল। যেসব অঞ্চলে গণ-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল সেইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর পিটুনি কর (Punitive tax) বসানো হয়েছিল এবং নৃশংসভাবে তাদের চাবুক মারা হয়েছিল। প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বলাবাহুল্য, ১৮৫৭ সালের পর সরকারি দমননীতির এমন ব্যাপক তাণ্ডবলীলা আর কখনও দেখা যায়নি। সারা দেশটাকেই পুলিশ ও মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মেদিনীপুরের 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' যা ব্রিটিশরাজের সমান্তরাল সরকার হিসেবে চালু ছিল প্রায় পৌনে দু-বছর ধরে—১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ থেকে ৩১ অগাস্ট ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৪ সালের ৫ মে তারিখে আমেদাবাদ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই গান্ধীজি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের তৃতীয় সর্বাধিনায়ক সুশীল ধাড়ার কাছে নির্দেশ পাঠান যে, অবিলম্বে জাতীয় সরকার ভেঙে দিয়ে তিনি নিজেও যেন পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তখন জাতির জনকের নির্দেশ মেনে নিয়েই সুশীল ধাড়া জাতীয় সরকার ভেঙে দিয়ে নিজেও আত্মসমর্পণ করেছিলেন

১৯৪৪ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। অথচ নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৪ সালের অগাস্ট মাসেই অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন গভর্নর মি. কেসি এক গোপন ইস্তাহারে বড়োলাট লর্ড ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন যে, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ইদানীং অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

## জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর সহকর্মীদের অনন্য ভূমিকা

ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন ও শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির অসামান্য ভূমিকাই সেদিন অগাস্ট বিপ্লবের দীপশিখাটি নিভে যেতে দেয়নি। জাতীয় কংগ্রেসের সব প্রথম সারির নেতারা কোন কর্মসূচি গ্রহণ করার আগেই বন্দি হয়ে যাবার পর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ রেডিও-র মাধ্যমে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ঘোষিত কর্মসূচিকে মাথায় রেখে এবং নিজেরা আত্মগোপন করে থেকে যেভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সোসালিস্ট নায়ক-নায়িকারা বিপ্লবের অগ্নিশিখাটি প্রজ্বলিত রেখেছিলেন তার কোন তুলনাই হয় না। বস্তুত তাঁদের নেতৃত্বের জন্যই সেদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি তরুণ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রেরা অধীর ও উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২-এর ৯-ই নভেম্বর। অল্প অল্প শীতের কুয়াশা মাখানো সকালে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল একটা বিস্ফোরক খবরে। গ্রেপ্তারের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ বন্দি ছিলেন হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। ৮-ই নভেম্বর তারিখের গভীর রাত্রে তিনি জেল থেকে বেপাত্তা হয়ে গেলেন ওখানকার ছ'জন সহবন্দিকে সঙ্গে নিয়ে। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বেনারস হয়ে দিল্লিতে এসে ঘাঁটি গাড়লেন। তাঁর নির্দেশে দুটি গোপন বেতারকেন্দ্রও বসানো হল সংগ্রামী জনতাকে নির্দেশ দেবার জন্য। একটি কেন্দ্র কলকাতায়, অন্যটি বোম্বাইয়ে। বোম্বাইয়ের বেতার কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন স্বয়ং রামমনোহর লোহিয়া। অচিরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে।

জয়প্রকাশজি তখনও দিল্লি থেকেই সব কিছু পরিচালনা করছিলেন। ওই দিল্লিতেই ডেকে পাঠালেন সব প্রদেশের সংগ্রামী নেতাদের। তারপর গোপন বৈঠকে ঠিক হল যে— দিল্লি, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ চার কেন্দ্র থেকেই একই ধারায় আন্দোলন পরিচালিত হবে।

ডিসেম্বর ১৯৪২। জয়প্রকাশজি তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকেই এক দীর্ঘ ইস্তাহার প্রচার করলেন সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশে। যার শেষাংশটা এখানে তুলে ধরছি—"In the end, Comrades, I should like to say that it has made me inexpressibly happy and proud to be able once again to place my services at your disposal. In serving you the last words of our leader—'Do or Die' shall be my guiding star, your co-operation my strength and your command my

pleasure." (from somewhere in India) Jaiprakash Narain, December, 1942. (শৈলেশ দে, *আমি সুভাষ বলছি*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯)

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে জয়প্রকাশজি তাঁর গোপন আস্তানা সরিয়ে আনলেন নেপালে। ইচ্ছে ছিল নেপাল থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করার। কিন্তু তেমন সুবিধা হল না। মে মাসে (১৯৪৩) আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে রাখা হল হনুমান সেন্ট্রাল জেলে। এদিকে তাঁর অনুগামীরা তখন মরিয়া। যে-কোন উপায়েই হোক, জয়প্রকাশজিকে মুক্ত করতেই হবে। একদিন হঠাৎ সশস্ত্র বিপ্লবীরা রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেলখানার ওপর। প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত জেলরক্ষীরা কোন বাধা দিতে পারল না। আবার জেল ভেঙে বেরিয়ে এলেন অগাস্ট বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক জয়প্রকাশজি। এবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন আরও ছ'জন সহবন্দি বিপ্লবীদের। চলে এলেন সোজা কলকাতায়। সারা মুখে চাপ চাপ দাড়ি-গোঁফ। পরনে মুসলমানি পোশাক। ভালোভাবে লক্ষ করেও চেনা যায় না। এবার উদ্দেশ্য গোপনে ভারতের পূর্বসীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না আর। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে আবার ধরা পড়ে গেলেন।

জয়প্রকাশজি গ্রেপ্তার হওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই ১৯৪৪-এর মে মাসেই ধরা পড়ে গেলেন অন্য সোসালিস্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়া। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরই বিপ্লবের গতি একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল। তারও বেশ কিছুদিন আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন অচ্যুত পট্টবর্ধন। কিন্তু কিছুতেই ধরা যায়নি অরুণা আসফ আলিকে। শত চেষ্টা করেও ব্রিটিশরাজের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ শ্রীমতী আসফ আলির কোন হদিশই করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তিনি নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৬-এর ২৬শে জানুয়ারি যখন ওঁদের বিরুদ্ধে ঘোষিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল তার ঠিক পরেই। এই অসামান্যা নেত্রী সম্পর্কে শ্রী শৈলেশ দে কী বলেছেন এবার দেখা যেতে পারে—"রূপকথার নায়িকা অরুণা আসফ আলি তখন কলকাতায়। মাথার দাম তাঁর ধার্য হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। হন্যে হয়ে শিকারি কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সুদক্ষ গোয়েন্দার দল। যে করে হোক অরুণা আসফ আলিকে চাই-ই-চাই। কিন্তু কোথায় অরুণা আসফ আলি? কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তাও বলেছেন কতবার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বুদ্ধির লড়াইতে সবাইকে হার মানতে হয়েছে শেষপর্যন্ত।"

(শৈলেশ দে, *আমি সুভাষ বলছি*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬)

## গান্ধীজি ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের প্রকৃত ভূমিকা

যদিও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি, তবুও একথা বললে মোটেই অন্যায় হবে না যে অগাস্ট বিপ্লবে গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের

কোন ভূমিকাই ছিল না। প্রসঙ্গটি বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় যদি চারটে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যায়। (১) প্রথমত, কার মনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম উদয় হয়েছিল? (২) দ্বিতীয়ত, অগাস্ট আন্দোলনের কর্মসূচি কে বা কারা প্রণয়ন করেছিলেন? (৩) তৃতীয়ত, কে বা কারা আন্দোলন শুরু হবার পর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? এবং (৪) চতুর্থত, গান্ধীজির অহিংসা নীতিই কি ওই অগাস্ট বিপ্লবে অনুসৃত হয়েছিল?

সকলেই জানেন যে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিকল্পনাটি গান্ধীজির নয়, সুভাষচন্দ্রের। গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনাটি জাতীয় কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন মাত্র।

আসলে 'ভারত ছাড়ো' বা 'কুইট ইন্ডিয়া' কথা দুটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রেব মুখ থেকেই ১৯৩৮-এর জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে। তখন তিনি বলেছিলেন—"ইংবেজ ভারত ছাড়ো, অবিলম্বে তোমার হাত ওঠাও আমাদের দেশ থেকে।"

তারপব ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসের অধিবেশনেও শোনা গিয়েছিল সেই একই কথা—"ইংরেজ বিদেয় হও। মাত্র ছ'মাস সময়। তার মধ্যেই তোমাদের চলে যেতে হবে আমাদের দেশ ছেড়ে। নয়তো শুরু হবে সংগ্রাম।"

১৯৩৯-এর অক্টোবর মাসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনে শোনা গিয়েছিল সেই একই সুর। আর একথা তো কারোর অজানা নয় যে, ওই ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করার জন্য গান্ধীজির ওপর চাপ সৃষ্টি করায় এবং বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির বিরাগভাজন হয়েছিলেন বলেই তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। যার শেষ পরিণতি হয়েছিল কংগ্রেস দল থেকেই সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার।

তারপর ১৯৪১-এর জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবার পর গান্ধীজির মনে কেমন যেন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন থেকে তাঁর দক্ষিণপন্থী অনুগামীদের চাইতে সুভাষচন্দ্রকেই তিনি তাঁর বেশি কাছের মানুষ বলে মনে করতে থাকেন। তারপর ১৯৪২-এর জুন মাসে (৩/৬/৪২ থেকে ১০/৬/৪২) সবরমতী আশ্রমে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি লুই ফিশারের কাছে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন—"I regard Bose as a patriot of the patriots". (Louis Fisher, *A Week with Gandhi*, p. 23) অবশেষে সুভাষচন্দ্রের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। আর তাঁর ওই সিদ্ধান্তের কথা গান্ধীজি লুই ফিশারকে জানিয়েও দেন। আরও বলেন যে এবার আর কোন মতেই তিনি মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দেবেন না। (Louis Fisher, *A Week with Gandhi*, pp. 81-82)

দ্বিতীয়ত, এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচিও গান্ধীজির নয়, সুভাষচন্দ্রের ও জয়প্রকাশ নারায়ণের। আসলে কর্মসূচি সম্পর্কে গান্ধীজির কোনো সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। নইলে ক্রিপস্ ফিরে যাবার পর থেকেই ৯-ই অগাস্ট ভোরবেলা গ্রেপ্তার বরণ করার আগে পর্যন্ত পাঁচ মাস সময় পেয়েও তিনি কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে নি কেন? এই ধারণাই সমর্থিত হয় মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরুর লেখায়। মৌলানা সাহেব তাঁর আত্মজীবনী *India Wins Freedom* গ্রন্থটিতে লিখেছেন যে, ৬ই জুলাই তারিখের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দিতে ৫ই জুলাই ওয়ার্ধা পৌঁছে প্রথম শুনতে পাই যে, গান্ধীজি আন্দোলন শুরু কবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তখন আজাদ সাহেব আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মাজি কোন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন কিনা জানতে চেয়ে বুঝতে পারেন যে কর্মসূচি সম্পর্কে গান্ধীজির সুস্পষ্ট কোন ধারণাই নেই। তাই আজাদ সাহেব লিখেছেন—"When I pressed him to tell us what exactly would be the programme of resistance, he had no clear idea." (R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement,* Vol. III, p. 527)

এখন দেখা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু কী লিখেছেন—"Neither in public nor in private at the meetings of the Working Committee did he hint at the nature of action he had in mind" (*History of the Freedom Movement*, (Vol. III, p. 546).

অগত্যা বেগতিক অবস্থা বুঝে সুভাষচন্দ্রকেই বার্লিন থেকে ১৯৪২-এর ৩১ অগাস্ট তারিখে আজাদ হিন্দ রেডিও-র মাধ্যমে কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঘোষণা করে দিতে হয়েছিল। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আজাদ হিন্দ রেডিও-র তিনটি কেন্দ্র থেকে ৬টি ভাষার মাধ্যমে (ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, পার্শি, তামিল ও তেলেগু) অবিরত নির্দেশ পাঠিয়ে সুভাষচন্দ্র হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও সংগ্রামী দেশবাদীদের পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত। তবে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর কয়েকজন সোসালিস্ট সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে ১৯৪২-এর ৯ নভেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত। তাই তো বরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"The Revolution of 1942 threw up one prominent all-India leader, namely, Jaiprakash Narain. His "Appeal to All Fighters for Freedom" is a revealing document of first rate importance throwing light on the gradual passing away of Gandhian non-violence which had hitherto dominated the Congress politics." (R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement*, Vol. III, p. 558)

## ভারতীয় রাজনীতি থেকে অহিংসা নীতির অবলুপ্তি

বলাবাহুল্য ৯-ই অগাস্ট ১৯৪২ তারিখ থেকেই ভারতের রাজনীতি থেকে অহিংসা নীতিরও অবসান সূচিত হয়েছিল। ৫-ই মে ১৯৪৪-এ আমেদাবাদ জেল থেকে মুক্ত হবার

পর গান্ধীজি নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন এবং সেজন্যই আন্দোলন অহিংসার পথে না চলায় অগাস্ট আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমতটাও একবার দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—"How strong was the revolutionary feeling may be gathered from the fact that shortly after the arrest of Gandhi in 1942, the Socialist wing of the Congress, under the leadership of Jaiprakash Narain, who was loved and esteemed by Gandhi, repudiated the Gandhian non-violence, spoke the language of violence and adopted a revolutionary programme" (*History of the Freedom Movement,* Vol. III, p. 555). ড. মজুমদার আরও বলেছেন—"After the year 1942, the cult has never played any active role either in the Congress dominated Indian politics or in the life of the Indian people. It is now a sacred memory at the best, and a catching slogan at the worst." (*History of the Freedom Movement*—Vol. III, p. 534)

মনে রাখতে হবে অহিংসার পথ পরিহার করার জন্য গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিরা জয়প্রকাশজির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ওই সমালোচনার জবাবে জয়প্রকাশজি বলেছিলেন—"Well, we have declared ourselves independent and also named Britain as an aggressive power. We are, therefore, justified within the terms of the Bombay Resolution itself to fight Britain with arms. If this does not accord with Gandhi's principles, that is not my fault." (*History of the Freedom Movement*, Vol. III, p. 552)

## অগাস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ

আগস্ট বিপ্লব শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। নেতৃত্ববিহীন ও সংগঠনহীন আন্দোলনের পক্ষে সাফল্য অর্জন বাস্তবিকই সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও, ব্রিটিশ শাসকরা অত্যন্ত নির্মমভাবে এবং কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করতে এতটুকু ইতস্তত করেনি। এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার প্রকৃত কারণ হিসেবে স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ যে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন সে দুটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

জয়প্রকাশজির উল্লিখিত কারণ দুটির মধ্যে প্রথমটি হল দক্ষ সংগঠনের একান্ত অভাব। জয়প্রকাশজি বলেছেন যে—"The lack of effective organisation was so complete that even important Congressmen were not aware of the progress of the Revolution." (*History of the Freedom Movement*, Vol III, p. 558)

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে জয়প্রকাশজি বলেছেন যে—"After the first phase of the rising was over, there was no further programme placed before the people. After they had completely destroyed the British-Raj in their area, the people considered their task fulfilled and went back to their homes, not knowing what more to do. Nor was it their fault. The failure was ours. We should have supplied them with a programme for the next phase." (*History of the Freedom Movement*, Vol III, pp. 558-559)

অগাস্ট বিপ্লব শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও স্বীকার করতেই হবে যে, এই বিপ্লবই দেখিয়ে দিয়েছিল ভারতবাসীরা মৃত্যুভয় জয় করতে শিখেছে। আর তাই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথাগুলি উল্লেখ করে এই আখ্যায়িকা শেষ করতে চাই। নেতাজি বলেছিলেন—"In the history of India's struggle, 1942 will remain an unforgettable landmark indicating the psychological transition from passive to active resistance." (*আমি সুভাষ বলছি*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১)।

## পঁচিশ

# তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার (১৯৪২-৪৪)

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে বা অগাস্ট বিপ্লবে অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার অবদান এক কথায় অবিস্মরণীয়। তার মধ্যে আবার তমলুক মহাকুমায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমান্তরাল সরকার হিসেবে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের ভূমিকা প্রায় অবিশ্বাস্য।

১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর 'ভারত ছাড়ো' বা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ডাকে সাড়া দিয়ে পাঁচটি বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা তমলুক শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পশ্চিম দিক থেকে আসা মিছিলটি থানাব কাছাকাছি আসতেই শুরু হয়ে গেল পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ। কিন্তু শোভাযাত্রীদের বিরত করা গেল না। তখন শুরু হল সামরিক বাহিনীর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। কিছু মানুষ পিছু হঠে গেল। বেশ কিছু হতাহত হল। রামচন্দ্র বেরা শহিদ হলেন। তাঁর আহত ও রক্তাক্ত দেহটি টানতে টানতে এনে থানার ফটকের সামনে ছুড়ে ফেলে দিলেন একজন ব্রিটিশ গোরা সেনা। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফেরার পরই রামচন্দ্র বেরা হামাগুড়ি দিয়ে সবার অলক্ষে থানায় ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"থানা জয় করে নিয়েছি। ইনকেলাব-জিন্দাবাদ।" কথাগুলি বলেই তাঁর প্রাণহীন দেহ নিথর ও নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবুও বিপ্লবীরা পুলিশ ও মিলিটারিদেব গুলি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল।

উত্তর দিক থেকে যে মিছিলটি আসছিল তার পুরোভাগেই ছিলেন স্বয়ং মাতঙ্গিনী হাজরা। বাঁ-হাতে বিজয়শঙ্খ, ডান-হাতে জাতীয় পতাকা। বয়স প্রায় তিয়াত্তর। তবুও তিনি উল্কার বেগে ছুটে চলেছেন। তাঁর মুখের ধ্বনি তখন 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো-করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—বন্দে মাতরম্।" মিছিলটি থানার কাছাকাছি আসতেই ব্রিটিশ গোরা ও ভারতীয় গোর্খারা শুরু করে দিল বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ। প্রথম বুলেটের আঘাত পেলেন বাঁ-পায়ে। বাঁ-হাতে ধরা বিজয়শঙ্খটি মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে বাঁ-হাতটি নুয়ে পড়ল। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ব্রিটিশের অধীনে চাকুরে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে বলে চলেছেন—"ব্রিটিশের গোলামি ছেড়ে—গুলি ছোড়া বন্ধ করে আমাদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে হাত মেলাও।" প্রত্যুত্তরে উপহার পেয়েছিলেন কপাল-বিদ্ধ করা তৃতীয় বুলেটটি। প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতীয় পতাকাটি ডান-হাতের মুঠোয় তখনও ধরা ছিল।

ঐ ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখেই পুলিশ ও মিলিটারির গুলি অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী জনতা ত্রিশটি কালভার্ট ভেঙে দিয়েছিল। সাতশো মাইল লম্বা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। আর ১৯৪টি টেলিগ্রাফের পোস্ট উপড়ে ফেলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সরকারি প্রত্যাঘাতও যা হয়েছিল তাও বর্বরতার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশ ও মিলিটারিদের দিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করানো হয়েছিল। জনগণ যাতে অনশনে ও অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেই উদ্দেশ্যে তমলুক মহকুমায় খাদ্য-সামগ্রীর সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সন্দেহভাজন যে-কোন গ্রামবাসীকে ধরে সারা রাত ঠান্ডা জলে চুবিয়ে রেখে হত্যা করা হচ্ছিল। অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মারধোর করা হচ্ছিল আর নারী-নিগ্রহের ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে ভাষায় তা বর্ণনা করাই সম্ভব নয়। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ১৮৫৭ সালের পর সরকারি দমননীতির এমন ব্যাপক তাণ্ডবলীলা আর কখনোই দেখা যায়নি। সারা দেশটাকেই যেন পুলিশ ও মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এর পরই এল ১৬ অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যা। চতুর্দিকে শুধু থৈ থৈ জল আর জল। ঝড় ও বন্যার সংবাদ ঠিক মতো প্রচার হতে দেওয়া হল না। যেসব সংগঠন বন্যাত্রাণে এগিয়ে আসতে চাইলেন তাদের কোনমতেই অনুমতি দেওয়া হল না।

গর্জে উঠলেন ফজলুল হক মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গভর্নর হার্বার্ট সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখে পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন। ওই চিঠিটির ছত্রে ছত্রে তিনি গভর্নরকে দেখিয়ে দিলেন তমলুকে নিরস্ত্র মানুষদের ওপর কী অমানুষিক অত্যাচারই না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা চালিয়ে যাচ্ছে।

যাইহোক, মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরার আত্মবলিদান ব্যর্থ হল না। ২৯শে সেপ্টেম্বরের পর বিপ্লবীরা জার্মানি থেকে আজাদ হিন্দ বেতারের মাধ্যমে ঘোষিত সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচি সামনে রেখে এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঠিক করেন যে, আপাতত আত্মগোপন করে লুকিয়ে পড়বেন দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। প্রথমত, সাধারণ জনগণকে বুঝিয়ে তাদের আস্থা ও সমর্থন লাভ করা। দ্বিতীয়ত, গোপনে এবং বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গুলি-গোলার ব্যবহার ও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল রপ্ত করে নেওয়া। দুটি উদ্দেশ্যই ঠিকমতো সিদ্ধ হওয়ায় ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর এক সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তমলুক মহাকুমার অন্তর্গত ৪টি থানা—তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটা বিপ্লবীদের দখলে চলে আসে। অতঃপর ১৭ ডিসেম্বর তারিখে বিপ্লবীরা ওই দখলীকৃত অঞ্চলের ওপর স্বাধীন "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠা করেন। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত সরকারের সর্বাধিনায়ক পদে আসীন হন। অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান যথাক্রমে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র ধাড়া ও সুধীরচন্দ্র সামন্ত। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে ১৯৪৩ সালের মে মাসে প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রেপ্তার হলে শ্রীযুক্ত অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়

সর্বাধিনায়ক এবং সেপ্টেম্বরে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলে সুশীল ধাড়া তৃতীয় সর্বাধিনায়ক পদে আসীন হন।

একটি স্বশাসিত স্বাধীন রাষ্ট্রের যেসব দপ্তর বা বিভাগ থাকে, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারেরও প্রায় সবই ছিল। যেমন, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, জেলখানা, পোস্টঅফিস, ব্যাংক, সংবাদপত্র ও সেনাবাহিনী। এছাড়াও ছিল নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগ।

জাতীয় সরকার পরিচালিত সামরিক বাহিনী—'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। জন্মলগ্ন থেকেই সুশীল ধাড়া ছিলেন বিদ্যুৎ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এছাড়াও বিদ্যুৎ বাহিনীর কয়েকটি শাখা ছিল। যেমন গেরিলা বাহিনী, ভগ্নী বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষক বাহিনী ইত্যাদি।

প্রশাসন ও বিচার দুটি বিষয়েই জাতীয় সরকার শক্ত হাতে পরিচালনা করত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও জাতীয় সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেখা গেছে ত্রাণের জন্য জাতীয় সরকার দেড় লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করেছিল। মোটকথা, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার জনগণের আস্থা ও সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল এবং পেরেছিল বলেই পৌনে দুবছর (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ৩১ অগাস্ট, ১৯৪৪) পর্যন্ত ব্রিটিশরাজের সমান্তরাল সরকার হিসেবে জাতীয় সরকার তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। সে ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের (যুক্ত প্রদেশের) বালিয়া, উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট ও মহারাষ্ট্রের সাতারা ব্রিটিশরাজের সমান্তরাল সরকার হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল যথাক্রমে ৪ দিন, ১০ দিন ও ৭ দিন মাত্র।

অবশ্য ব্রিটিশ শাসকরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মেদিনীপুরে, বিশেষত তমলুকে তাদের অমানুষিক অত্যাচার হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের চেয়ে কোনমতেই কম ছিল না। ১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে ১৯৪৪-এর অগাস্ট পর্যন্ত তমলুক মহকুমায় ব্রিটিশ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিল ৯৪ জন, আহত হয়েছিল ৫৯৯, প্রহৃত হয়েছিল ৪২২৬ জন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেছিল ১৮৬৮ জন। মহিলারাও অমানুষিকভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। বাংলার পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী (ওই সময় প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ফজলুল হক সাহেবের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন স্বীকার করেছিলেন যে, দু-বছরে সরকারি পুলিশ ও মিলিটারি ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন এবং সাধারণ জনগণের বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাসভবন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

জাতীয় সরকারের নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের কাহিনিও ছিল বাস্তবিকই অভিনব। অর্থমন্ত্রী ও দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে এক ইংরেজ অফিসারের চাপরাশি অর্থের লোভে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিচারের প্রহসনের পর তাঁর ছয় বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। সতীশ সামন্তের শাস্তি হয়েছিল আড়াই বছরের জন্য হাজত বাস। সতীশ বাবুর সঙ্গে একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সতীশ সাহু ও বরোদা ক্যুইতি।

১৯৪৪ সালের ৫ মে তারিখে গান্ধীজি আমেদাবাদ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই এক ফতোয়া দেন যে অবিলম্বে আন্দোলন বন্ধ করে বিপ্লবীরা যেন পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে তৃতীয় সর্বাধিনায়ক সুশীল ধাড়া পয়লা সেপ্টেম্বর জাতীয় সরকার ভেঙে দিয়ে নিজেও আত্মসমর্পণ করেন। অথচ নথিপত্রে দেখা যায়, ১৯৪৪ সালের অগাস্টেই তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার অস্ট্রেলিয়া-জাত গভর্নর মি. কেসি এক গোপন ইস্তাহারে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন যে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাচ্ছে না।" এছাড়াও গান্ধীজি বলেছিলেন যে হিংসার পথে পরিচালিত হওয়ায় তিনি অগাস্ট আন্দোলনের জন্য কোন দায়িত্বই নিতে পারবেন না। গান্ধীজির নিজেরই স্বীকৃতি যে অগাস্ট আন্দোলন অহিংসা নীতির মাধ্যমে পরিচালিত নয়।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের আয়ু মাত্র পৌনে দু-বছর স্থায়ী হলেও এই বিদ্রোহ মোটেই ব্যর্থ হয়নি। কেননা এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই দেশবাসীরা মৃত্যুভয়হীন হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে, সুভাষচন্দ্রের উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলতে হয় যে, "অগাস্ট বিপ্লব নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল" ("The psycological transition from passive to activc resistance.")।

ছাব্বিশ

# ইম্ফল যুদ্ধের ব্যর্থতার কারণ

১৯৪৪ সালের ২৪ এপ্রিল। নেতাজির আজাদ হিন্দ মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচাইতে দুঃখ ও বেদনার দিন। এক অবিশ্বাস্য আদেশ এল দেশপ্রেমিক জওয়ানদের কাছে। তাদেরই প্রাণপ্রিয় সর্বাধিনায়ক নেতাজির আদেশ। ইম্ফল থেকে চৌত্রিশ দিনের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে রিট্রিট মার্চ (Retreat March) শুরু করো। জওয়ানরা স্তম্ভিত ও হতবাক। হবে নাই বা কেন? গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ দেড় মাস ধরে দুর্বার গতিতে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতের অভ্যন্তরে ১৫০ মাইল পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল তারা। ১৯৪৪ সালের ১৯ মার্চ কোহিমায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবার দু-দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ২১ মার্চ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত চৌত্রিশ দিন ধরে একমাত্র আকাশ-পথ ছাড়া চারদিক থেকেই সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল ইম্ফল। তাদেরই সেনাধ্যক্ষ শাহনওয়াজ খান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"During this period the I.N.S with much inferior equipments and an extremely poor supply system, was able to advance as much as 150 miles into Indian territory. While the I.N.A was on the offensive there was not a single occasion on which our forces were defeated on the battle-field." (R. C. Majumder, *History of the Freedom Movement*, Vol. III, p. 603).

ওই চৌত্রিশ দিন কেবলই মনে হয়েছে যে ইম্ফলের পতন আসন্ন ও অবধারিত। ওই চৌত্রিশ দিন উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর হেড কোয়ার্টার্স থেকে অবিরত নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে-কোন উপায়ে এবং যে-কোন মূল্যে ইম্ফলের পতন ঠেকাতেই হবে। কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা ঐতিহাসিক সত্য যে শেষপর্যন্ত ইম্ফলের পতন ঘটানো সম্ভব হয়নি। বরং দেশপ্রেমিক আজাদি জওয়ানদেরই অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে রিট্রিট মার্চ শুরু করতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? সেই কারণগুলির বিচার বিশ্লেষণ করাই তো এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

ইম্ফল অভিযানের ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রধানত তিনটি প্রত্যক্ষ কারণের কথাই ঐতিহাসিক ও গবেষকরা উল্লেখ করে থাকেন। প্রথমত, চরম মুহূর্তে জাপ-কর্তৃপক্ষের রণাঙ্গন থেকে হঠাৎ বিমান বহর সরিয়ে নেওয়ার মতো অমার্জনীয় অসহযোগিতা। দ্বিতীয়ত, ভাগ্যলক্ষ্মীর বঞ্চনায় দু-মাস আগে (জুন মাসের জায়গায় এপ্রিল মাসে) অসময়ে একনাগাড়ে সাতদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতে রাস্তাঘাট অচল হয়ে যাওয়া এবং গোলা বারুদ নষ্ট হয়ে যাওয়া। তৃতীয়ত, ১৯৪৩-এর মাঝামাঝি থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়া অর্থাৎ কিনা অভিযান শুরু করার মাহেন্দ্রক্ষণটি আগে আগেই

অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া। তবে এর পরও আরও একটি প্রত্যক্ষ কারণের কথা উল্লেখ না করলে এ বিশ্লেষণ অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওই চতুর্থ কারণটি হল জাপ-অফিসারদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীব দেশপ্রেমিক জওয়ানদের ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারা। এছাড়াও ছিল বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ যেগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব যে, স্বয়ং নেতাজি, অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারাও এই অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে দায়ী ছিলেন। শেষপর্যন্ত দেখা যাবে যে, ওই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের জন্যই ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল নেতাজির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবার স্বপ্নও। নইলে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবরই হত অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা দিবস। অপেক্ষা করে থাকতে হত না আমাদের খণ্ডিত স্বাধীনতা পাওয়া ১৫ই অগাস্টের পথ চেয়ে।

আধুনিক যুগ যন্ত্র যুদ্ধের যুগ। তাই আধুনিক কালের যুদ্ধে বিমানের গুরুত্ব অপরিসীম। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, জাপ-কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বিমানবহর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে না নিলে নষ্ট হয়ে যাওয়া গোলা-বারুদ ও অন্যান্য সব রসদ বিমানেই এসে পৌঁছে যেত আকাশপথে। অসময়ের বর্ষা তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতে পারত না। তাছাড়া, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীও অবিরত বিমান আক্রমণ করার কোন সুযোগই পেত না। সেক্ষেত্রে ইম্ফলের পতন কিছুতেই ঠেকানো যেত না। আর ইম্ফলের পতনের খবরটা ভারতের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই যে গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত তাতেই হয়তো ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে যেত। গান্ধীজি ও নেতাজির স্বপ্ন—অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষই আমরা পেতাম। দেশ ভাগ করে দেওয়ার কূটনীতি প্রয়োগের সুযোগ ও সময় কোনটাই পেত না কুচক্রী ইংরেজ শাসকরা।

আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার রূপকার ইমন. ডি. ভেলেরা ত্রিশের দশকের প্রথম সাক্ষাতেই সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশ মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া তার মিত্রদের কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্যই পায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা ইম্ফল রণাঙ্গনেই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। এই সত্যটাই প্রকাশ পেয়েছে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম প্রধান সেনাধ্যক্ষ শাহনওয়াজ খানের লেখায় যখন তিনি নিদারুণ ক্ষোভে ও দুঃখে জাপানের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছিলেন যে, জাপান ইচ্ছাকৃতভাবেই চূড়ান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রসদ ও সাহায্য দেয়নি। শেষে ইম্ফল রণাঙ্গন থেকে হঠাৎ বিমানবহর সরিয়ে নিয়ে যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে তা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। শাহনওয়াজ খান লিখেছেন—"In fact, I am right in saying that they let us down badly and had it not been for their betrayal of the I.N.A. the history of the Imphal campaign might have been a

different one." (R. C. Majumder, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, p. 603)

তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার শাহনওয়াজ খানের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন যে, জাপ-কর্তৃপক্ষের ওই অসহযোগিতা ইচ্ছাকৃত ছিল না বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর মতে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতিই জাপানকে বিমানবহর সমেত সমস্ত সমর সম্ভার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। চরম মুহূর্তে রণাঙ্গন থেকে হঠাৎ বিমানবহর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত বড়ো অপরাধ হয়েছিল তার অবশ্য অকপট স্বীকৃতি পাওয়া যায় জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির জাপানের গোয়েন্দা বিভাগকে দেওয়া গোপন রিপোর্টে। ওই রিপোর্টে তিনি ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্যর্থতার প্রধান ও মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন চরম মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বিমানবহরের অনুপস্থিতির কথাই।

বাস্তব ঘটনার আলোয় বিচার বিবেচনা করলে ব্যাপারটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। হঠাৎ জাপান সাহায্যকারী বিমানবহর রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। অথচ বোমারু বিমান ছাড়া আধুনিক যন্ত্র যুদ্ধ চালানোই অসম্ভব ব্যাপার। নেতাজি জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছে বিমানের জন্য বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হল না। ওই সংকটে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেও দেশপ্রেমিক জওয়ানরা তাদের মনোবল হারায়নি। বরং পরিখা কেটে, বাংকার গড়ে তুলে এবং ঝোপ জঙ্গলে আত্মগোপন করে চৌত্রিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অটুট রেখেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু জাপানিদের অমার্জনীয় অসহযোগিতায়—বিমানবহর সরিয়ে নেওয়ায়।

ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হওয়ার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ও মূল কারণ হল ভাগ্যলক্ষ্মীর বঞ্চনা বা আরও সঠিকভাবে বলা যায় প্রকৃতিদেবীর বঞ্চনা। পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতে শুধু পথ-ঘাট জল ডুবে অচল হয়ে যায় না—এক অঞ্চল অন্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন অবস্থা হলে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ও রণসম্ভার ও রসদ সংগ্রহ করা আকাশপথ ছাড়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভাগ্যলক্ষ্মীর বঞ্চনায় ঠিক তাই হয়েছিল। আর হয়েছিল অসময়ে জুন মাসের জায়গায় এপ্রিল মাসে, দু-মাস আগে ভারতের পূর্ব সীমান্তে এবং বর্মা অঞ্চলে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। শুরু হয় একনাগাড়ে সাতদিন ধরে প্রবল ও অবিরত বৃষ্টিপাত। ফলে কোহিমা-ইম্ফল অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। বেশ-কিছু গোলাবারুদও জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। এদিকে জাপান হঠাৎ বিমানবহর সরিয়ে নেওয়ায় আকাশপথেও রসদ ও অন্যান্য সমরসম্ভার পৌঁছে দেওয়ার কোন উপায় থাকে না। আজাদ হিন্দ বাহিনীর জওয়ানরা যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সকলেই জলবন্দি তখনই সুযোগ বুঝে ইন্দো-মার্কিন জোট তীব্র ও অবিরত বিমান আক্রমণ শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রচুর প্রচারপত্রও তারা ছড়িয়ে দিতে থাকে বোমারু বিমানগুলি থেকে। প্রচারপত্রগুলিতে লেখা

ছিল জলবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর না খেতে পেয়ে মরবে কেন? তার চেয়ে ফিরে এসো সবাই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। আমরা তোমাদের সানন্দে ফিরিয়ে নেব। চাকরিতে কোন ছেদ হবে না। যুদ্ধে মৃত্যু হলে তোমাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ হবে মোটা পেনসন ও চাষের জমি।

চাই কি ইচ্ছে হলে কিছুদিনের জন্য বিমানে নিজেদের দেশ থেকেও ঘুরে আসতে পারবে। কিছুদিনের জন্য মিলিত হতে পারবে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে। সুতরাং আজাদ হিন্দ বাহিনীতে থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে এখুনি ফিরে এসো—জলদি এসো ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। আশ্চর্যের ও প্রশংসার ব্যাপার হল ওই ধরনের প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেবার পরও ওই সময় অন্তত একটা দলত্যাগের ঘটনাও ঘটেনি। দলত্যাগের ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল, তবে অনেক পরে।

সুতরাং অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটা বেশ বড়ো এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল সুভাষচন্দ্রের এই অসামান্য প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। আর মনে হয় যে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ঠিকই লিখেছেন যে—"ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রাম দুই-ই বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। যুদ্ধে মিত্রশক্তির পতন হবেই—এই অমোঘ আশার উপরই দুই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু অদৃষ্ট কারুর প্রতিই প্রসন্ন হয়নি।"

(প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৪)।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ইম্ফল অভিযান বা ভারত অভিযানের ব্যর্থতার তৃতীয় প্রত্যক্ষ কারণটি ছিল সাফল্য লাভের অনুকূল পরিস্থিতিটি ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্মার মধ্যে দিয়ে ভারত অভিযানের পরিকল্পনাটি সামরিক দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং উপযুক্ত ছিল না সময়ের দিক থেকে বিচার করলেও। কেননা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ দুর্বার হয়ে উঠেছিল, ফলে জাপানকে বর্মা সীমান্ত থেকে তার মূল সেনাবাহিনী এবং বিমানবহরসমেত সমস্ত সমরসম্ভার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সংখ্যা একান্ন হাজার থেকে বেড়ে দেড়লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করায় মিত্রশক্তি জোটের হাতে অপর্যাপ্ত রসদ ও রণসম্ভার এসে পড়েছিল। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন জোট যখন সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চূড়ান্ত আঘাত হানতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় জাপানের প্রতিরোধ ক্ষমতা দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছিল।

১৯৪৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির যথাযথ বিচারবিশ্লেষণ করলে মানতেই হবে যে জাপান ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে ওই সময়ে ভারত অভিযানে সাফল্যলাভ প্রায় সুদূরপরাহত ছিল। দু-বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪২-এর এপ্রিল-মে মাসে, আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে সিঙ্গাপুর, মালয় ও বর্মার পতনের অব্যবহিত পরেই যদি ভারত অভিযানের

পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হত তবে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনেব অবসান ঘটানো অবশ্যই সম্ভব হত। কিন্তু জাপান তখন ভারত অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি আর নেতাজিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখনও পৌঁছোননি।

তারপর ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজি যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখনই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কেননা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি তখনই ধীরে ধীরে মিত্র শক্তির অনুকূলে ঢলে পড়েছিল। তাছাড়াও ওই সময়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগুন প্রায় নিভে এসেছিল। অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রতিআক্রমণও অনেক জোরদার হয়ে উঠেছিল। ফলে ১৯৪৩ সালের জুলাই-অগাস্টেব পর ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে, নেতাজির ভারত অভিযান আর ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত কবতে পারবে না। তাই ১৯৪৩ সালের ১৪ জুলাই ব্রিটিশরাজের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে,—"বোস (সুভাষচন্দ্র) সম্প্রতি জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে মিত্রতা করে আমাদের সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করে দেন। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন জাপানের নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ এবং অভ্যন্তরীণ গণবিদ্রোহের দরুন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বেসামাল অবস্থার সম্ভাবনার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। আনন্দের কথা, ভারতের জনসাধারণের মনোবল ও এদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন বেশ স্থিতিশীল এবং জাপান সম্পর্কে বেশ ভীত। বোস হয়তো দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে পারতেন কিন্তু গোটা কংগ্রেস দলকে একটা বড়ো ধরনেব অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে তাঁর সাফল্য অর্জন সহজ হবে না। যদি বিগত অগাস্ট মাসে অথবা গান্ধীজির অনশনের সময়ে তিনি পূর্ব-এশিয়ায় হাজিব হতে পারতেন তাহলে তাঁর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হত।"

(প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৩-৬৪)।

১৯৪২-এর বসন্তকালে (ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস) সিঙ্গাপুরের ও রেঙ্গুনের দ্রুত পতনে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের দ্রুত ও চমকপ্রদ জয়লাভে যখন সারা বিশ্ব স্তম্ভিত এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নাভিশ্বাস উঠে গেছে, তখনি প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাজি বুঝেছিলেন যে ভারত অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণটি এসে গেছে। তাই ১৯৪২-এর ২২ মে তারিখে একটি চিঠি লিখে তিনি হিটলারকে অনুরোধ করেন যেন অবিলম্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ২৯ মে তারিখে তিনি নিজে হিটলারের সঙ্গে দেখা করে ওই একই অনুরোধ জানান। সুভাষচন্দ্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে হিটলার প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও শেষপর্যন্ত রাজি হন। কিন্তু দুই সরকার—জার্মানি ও জাপানের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে পৌঁছে দিতে ১৯৪৩ সালের ১৬ মে হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ঠিক একবছর দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার ১৯৪২ সালের জুন মাসেই ব্যাংকক সম্মেলন থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

মুক্তিকামী ভারতীয়রা জাপ-সরকারের কাছে অনুরোধ রাখেন যাতে অবিলম্বে নেতাজিকে জার্মানি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই নেতাজি যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন থেকেই বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ধীরে ধীরে মিত্রশক্তির অনুকূলে ঢলে পড়তে শুরু করে দেয়। দেখা যাচ্ছে গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৪২-এর অগাস্ট মাসে অথবা গান্ধীজির অনশনের সময় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে) সুভাষচন্দ্র যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছে যেতে পারতেন তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হত। সুতরাং সব দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করার পর স্বীকার করতেই হয় ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত অভিযান শুরু করা বাস্তবিকই সময়োপযোগী ছিল না।

অভিযান ব্যর্থ হবার চতুর্থ প্রত্যক্ষ কারণ হল জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জাপ সেনানায়কদের অপরিণামদর্শিতা এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেওয়া। আমেরিকান ঐতিহাসিক ও গবেষিকা ড. জয়েস লেব্রা ইম্ফল অভিযানে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার জন্য জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং জাপ সেনাপতিদেরই সর্বতোভাবে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে ইম্ফল রণাঙ্গনে জাপানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সৈন্য সমাবেশ করা কোনমতেই উচিত হয়নি। বরং জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সর্বাত্মক আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা। দ্বিতীয়ত, শ্রীমতী লেব্রা মনে করেন যে, জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানদের ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেননি। কিংবা করতে চাননি। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ডিভিশনের মোট তিরিশ হাজার জওয়ানকেই আরাকান ফ্রন্টে নিয়োগ করলে বাংলায় প্রবেশ করা সহজ হত মিজো পার্বত্য অঞ্চল, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে। আমেরিকান জেনারেল বিটলওয়েলের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে ঠিক ওই সময়ে ওই রকমই একটা আশঙ্কায় ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সেনানায়করা বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, অধ্যাপিকা ডা. লেব্রা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন আজাদ হিন্দ তিনটি ডিভিসনের তিরিশ হাজার জওয়ানদের বেশিরভাগকেই ইম্ফল রণাঙ্গনে নিয়োগ করলে জাপান ও আজাদ হিন্দ জোট আরও একটা বাড়তি সুবিধে পেতে পারত। তা হল এই যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয় জওয়ানরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ছুটে আসত। শ্রীমতী লেব্রা আরও বলেছেন যে, কেবলমাত্র দূরদৃষ্টির অভাবেই জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জাপানি সেনানায়করা এমন সম্ভাবনার কথাটি আদৌ অনুমান করতে পারেননি।

শ্রীমতী লেব্রা আরও মনে করেন যে, যদিও হিকারি কিকানের প্রধান জাপ সেনাধ্যক্ষ সাবুরো ইসোদা প্রমুখ বেশ কয়েকজন জাপ সেনাপতি নেতাজির গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন,

তবুও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, অধিকাংশ জাপ সেনানায়কই নেতাজির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। তাঁরাই নেতাজির ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজকর্মের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করে অনেক সময়ে ছন্দপতন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তবে একথাও ঠিক যে, নেতাজি ওইসব স্বার্থপর ও কুচক্রী জাপ সেনাপতিদের মাতব্বরি গ্রাহ্যই করতেন না। ইংরেজ গোয়েন্দা অফিসার ও লেখক কর্নেল হিউ টয় তাঁর *The Springing Tiger* বইটিতে পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের অযথা হস্তক্ষেপ বা খবরদারি কখনও সহ্য করেননি। বলাবাহুল্য, যখনই অধিকারের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তা স্তব্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি, জাপ সেনাধ্যক্ষ কাওয়াবে-কে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজেদের মর্যাদা বজায় রেখেই লড়াই করছে এবং করে যাবে। এছাড়াও, জাপান ও আজাদি ফৌজের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সংস্থা হিকারি কিকানের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র জাপানের বিদেশ মন্ত্রককে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন জাপ-সরকার ও আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষায় হিকারি কিকানের মধ্যস্থতা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী আবিদ হাসানের লেখাতেই উল্লেখ আছে যে, জাপ সেনাপতিদের এবং হিকারি কিকানের অন্যায় হস্তক্ষেপে নেতাজি এতদূর বিব্রত ও রুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি আবিদ হাসানকে বলেছিলেন—''তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিদের মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে এর চেয়ে বিড়ম্বনা কী আছে?''

(প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৫)।

নেতাজির ইচ্ছা ছিল রণাঙ্গনে নিজে উপস্থিত থেকে তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন। কিন্তু জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ নেতাজির ওই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেননি। অজুহাত হিসেবে তাঁরা বলেছিলেন যে, নেতাজির নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রেখেই তাঁরা ওই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেননি। তবে আসল সত্য কথাটা হল এই জাপ-সেনানায়কদের ভয় ছিল নেতাজি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের ছটায় জাপ সেনাপতিদের সব গুরুত্বই হারিয়ে যাবে।

জাপ সেনাধ্যক্ষ সুতাগুচির মতে ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্যর্থতার মূল কারণই হল জাপ-সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জাপ সেনানায়কদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব। কেমন রণকৌশল গ্রহণ করা হবে, অথবা ডিমাপুর আক্রমণ করা হবে কিনা, এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এতই কালক্ষেপ হয়েছিল যে, সেই সুযোগে ইঙ্গ-মার্কিন জোট ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে প্রতি-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ও সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে আবার উল্লেখ করতেই হয় যে, আজাদ হিন্দ সরকারকে না জানিয়ে হঠাৎ রণাঙ্গন থেকে বিমানবহর সরিয়ে নেওয়ার মতো অমার্জনীয় অপরাধে ইম্ফল থেকে ৩৪ দিনের অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল জাপ-আজাদ হিন্দ জোটকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিযুক্ত প্রধান সেনাপতি মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির জাপানের গোয়েন্দা

বিভাগকে পাঠানো গোপন রিপোর্টে এই ঘটনার স্বীকৃতি লক্ষ করা গেছে যাতে তিনি পরিষ্কার লিখে দিয়েছিলেন যে, ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হবার প্রধান কারণই হল চূড়ান্ত মুহূর্তে জাপ বিমানবহরের অনুপস্থিতি।

পরিশেষে বলতেই হয়, ইম্ফল রণাঙ্গনে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সেনানায়কদের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। অযথা কালক্ষেপ এবং সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি অমার্জনীয় অসহযোগিতা অভিযানের ব্যর্থতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

অভিযান ব্যর্থ হবার পঞ্চম প্রত্যক্ষ কারণটি হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের বেশ কয়েকজন অফিসার ও জওয়ানদের দলত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ। *জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম* বইটিতে এ. এস. নায়ার লিখেছেন যে, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছিল গুপ্তচরদের স্বর্গরাজ্য। একথা সকলেরই জানা আছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে বন্দি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয় জওয়ান ও অফিসারদের নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে যখন আজাদ হিন্দ মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তখন অনেকেই নিজেদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে এসেছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগের চন্দ্রমল, গোলাপ আহমেদ ও তারা খান প্রমুখ বেশ কয়েকজন অফিসার বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

অবিশ্বাস্য হলেও একথাটা সত্যি, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম সচিব আনন্দমোহন সহায় ছিলেন ব্রিটিশের গুপ্তচর। শুধু তাই নয়, নেতাজির বিশেষ আস্থাভাজন ও অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রচার সচিব এস. এ. আয়ার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ এস. রামমূর্তিও গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। আয়ার, আনন্দমোহন সহায়, রামমূর্তি তিনজনেই টোকিওর ইমপিরিয়াল সদর ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

এছাড়াও আয়ার সাহেবের সঙ্গে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের দুই অফিসার কর্নেল হিউ টয় ও কর্নেল ফিগিসের অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হবার ষষ্ঠ প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে এ. এস. নায়ার নেতাজির আবেগপ্রবণতা ও বাস্তববোধের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে নেতাজি অনেকসময় অভিযানের এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করেত চাইতেন যা পূরণ করা জাপ-আজাদ হিন্দ জোটের পক্ষে সব সময় সম্ভব হত না। এছাড়াও, বর্মা পুনরুদ্ধার ও থাইল্যান্ড থেকে জাপানিদের বহিষ্কারের পরও তিনি প্রচার চালাচ্ছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা এখনও সম্ভব। নায়ারের মতে এই প্রচারের ফলে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা যে বিঘ্নিত হতে পারে একথাটাই তাঁর বোধগম্য হয়নি। এ প্রসঙ্গে নায়ার আরও লিখেছেন—"দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি প্রায় সর্বদাই তাঁর বাস্তবজ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে আবেগকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। তাঁর

নেতৃত্ব ছিল একাধারে বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক 'heroic and tragic'। (প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৬)

অভিযান ব্যর্থ হওয়ার সপ্তম প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, ভারতবর্ষের সশস্ত্র সংগ্রামের পুরোধা মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মৃত্যুর কথাটা। ঠিক যখন রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতায় বিধ্বস্ত আজাদ হিন্দের মুক্তি সংগ্রামের ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি রাসবিহারী বসুব মৃত্যু নেতাজিকে বড়োই অস্থির ও দিশেহারা করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা সম্পর্কে এ. এস. নায়ার লিখেছেন—"সুদূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব একমাত্র রাসবিহারীর জন্যই সম্ভব হয়েছিল। রাসবিহারী না থাকলে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিংবা সুদূর প্রাচ্যে থাকতে পারতেন না। সুভাষচন্দ্র এ কথা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করতেন এবং রাসবিহারীকে শ্রদ্ধা করতেন।" (প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৬)

শেষ কথাটি এবার বলে যাই। বলে যাই অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরোক্ষ কারণটির কথা। ওই কারণটির জন্য শুধুমাত্র ইম্ফল অভিযানই নয়, গোটা আজাদ হিন্দ মুক্তি সংগ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণটি হল ভারতের দুটি জাতীয় দলের সুভাষ বিরোধিতা ও জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্ম, উক্তি ও নীতি। পার্টি দুটির একটি হল অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। অপরটি হল নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪১-এর জুন মাস পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে ব্রিটিশদের যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ১৯৪১-এর জুলাই থেকে রাশিয়া ব্রিটেনের মিত্র হিসেবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কমিউনিস্টদের কাছে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কালবিলম্ব না করে পার্টিতে গৃহীত হয় ব্রিটিশের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতার নীতি। সি.পি.আই.-এর সেক্রেটারি পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা। অর্থাৎ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ও আজাদ হিন্দ মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা এবং মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন। এমনকি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অবমাননাকর উক্তি করতেও তখন তাঁদের বিবেকে বাধেনি। শুরু হয়ে যায় সি. পি. আই. ও ব্রিটিশরাজের মধ্যে রাজনৈতিক মধুচন্দ্রিমা (political honeymoon)। পরিবর্তে ব্রিটিশরাজ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

ওদিকে দক্ষিণপন্থী বা গান্ধীপন্থী কংগ্রেসিরা দূরদৃষ্টির অভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সৃষ্ট সুবর্ণ সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে তাঁদের চিরাচরিত সুভাষ-বিরোধিতার নীতিই অব্যাহত রাখলেন। যদিও তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে ওই সময় গান্ধীজি নিজেই সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন। সেই কথাই তো বলেছেন আবুল কালাম আজাদ তাঁর

আত্মজীবনী *India Wins Freedom* বইটিতে। যখন তিনি লিখেছেন—"I also saw that Subhas Bose's escape to Germany made a great impression on Gandhiji ............. and now I found a change in his outlook."

দুঃখের বিষয় হল, জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী কিছুতেই তাঁদের সুভাষ বিরোধিতার নীতি পরিহার করতে পারলেন না। জওহরলালের অন্ধ ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা অন্ধ সুভাষ-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। সেইজন্যই ১৯৪২-এর ১২ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরু ঘোষণা করেছিলেন—"সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে যদি ভারতের দিকে অগ্রসর হন তাহলে তিনি তা প্রতিরোধ করবেন।" (প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*, পৃঃ ৬৪)।

স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজি ও নেতাজির পরেই যাঁর স্থান তিনি যদি "প্রতিরোধ করব" না বলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাত মেলাবেন বলতেন তাহলে অবশ্যই দেশের ইতিহাসই বদলে যেত।

কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ওই দুটি দলের ভ্রান্ত নীতি ওই সময়ে সারা ভারতবর্ষে যে রাজনীতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তারই সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক সংগঠন প্রতিভা এবং আজাদ হিন্দ মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত চরিত্রটাই ভারতীয়দের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা যদি তা না করতে পারত, তাহলে ইম্ফল অবরুদ্ধ হবার খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত যে ব্রিটিশ শাসকরা পালাবার পথই পেত না। তাহলে গান্ধীজি ও নেতাজির অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নও ব্যর্থ হয়ে যেত না।

সুখের কথা, কমিউনিস্টরা সাম্প্রতিক কালে তাঁদের ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের নেতা জ্যোতি বসু বার বার বলেছেন যে, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের অতীতের মূল্যায়ন সঠিক ছিল না। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় জাতীয় কংগ্রেস আজও তাঁদের ভুল স্বীকার করেননি। আর নেতাজির অন্তর্ধান ও তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গঠিত তিন-তিনটে কমিশনের সঙ্গেও কোনরকম সহযোগিতা করেন নি।

**তথ্যসূত্র**

১. Heu Troy, *The Springing Tiger.*
২. A. S. Nier, *Indian Independence Struggle in Japan.*
৩. A. K. Azad, *India Wins Freedom.*
৪. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজি*।
৫. কালীপদ সরকার, *ইতিহাস পুরুষ নেতাজি*।
৬. Dr. R. C. Majumder, *History of Freedom Movement.*

সাতাশ

# নৌ-বিদ্রোহের (১৯৪৬) রাজনৈতিক গুরুত্ব

দুঃসাহসিক নৌ-বিদ্রোহ। এই তো সেদিনের কথা। আমরা তখন সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছি। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলেই শিহরিত। সকলেই স্বপ্ন দেখছেন অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার। কবি সুকান্ত লিখছেন—

বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে—
আমি যাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে।

কিন্তু কী যেন হয়ে গেল। সুনিশ্চিত জয় পর্যবসিত হল আত্মসমর্পণে। শুধুমাত্র জাতীয় নেতাদের ভীরুতায় ও সংগ্রামবিমুখতায়। কিন্তু এই নৌ-বিদ্রোহ থেকেই ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা পেল যে শুধু মিলিটারি দিয়ে আর ভারতশাসন সম্ভব নয়। এক মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিল—ক্যাবিনেট মিশন (২৩/৩/১৯৪৬)। শুরু হল ক্ষমতা হস্তান্তরের আলাপ-আলোচনা। শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইমারত গড়ে উঠল বাংলা ও পাঞ্জাবকে বলি দিয়ে—অর্থাৎ বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে। এজন্যই তো আমাদের প্রজন্মের বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের কাছে ১৫ই অগাস্ট বা স্বাধীনতা দিবসের অনুভূতি কেমন যেন করুণ আর চোখের জলে ভেজা।

মনে পড়ছে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসেব দুটি দিনের কথা। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং Indian Independence Act (1947)-এ সাক্ষরকারী স্যার ক্লিমেন্ট অ্যাট্‌লিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তাঁরা তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে চলে গেলেন যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল? অ্যাটলি সাহেব জবাবে বললেন—"In reply Atlee cited several reasons, the most important of which were the activities of Netaji Subhas Chandra Bose which weakened the very foundation of the attachment of Indian land and naval forces to the British Government." (R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement*, Vol. III, p. 610)

নেতাজি সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ১৯৪৫ সালের গোড়া থেকেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো বার বার বেতার ভাষণে বলে আসছিলেন যে, ভারতের মাটিতে ভারতবাসীর মধ্যে—যে কোনভাবে—এমনকি বন্দি হয়েও—আজাদ হিন্দ সেনারা উপস্থিত হওয়া মাত্র মহাবিপ্লব শুরু হয়ে যাবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হয়ে যাবে। নেতাজির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত লালকেল্লায় মূলত আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়কের (শাহনওয়াজ খান, সায়গল ও ধীলন) বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যে

অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। রয়াল এয়ারফোর্সের বৈমানিকদের বিদ্রোহে, জব্বলপুরের সেনাবিদ্রোহে, দেরাদুনের গোর্খা রেজিমেন্টের বিদ্রোহে এবং সর্বোপরি বোম্বাই-এর নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে। তবে সবচেয়ে ব্যাপক ও ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল বোম্বাই এর নৌ-বিদ্রোহটি। এটির সূচনা বোম্বাইতে হলেও নিমেষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল—কলকাতা, করাচি, কোচিন, মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দরে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এই নৌ-বিদ্রোহই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তর অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

সরকারিভাবে ১৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হলেও এই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হতে শুরু করেছিল আরও দশদিন আগে থেকে (৮ ফেব্রুয়ারি থেকে)। ৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর একটি নৌ-শিক্ষা সংস্থার ক্লাসরুমে রেটিংরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের একটি প্রতিমূর্তি এঁকে তার নীচে—''জয়হিন্দ'', ''নেতাজি জিন্দাবাদ'' ও ''ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো'' প্রভৃতি স্লোগান লিখে রেখেছিল। এই ব্যাপারে তাঁদের নেতৃত্ব দেন বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক—বলাই চাঁদ দত্ত। প্রথমে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বিচারে তাঁকে নৌ-বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই শিক্ষা সংস্থার কমান্ডিং অফিসার কমান্ডার কিং ভারতীয় রেটিংদের (অর্থাৎ নৌ-সেনাদের) 'কুত্তার বাচ্চা', 'ভিখারি', 'রক্তখেকো জংলিদের বংশধর' প্রভৃতি অশ্রাব্য ও অশালীন ভাষায় গালাগাল করে।

১৮ ফেব্রুয়ারি রেটিংরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেন যে রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি অধিকার করে জাতীয় নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অবশ্য বিদ্রোহের অজুহাত হিসেবে তাঁরা নিম্নমানের অপ্রতুল খাবার সরবরাহ এবং কমান্ডার কিং-এর বর্বরোচিত উক্তিগুলি খাড়া করলেন এবং প্রতিবাদে একযোগে অনশন (Group Hunger Strike) শুরু করে দিলেন।

কালবিলম্ব না করে বোম্বাই নৌবহরের রিয়ার অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্রে ছুটে এলেন। তিনি এসেই কমান্ডার কিংকে ''তলোয়ার'' সিগ্‌ন্যাল নৌ-প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দিলেন। আর সে জায়গায় এক ধাপ উঁচু পর্যায়ের অফিসার ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস্‌কে নিয়োগ করলেন। উঁচুমানের রেশন দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কেননা তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত ''জয়হিন্দ'' ও ''ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো'' স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পড়ে র‍্যাট্রে সাহেবকে রণে ভঙ্গ দিতে হল। আর কমান্ডার কিংও চিরদিনের মতো সিগন্যাল স্কুল ''তলোয়ার'' ত্যাগ করে উধাও হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে Royal Indian Air Force-এর বৈমানিকরা আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা পরিচালনার জন্য প্রচুর টাকা চাঁদা তুলে কংগ্রেসের হাতে দিয়েছিল। নৌ-সেনারাও দু-দুবার আজাদ হিন্দ তহবিলে টাকা তুলে দিয়েছেন। সুতরাং বিশ্বাস করতেই হয় যে বিপ্লবের পক্ষে মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ বোম্বাই নৌ-বহরের বিভিন্ন যুদ্ধ-জাহাজ থেকে বিভিন্ন পদধারী রেটিংরা নেমে এল। কাছেই ছিল বিরাট নৌ-প্রতিষ্ঠান 'ক্যাসল ব্যারাক'। সেখান থেকে হাজারে হাজারে নৌ-সেনারা বেরিয়ে এসে যোগ দিল 'তলোয়ার'-এর রেটিং-এর সঙ্গে। সব মিলিয়ে হল প্রায় বিশ হাজার। ওই দিনই গঠন করা হল—"Central Naval Strike Committee", সভাপতি হলেন পাঞ্জাবের তরুণ মুসলিম ওয়ারলেস টেলিগ্রাফিস্ট এম. এস. খান। সহসভাপতি হলেন পোর্ট অফিসার পদাধিকারী রেটিং টেলিগ্রাফিস্ট মদন সিং। অন্যান্য সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন—নওয়াজ, বেদী, আশরফ খান, নুরুল ইসলাম, হুসেন, এস. সেনগুপ্ত ও গোমেস্। সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বলাইচন্দ্র দত্ত। বয়সের দিক থেকে এঁরা সবাই কাঁচা, রাজনীতির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই নেই। সুতরাং বিদ্রোহের ব্যাপারেও ধারণা তেমন কিছু স্পষ্ট নয়। তবু তাঁরাই কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরলেন এক গুচ্ছ দাবি—

(১) স্বাধীনতা সংগ্রামে ধৃত সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

(২) ভারতের বিভিন্ন দুর্গে ও বন্দিশালায় আটক তিরিশ হাজার আজাদি সৈনিক ও অফিসারদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

(৩) ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচিন প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষাকল্পে ভারতীয় সৈনিকদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

(৪) "ব্রিটিশ তুমি ভারত ছেড়ে চলে যাও"।

(৫) কমান্ডার কিং-এর দুর্ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে বিচার চাই।

(৬) বন্দি সকল নৌ-সৈনিকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

(৭) ব্রিটিশ নাবিকদের সমান হারে ভারতীয় নাবিকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(৮) উপযুক্তমানের ভারতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

ইতিমধ্যেই সমস্ত যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌ-প্রতিষ্ঠানে বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। ৫-৬ দিন ধরে ব্রিটিশ পতাকা বা ইউনিয়ন জ্যাক্—একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ অফিসারদের এবং বাধাদানকারী ব্রিটিশ সৈনিকদের নিরস্ত্র করে নৌ-প্রতিষ্ঠান ও যুদ্ধ জাহাজগুলি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল।

২০ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় পুলিশ, ভারতীয় মিলিটারি, ছাত্রসমাজ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এঁদের স্লোগান ছিল সর্বক্ষেত্রেই—"জয়হিন্দ", "ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো" ও 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ"। বোম্বাই বন্দরের উপকূলে সমবেত হয়েছিল বিশাল জনতা। নৌ-সেনাদের তারা আলিঙ্গনে ও অভিনন্দনে প্লাবিত করে দিয়েছিল। পরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা ও কুশলী নেতৃত্ব ছাড়াই বিদ্রোহীরা কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত ও দিশেহারা করে তুলেছিল। তাইতো বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণের দিনেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য

আলাপ-আলোচনা করতে এক মাসের মধ্যেই ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হচ্ছে। বাস্তবিকই Cabinet Mission দিল্লিতে এসে পৌঁছেছিল ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ তারিখে—অর্থাৎ ঠিক এক মাসের মধ্যেই, সুতরাং নৌ-বিদ্রোহই যে ব্রিটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতঃপর মেনে নিতেই হয় যে, নৌ-বিদ্রোহ হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ সংগ্রাম। এটাই ইতিহাস—যা শত শত চেষ্টাতেও বদলানো যাবে না।

১৯৪৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্যাসল ব্যারাক নৌ-প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রিটিশ কর্মীরা আক্রমণ করলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। ভাইস-অ্যাডমিরাল গড্‌ফ্রে (Godfray) All India Radio থেকে হুমকি দিলেন—"সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করবেই—সুতরাং বিদ্রোহীরা সাবধান।" কিন্তু বিদ্রোহীরা ওই হুমকি গ্রাহ্যই করলেন না। কেননা সেই মুহূর্তে ৮৮টি যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে ৭৮টি ছিল বিদ্রোহীদের দখলে। অন্যদিকে ইংরেজদের হাতে ছিল মাত্র দশটি যুদ্ধ জাহাজ। একটা খণ্ড যুদ্ধে কৃষাণ নামে একজন রেটিং প্রাণ হারাল। কিন্তু অনেক বেশি ইংরেজ টমি ও মেরিনগার্ড প্রাণ হারিয়েছিল বিদ্রোহীদের হাতে। এরপর ইংরেজরা নিরস্ত্র ভারতীয় জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোম্বাই-এর রাস্তায় ইংরেজরা সেদিন ট্যাংক বাহিনীকেও নামিয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে বিদ্রোহী জাহাজগুলোও সেদিন চুপ করে থাকেনি। তারাও যথারীতি জবাব দিয়ে চলেছিল। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় হল, বিদ্রোহীদের জাহাজগুলোতে দেখা দিল জল ও খাবারের অভাব। একটুও দেরি না করে জনসাধারণ ছুটে এল বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে। দলে দলে লোক জড় হল সমুদ্রতীরে। কারও হাতে খাবারের প্যাকেট, কারো হাতে পানীয় জল। এগিয়ে এল অনেক রেস্তঁরার মালিকরাও। তাঁরা জনসাধারণকে অনুরোধ করলেন যে, যত খুশি খাবার সংগ্রহ করে যেন বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেন। ভিক্ষুকরা পর্যন্ত নিজেদের খাবার ছোটো ছোটো মোড়ক বানিয়ে এগিয়ে গেল পোতাশ্রয়ের দিকে। হাজারে হাজারে বোম্বাই-এর নাগরিকরা খাবারের প্যাকেট নিয়ে সেদিন বোম্বাইয়ের উপকূল অবরোধ করে ফেললো। বিদ্রোহীদের জাহাজ থেকে ছোটো ছোটো নৌকা উপকূলের দিকে পাঠানো হল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ওইসব প্যাকেট নৌকাগুলেতে তুলে দিতে সাহায্য করল। শেষপর্যন্ত যত খাবার পৌঁছোল তাতে ১৫০০ সৈনিকের কয়েকদিনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে গেল।

বোম্বাই-এ লড়াই চলেছিল সেদিন শুধু জাহাজঘাটাতেই নয়। লড়াই চলেছিল পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র। সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনী সেদিন বলতে গেলে নিরস্ত্র ভারতীয় জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই অবশ্যই বলা যায় যে বোম্বাইয়ে সেদিন লড়াই হয়েছিল সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনী বনাম নিরস্ত্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে অসম যুদ্ধ। ওই সাধারণ মানুষগুলোর হাতে সেদিন প্রকৃত অর্থেই কোন অস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে গর্ত করে এবং ব্যারিকেড বানিয়ে তার পেছন থেকে অবিরত পাথর ছুড়েছিল। আনুমানিক

পাঁচশো লোক প্রাণ হারিয়েছিল সেদিন। বোম্বাইয়ে এর আগে একদিনে এত বেশি লোক কখনও মৃত্যুবরণ করেনি।

কলকাতায় নৌ-সেনাদের সমর্থনে পাঁচশো নাবিক ধর্মঘট পালন করেছিল। সেন্ট্রাল এভিনিউ-এ ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে (২১/০২/৪৬) কয়েকটি মিলিটারি জিপে ক্ষিপ্ত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়।

করাচি বন্দরে "হিন্দুস্তান", "ত্রিবাঙ্কুর" ও "তীর" নামের তিনটি যুদ্ধজাহাজ ছিল। প্রথমে করাচির রেটিংরা যুদ্ধ করেনি। কিন্তু ইংরেজরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। "হিন্দুস্তান" জাহাজ থেকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিয়ে আগুনে পোড়ানো হল। মেশিনগানের গুলিতে নিহত রেটিং হোসেনের রক্তে ভেজা নেভির পোশাকটি কংগ্রেসের ও লিগের পতাকার সঙ্গে জুড়ে বিদ্রোহীদের পতাকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

"হিন্দুস্তান" যুদ্ধজাহাজটির সামান্য দূরে কিছু অসামরিক বাসিন্দাদের বাড়ি ছিল। ব্রিটিশ গোলন্দাজ সৈন্যরা তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে ওই একুশে ফেব্রুয়ারি রাত্রেই বাড়িগুলির ছাদের ওপর কামান, মেসিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উঠিয়ে নেয়। তারপর ওই রাত্রেই করাচি ডকইয়ার্ডে কয়েকটি ব্রিটিশ প্লেটুন "হিন্দুস্তান" জাহাজটিকে ঘিরে ধরে। বাইশে ফেব্রুয়ারি সকালে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। "হিন্দুস্তান" জাহাজটি ভাঁটার টানে কিছুটা নেমে যাওয়ায় কামানের লক্ষ্য ঠিক করার আগেই প্রচণ্ড শক্তিশালী নেভাল ব্যাটারির গোলায় "হিন্দুস্তান'-এর ডেকটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

এরপর "হিন্দুস্তান", "চমক" ও "হিমালয়" প্রভৃতি জাহাজগুলোর নাবিকরা নেমে এলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাদের যে যার জাহাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু নাবিকরা ওই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

তারপর নৌ-সেনারা একত্রে করাচি বন্দরের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে যাবার জন্য যেই জাহাজ থেকে নামলেন তখুনি ব্রিটিশ স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী একযোগে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশিরভাগ বিদ্রোহী প্রাণ হারালেন। এদিকে আবার বিদ্রোহীদের গোলাবারুদও নিঃশেষিত। সুতরাং আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে পড়ল।

## জাতীয় নেতাদের ভীরুতা ও দ্বিচারিতা

**বিদ্রোহীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ইন্ডিয়ান নেভি জয় করে নিয়ে জাতীয় নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া। সেজন্য বিদ্রোহীদের স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি এম. এস. খান জাতীয় নেতাদের কাছে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার জন্য আকুলভাবে আবেদন করেন। প্রথমে তাঁরা অগাস্ট আন্দোলনের নায়িকা অরুণা আসফ আলির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি স্ট্রাইক কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষপর্যন্ত কথা রাখলেন না।**

জওহরলাল নেহরু প্রথমে সিঙ্গাপুর থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজে বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করেও পরে দিল্লি ফিরে এসে একেবারে নীরব ও নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীদের ধমক দিয়ে বললেন, স্ট্রাইক কমিটির এভাবে ধর্মঘট ডাকার কোন এক্তিয়ারই নেই।

গান্ধীজি আরও আশ্চর্য কথা বললেন। তিনি ধমকের সুরে বললেন—খাদ্য, রেশন বা চাকুরিতে সন্তুষ্ট না হলে চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে রেটিংরা। গান্ধীজির জানা ছিল না যে, ইন্ডিয়ান নেভিতে রেটিংদের চাকুরি ছাড়ার কোন অনুমোদন ছিল না।

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বিদ্রোহীদের শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে, দাবিদাওয়ার যাতে সুষ্ঠু মীমাংসা হয় এবং কারও যাতে শাস্তি না হয় তাও তিনি দেখবেন। মুসলিম লিগ নেতা জিন্না সাহেবও ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য আবেদন জানান।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাতীয় নেতাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ মানতেই হল বিদ্রোহীদের। কারণ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় দলই তাই চেয়েছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি স্ট্রাইক কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হল যে, সর্দার প্যাটেলের প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হচ্ছে। ওই বিবৃতিতেই এ ব্যাপারে জিন্না সাহেবের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথাও জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় মধ্যপ্রদেশ বেরার ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য ড. নারায়ণ ভাস্কর খারের বক্তব্যটি—

"While the Viceroy's Executive Council was considenng this mutiny of the Naval Rating in Bombay, Lord Wavel interrupted in the middle and said—I am not at all afraid of this mutiny of Naval Ratings in Bombay as two big leaders of a big political party have assured me of all help for suppressing the rebellion. These two big leaders must have been Maulana Azad and Sardar Patel, because within four or five days of this incident, a statement signed by these two leaders was published in the press exhorting the Ratings to withdraw this strike unconditionally. It is possible that this assurance could have been given without any interview either direct or through an intermediary! Certainly not, it is clear therefore that the Congress policy was two-faced. They used to say 'Quit India' outside or openly and privately assured the British Government of all sorts of help. At this very meeting of the Council the Viceroy disclosed that he had received blessings of Mahatma Gandhi

in the matter of quelling this mutiny of the Ratings. I was amazed at this strange disclosure and I silently praised the cunning diplomacy of the British."

"This episode of the blessings created bitter feelings in my heart about the duplicity of Gandhiji and Wavel." (N. B. Khare, *My Political Memories*, p. 120)

সর্দার প্যাটেল বিদ্রোহীদের শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিলেন। জিন্না সাহেবও সেই একই পরামর্শ দিলেন। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে নিশ্চিত জয় শেষ মেশ নেতাদের—হ্যাঁ, সব জাতীয় নেতার—নেতিবাচক মনোভাবের জন্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

## জাতীয় নেতাদের দ্বিচারিতার প্রকৃত কারণ

আজকের প্রজন্মের ভারতীয়দের মনে হয়তো এই প্রশ্ন বার বার জাগে যে, কেন জওহরলাল, প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসি নেতারা এবং জিন্না সাহেব নৌ-বিদ্রোহের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন না? কেন তাঁরা ওই সময় আন্দোলন এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কভাবে চলতে চাইছিলেন? কারণ একটাই, তা হল ১৯৪৫-৪৬-এর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারতে আসা পার্লামেন্ট সদস্য রবার্ট রিচার্ডের One Man Delegation-এর পেশ করা রিপোর্ট। ঠিক ওই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তাই Robert Richard Delegation-কে পাঠানো হয়েছিল সরেজমিনে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য। রিপোর্টে বলা হয়েছিল—আর ভারতবর্ষকে মিলিটারি দিয়ে শাসনাধীন রাখা যাবে না। রিপোর্টে বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা ইঙ্গিত ছিল। আমাদের জাতীয় নেতারা কেমন করে যেন ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল। তারপরই তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে, ক্ষমতা হস্তান্তর এবার হবেই এবং তা হবে বিনা রক্তপাতে—শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। সুতরাং আর আন্দোলন নয়, সংগ্রাম বা বিপ্লব তো কখনোই নয়।

জওহরলালের বন্ধু ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডয়ার্ডস্ রচিত *The Last Years of British Rule in India* বইটিতে আমাদের জাতীয় নেতাদের সংগ্রাম এড়িয়ে চলার মনোভাবটার ছবি চমৎকার ফুটে উঠেছে যখন তিনি লিখছেন—"Freedom was at hand and it needed only to be negotiated, not bought with blood" (Michael Edwards)

বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের সমর্থনে আমাদের জাতীয় নেতারা না এগিয়ে এলেও, এগিয়ে কিন্তু এসেছিল গোটা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ আর British Indian Army-র

ভারতীয় সৈনিকরা। ২৫ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই ও মাদ্রাজের Royal Indian Air Force-এর বৈমানিকরা এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি জব্বলপুরের স্থলবাহিনী ধর্মঘট পালন করেছিল। ব্রিটিশরাজ সবচেয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল যখন বোম্বাইয়ে পাঠানো সেনাবাহিনী ওখানকার বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল। বলাবাহুল্য, নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ-সৃষ্ট গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ এবং British Indian Army-র ভারতীয় সৈনিকদের চরম অসন্তোষ ও অস্থিরতা এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক ও বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি Strike Committee-র পক্ষ থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হল যে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন, করাচি, বোম্বাই, বিশাখাপত্তনম্ সব নৌ-ঘাঁটিতে ও যুদ্ধ জাহাজগুলিতে তাঁরা সিগন্যাল পাঠিয়েছিলেন তাঁদের Naval Strike প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা। আর সর্দার প্যাটেলের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাও।

এদিকে ওই বাইশ তারিখ বিকেল থেকেই গোরা সৈন্য বোঝাই কতকগুলি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ আস্তে আস্তে বিদ্রোহীদের জাহাজগুলি ঘিরে ফেলতে শুরু করে দেয়। যদিও বিদ্রোহীদের জাহাজগুলিতে ওই সময় শান্তির পতাকা উড়ছিল। তারপর সন্ধের অন্ধকারে ওই ব্রিটিশ জাহাজগুলো থেকে কামানের গোলা ছুটে আসতে শুরু করে দেয়।

সবাই তো স্তম্ভিত ও হতবাক্। জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতিরই কী মূল্য রইল? ভাইস-প্রেসিডেন্ট মদন সিং "খাইবার" জাহাজের বেতার যন্ত্রের কাছে গিয়ে আবার ঘোষণা করলেন যুদ্ধের কথা। তিনি বললেন, "যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বেইমান ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" কিন্তু এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আবার কি বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করা যায়? আর কতক্ষণই বা সে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? অগত্যা বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

আত্মসমর্পণের পর তারা কতদূর ভেঙে পড়েছিল তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক সতীশচন্দ্র মাইকাপ। তিনি লিখেছেন—"রাতের প্রহর শেষ হয়ে আসে। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ এম. এস. খানের কণ্ঠরুদ্ধ, গাল বেয়ে জলের ধারা, জলের ধারা অন্যান্য অনেক সদস্যদেরও। রেটিংগণ একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন, চুম্বন করলেন—করুণ সে হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মহিমা। জাতীয় নেতাদের আসন্ন ভারত ভাগ ও পদ সম্পদ প্রাপ্তিযোগের বলি হয়ে গেলেন বিপ্লবীগণ—তাঁরা পরাজিত।"

(সতীশচন্দ্র মাইকাপ, *বহ্নিমান নেতাজি সুভাষ*, পৃঃ ২৪১)।

তেইশে ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই "তলোয়ার", "ক্যাসল ব্যারাক" প্রভৃতি নৌ প্রতিষ্ঠান এবং "হিন্দুস্তান" প্রভৃতি যুদ্ধজাহাজ থেকে হাজারে হাজারে রেটিংদের গ্রেপ্তার করে অকথ্য অত্যাচারের জন্য অজানা সব বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। বসন্ত সিং নামে এক শিখ যুবক নাবিককে "মুলান্দ" কারাগারে প্রবেশের সময় গোপনে একটি জাতীয় পতাকা ও

নেতাজির ছবি পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন তিনি সেলের ভেতর নেতাজির ছবিটিকে অভিবাদন জানাতেন আর জাতীয় পতাকা ওড়াতেন আর বলতেন "জয় হিন্দ" ও "নেতাজি জিন্দাবাদ"। পরে জানা গিয়েছিল বিদ্রোহী নৌ-সেনা বসন্ত সিং-এর কপালে জুটেছিল অমানুষিক অত্যাচার আর পরিণামে অকাল মৃত্যু। অনেক শিবিরেই ও বন্দিশালাতেই আজাদ হিন্দের ফৌজি গানগুলি নিয়মিত গাওয়া হত।

ভারত আমার ভারতবর্ষ
স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো,
তোমাতে আমরা লভিয়া জনম
ধন্য হয়েছি ধন্য গো।।

## কয়েকটি অবিশ্বাস্য ঘটনা

নৌ-বিদ্রোহ বন্ধ হওয়ার পর কয়েকটি অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটতে দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ শাসকদের চিরবিশ্বস্ত গোর্খা ও বালুচ সৈন্যরা বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল। দ্বিতীয়ত, হুকুম পাওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সৈন্যরা ভয়ে নৌ-সেনাদের বন্দি করতে রাজি হয়নি। এমনকি, আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হয়নি। সর্বোপরি, বিদ্রোহী নৌ-সেনারা মুক্তি লাভের পর জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বিভিন্ন জেলে উপস্থিত হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বীর নৌ-সেনাদের মাল্যভূষিত করে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

## স্যার সৈয়দ ফজল আলি কমিশন

কয়েক মাস পরে পাটনা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ ফজল আলির সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ওই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন—বিচারপতি কে. এস. কৃষ্ণস্বামী, বিচারপতি মহাজন, ব্রিটিশ মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের পক্ষে ভাইস-অ্যাডমিরাল প্যাটারসন ও মেজর-জেনারেল রিস্। বোম্বাই, কলকাতা, করাচি ও মাদ্রাজে কমিশনের অধিবেশন হয়েছিল। ৬০০ (ছয়শো) পাতার একটা রিপোর্ট কমিশন ব্রিটিশরাজের হাতে তুলে দিয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। কিন্তু তখন তো নয়ই, আজ পর্যন্ত ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি। তবে জনমতের প্রচণ্ড চাপের মুখে শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের বিশে ফেব্রুয়ারি ছয় হাজার শব্দের যে অতি সংক্ষিপ্ত অংশ প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে স্বীকার করা হয়েছিল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের উপস্থিতি এবং তাঁদের জনসংবর্ধনাই ওই বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল। অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিক আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও জোয়ানদের কার্যকলাপই বীর নৌ-সেনাদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কয়েকমাস পর ভারত-ভাগ ও ক্ষমতালাভের বিষয়ে নেতারা এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ঘটনা প্রবাহের এমনই দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে ওই ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের কথা বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। মনে হয় তবুও যেন আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে আছে ওঁদের তারুণ্য, বীরদর্প আর চারণ কবিরা গেয়ে চলেছেন মৃত্যুভয় হারা ভারতীয় নৌ-সেনাদের বীরগাথা। আজও যখন ওই দুঃসাহসিক নৌ-বিদ্রোহের কথা মনে হয়, তখনি আমাদের মন গর্ব ও কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। বারবার মনে পড়ে যায় গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর অসামান্য সৃষ্টি বিখ্যাত গানটির সেই কথাগুলি—

মুক্তির মন্দির সোপানতলে,<br>
কতো প্রাণ হলো বলিদান<br>
লেখা আছে অশ্রুজলে।<br>
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা<br>
বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙা<br>
তারা কি ফিরিবে আজ এই সুপ্রভাতে<br>
কতো তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।।

## তথ্যসূত্র


১. N. B. Khare, *My Political Memories.*

২. R. C. Majumdar, History of the *Freedom Movement*, Vol. III.

৩. R. C. Dutta, *Mutiny of the Innocent.*

৪. সতীশচন্দ্র মাইকাপ, *বহ্নিমান নেতাজি সুভাষ*।

৫. Michel Edwards, *The Last Years of British Rule in India.*

## পরিশিষ্ট ক

# মহাত্মা গান্ধী, অহিংসা নীতি এবং হরিজন আন্দোলন

অহিংসা দুর্বলের অহংকার নয়, ক্লীবত্বের নিরুপায় আস্ফালন, অহিংসা শক্তি ও তেজস্বিতার দুর্জয় প্রকাশ। তাই গান্ধীজির অহিংসা সাধনাও ছিল শক্তির সাধনা, তেজস্বিতার বহিঃপ্রকাশ। কটিমাত্র চীরবস্ত্রাবৃত গান্ধীজি ছিলেন সত্য, প্রেম ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। ব্রিটেনের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী সার উইনস্টন চার্চিলকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, "মি. গান্ধী বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ"। কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শুধু একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদই নন, তিনি একজন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক।

মোহনদাসের জন্ম ১৮৬৯ সালের ২-রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরের এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। এই মহামানবের পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী বা কাবা গান্ধী। মায়ের নাম পুতলী বাঈ। গান্ধীজি পিতার কাছ থেকে প্রবল সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতা এবং মায়ের কাছ থেকে গভীর ধর্মানুরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক স্বভাবের বালক কিন্তু সত্যের প্রতি ছিল দুর্বার আকর্ষণ। গান্ধীজির আত্মজীবনী কিংবা তাঁর লেখা *মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ* পড়লেই বোঝা যায় শুধু ওজনদার দর্শনই নয়, বরং হাসতে হাসতে সরলভাবেও অহিংসা ও সততা অবলম্বন করা যায়। আর সেটাই পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে গান্ধীবাদ নামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য গান্ধীজি বিলেত যান। ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু কয়েকজন ভারতীয় বণিকের আমন্ত্রণে ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে চলে যান। সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সমাজের ওপর নাটালের ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সরকারের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুরু করে দেন তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য গড়ে তোলেন সংগ্রাম পরিষদ। একদিকে হিংস্র শ্বেতাঙ্গ সরকারের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী, অন্যদিকে অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষের পুরোধায় তিনি একা। শেষপর্যন্ত একুশ বছর সংগ্রামের পর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ও ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সরকারকে মানতে বাধ্য করেছিলেন ভারতীয়দের মানবিক দাবিগুলি। দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে থাকাকালীন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "টলস্টয় ফার্ম"। যা নাটালে আজও সত্যনিষ্ঠ আশ্রম হিসেবে বিদ্যমান।

১৯১৪ সালে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও দুচোখে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরে এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কিন্তু রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের নির্দেশ

মতো সরাসরি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গুজরাটের সবরমতী নদীর তীরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মানুষের সেবা ও সংগঠনের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন। ওই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুনে সারা ইউরোপ জ্বলছে। বিপন্ন ব্রিটিশ সাহায্যদানের বিনিময়ে যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ ভারতবাসীদের উপহার দেয়—'রাওলাট আইন'। প্রতারিত ভারতবাসী ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ঘটে যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ড ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল।

১৯২০-র অগাস্ট মাসে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজিকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গান্ধীজি ওই সুযোগে দেশবাসীর হাতে তুলে দেন অহিংস অসহযোগের হাতিয়ার, আর আশ্চর্যের ব্যাপার অহিংসার হাতিয়ারেও নিরস্ত্র ভারতবাসী ক্রমশ হয়ে ওঠে দুর্জয় ও শক্তিশালী।

অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতার পর ১৯২২ সালে গান্ধীজি রাজনীতি ছেড়ে আবার ফিরে যান গ্রামীণ চরখাকাটা, মানবসেবা ও সংগঠনের কাজে। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় তারই ফলে আবার তাঁকে ১৯২৬-এ ফিরে আসতে হয় ভারতীয় রাজনীতির আবর্তে।

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার দায়িত্ব পেয়ে তিনি ডান্ডি অভিযান দিয়ে শুরু করে দেন লবণ সত্যাগ্রহ। ওই সময় গান্ধীজি বলেছিলেন—"আমি যখন যাত্রা শুরু করব সারা ভারতবর্ষ তখন সাগর তরঙ্গের মতো ফুঁসে উঠবে।" সত্যই সেদিন গান্ধীজির আহ্বানে ফুঁসে উঠেছিল আসমুদ্রহিমাচলের ভারতবাসী। তাই সবাক বিস্ময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন—

> কিসের তরে গো ভারতের আজি—
> সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
> কুমারিকা হতে হিমাচল গিরি—
> একতারে কভু ছিল না গাঁথা,
> আজিকে একটি চরণ আঘাতে—
> সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।

আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডন যান। কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে ওই সময় সশস্ত্র বিপ্লবীদের তৎপরতায় ব্রিটিশরাজ প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ওদিকে গোটা ত্রিশের দশক ধরে হিটলার ও তাঁর জার্মান নাৎসি বাহিনীর দাপটে সারা ইউরোপ টলমল। ইংল্যান্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ারের তোষণ নীতি পোষ

মানাতে পারেনি হিটলারকে। ওদিকে লিগ অব্ নেশন্‌স-এর মর্যাদাও ভূলুণ্ঠিত। ইতিমধ্যে ইতালির মুসোলিনি এবং জাপানের তোজো হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। উপায়ন্তর না দেখে সাম্যবাদী রাশিয়া নাৎসী জার্মানির সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে। গান্ধীজি ওই সন্ধিক্ষণে কুচক্রী ইংরেজের ছলনায় না ভুলে ঘোষণা করলেন—"Co-operation in any shape or form with this satanic government is a sin". ডাক দিলেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের। ঘোষণা করলেন তাঁর বিখ্যাত আওয়াজ "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। ১৯৩৮-এর মিউনিখ চুক্তির পর থেকেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিতে বলে আসছিলেন। এতদিনে গান্ধীজি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ৯-ই অগাস্ট ১৯৪২-এ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই ৮-ই অগাস্টের ভোর রাত্রে গান্ধীজি তাঁর সকল সহকর্মীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন ওই আন্দোলনের আঘাতেই ব্রিটিশরাজের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল।

সিপাহি বিদ্রোহেব পর থেকেই ব্রিটিশরাজ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য দ্বিজাতি-তত্ত্বের বীজ বপন করে আসছিল। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ঘটে গেল ১৯৪৬ সালের নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা ও নোয়াখালিতে অহিংসার দূত শান্তির বার্তাবহ গান্ধীজি করলেন শান্তি পদযাত্রা। তাঁর জনসম্মোহিনী শক্তিতে কলকাতা ও নোয়াখালি শান্ত হল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ভীষণভাবে জ্বলে উঠল বিহার, দিল্লি ও পাঞ্জাবে। দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল। অবশেষে ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিল।

এই ভারতবিভাগ গান্ধীজি অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। সরলতা, অহিংসা, সততার এবং সত্যের প্রতিমূর্তি গান্ধীজিকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ। গান্ধীজি তখন দ্বিধাবিভক্তি ও স্ববিরোধিতার অনন্য এক উদাহরণ, কখনও তাঁর এক ডাকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা জড়ো হয়ে যায়, আবার কখনও সামান্য একটা থানায় আগুন ধরানোর ঘটনার জন্য নিজেই ভারতব্যাপী আন্দোলন থামিয়ে দেন। শেষের দিকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ক্ষমতাসীন নেতাদের ক্ষমতা লোলুপতার জন্য রাজনীতিতে তিনি হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ। কারণ ক্ষমতার এবং অর্থের লোভ তো তাঁর কোনদিনই ছিল না। তিনি স্থিতপ্রাজ্ঞ, কামনা-বাসনাহীন মুক্ত পুরুষ। দেশভাগ রোধ করতে না পেরে বিষণ্ণ বিমর্ষ গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক হানাহানির রক্তে ভেজা প্রান্তর বেয়ে হেঁটে চলেন সম্পূর্ণ একাকী। কংগ্রেস নেতৃত্বের কেউ নেই তাঁর সঙ্গে। দেশনেতৃ লীলা রায়কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "My leaps are sealed. You go to Pandit Nehru and Sardar Patel for any official interview."

১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭ মহা আনন্দের দিনটিতে স্বাধীনতার অন্যতম রূপকার গান্ধীজি দূরে সরে রইলেন দিল্লি থেকে। আত্মগোপন করে রইলেন কলকাতায় বেলেঘাটার হায়দারি হাউজে। নেহরু, প্যাটেল বারবার অনুরোধ জানালেন গান্ধীজির অভিনন্দন বার্তার জন্য। জাতির পিতা কোন বাণী পাঠালেন না। ১৫ই অগাস্ট গান্ধীজির জীবনের চরম বেদনা, ব্যর্থতা, পরাজয় ও অনুশোচনার দিন। সেদিন তাঁর মগ্নচিত্তে বারবার ভেসে উঠছে একটিই মুখচ্ছবি। যাকে তিনি অন্যায়ভাবে, অনৈতিকভাবে ভারতীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। শরৎ বসুকে দেখে বেদনার্ত অশ্রুসজল স্বগত কণ্ঠে ধীরে ধীরে মহাত্মা বললেন, "আঃ! সে যদি একবার ফিরে আসত। Only Subhas can save the country to-day." স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণে এই ছিল জাতির পিতার শেষ বার্তা। (পবিত্র কুমার ঘোষ, *নেতাজি*, বর্তমান পত্রিকা, জানুয়ারি ২১, ২০০৭)

এরপর আর বেশিদিন তিনি বাঁচেননি। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রতিদিনের মতো দিল্লির প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে চলেছেন শান্তি, সততা, ত্যাগ ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কিন্তু ধর্মান্ধ হিন্দু যুবক নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সের পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। 'হে রাম' বলে নির্বাপিত হল এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনদীপ। মূঢ়তা ও বর্বরতায় আমাদের জাতীয় ইতিহাস হল কলঙ্কিত। যেমন ভবিষ্যতে আরও দু' দুবার হয়েছে কলুষিত-কলঙ্কিত এই ভারতবর্ষে। আরও দুই গান্ধীর হত্যাকাণ্ডে। ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর হত্যা করা হয় ভারতের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে, আর ১৯৯১-র ২১ মে হত্যা করা হয় ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে।

ভারতবর্ষের এক অতি দুঃসময়ে গান্ধীজির আবির্ভাব। একদিকে বিদেশি শাসনের নির্মম অত্যাচারের কাছে দেশবাসীর অসহায় আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে পরাধীনতার দুর্বিষহ গ্লানি সমগ্র জাতির অন্তরাত্মাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ওই সময় হতাশ ও নির্বীর্য জাতিকে মহাবলে বলীয়ান করে তোলার জন্যই যেন আবির্ভাব ঘটেছিল এই তেজোদৃপ্ত মহাপুরুষের।

গান্ধীজির বাণী সত্য ও অহিংসার বাণী, মানবতার বাণী। মানবপ্রেম ও সত্যানুরাগ তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজে যারা অবহেলিত, পতিত, অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় গান্ধীজি 'হরিজন' নাম দিয়ে তাদের সেবার জন্য গড়ে তুলেছিলেন 'হরিজন আন্দোলন'। ছুৎমার্গ-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একটি ভাষণে বলছেন, "Every mother is the scavenger in regard to her own child and every

student of modern medical science is the tanner in regard to dissect the human carcases."

বঞ্চনাও ঘটেছে গান্ধীজির জীবনে বহুবার। বিশ্বেব শ্রেষ্ঠতম শান্তির বার্তাবহ গান্ধীজি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে পাঁচবার মনোনীত হয়েছিলেন। যে পাঁচবার গান্ধীজি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন সেই বছরগুলি হল ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮। সেই সময় নোবেল কমিটি তাঁকে শান্তির জন্য পুরস্কারের যোগ্য মনে কবেনি। কিন্তু পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল বলে জানিয়েছেন নোবেল পুরস্কার কমিটির সচিব গেইর লুন্ডেস্টাড। মোহনদাস করমর্চাদ গান্ধীর নাম নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় না থাকা সবচেয়ে 'বড়ো ভুল' বলে মনে করে নোবেল কমিটি। নির্বাচকদেব ইউরোপকেন্দ্রিক মনোভাবই এই ভুলের জন্য দায়ী বলে মনে করেন গেইর লুন্ডেস্টাড। তৎকালীন নোবেল কমিটি যাই মনে করুক, গান্ধীজিকে পরম শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন কিংবদন্তী বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। গান্ধীজি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে এটা বিশ্বাস করাই মুশকিল হবে যে এইরকম একজন জলজ্যান্ত মহামানব পৃথিবীতে ছিলেন।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে মানবতার যে উদার অভ্যুদয় ঘটেছিল গান্ধীজির মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা গেছে তার চরমতম অভিব্যক্তি। বর্তমান পৃথিবীতে গান্ধীজি তাই প্রেম, সত্য ও অহিংসার উজ্জ্বলতম প্রতীক এক মহান অবতার পুরুষ, নবভারতের নবরূপে আবির্ভূত বুদ্ধ বা খ্রিস্ট অবতার।

## পরিশিষ্ট খ

# জাতির জীবনে একুশে অক্টোবরের প্রভাব

ভেঙ্গেছো দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।

"ঈশ্বরের নামে আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে ভারতবর্ষকে ও আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব। স্বাধীনতা লাভের পরও, সে স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে আমার শেষ রক্ত-বিন্দু বিসর্জন দেবার জন্যও প্রস্তুত থাকব।"

মন্ত্রিসভার সদস্যরাও একে একে ওই শপথ-বাক্য পাঠ করলেন। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়া হল 'জনগণমন অধিনায়ক-এর হিন্দি অনুবাদ।

সুভাষচন্দ্র জীবনে যেসব স্বপ্ন দেখেছিলেন তার একটি পূরণ হল। আনন্দে ও আবেগে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে পড়েছিল। ১৯ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে—সারারাত ধরে—যেন দৈব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নেতাজি লিখেছিলেন ওই ঘোষণাপত্রটি। লেখা শুরু হয়েছিল রাত্রি ১১টা আন্দাজ শেষ হয়েছিল ভোর ৬টায়। চুমুক দিয়েছিলেন একের পর এক কফির কাপে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক চেয়ারে বসে থেকে অতুলনীয় ভাষায় তৈরি করেছিলেন ওই অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক দলিলটি। মননশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মেধা, ইতিহাস-চেতনা ও অনুপম লেখনভঙ্গির এক আশ্চর্য নিদর্শন। তারপর হুবহু এবং নির্ভুল টাইপ করে দিয়েছিলেন প্রচার সচিব আয়ার সাহেব।

ভগবানের নামে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা ভারতবর্ষকে এক জাতি হিসেবে গঠন করেছিলেন তাঁদের নামে এবং অতীতের যেসব বীর নায়করা আমাদের নিকট বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন তাঁদের নামে সমস্ত ভারতবাসীকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার জন্য শত্রুপক্ষকে চরম আঘাত হানতে আহ্বান জানানো হল—

গঠিত হল অস্থায়ী (interim) স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা ঃ

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র দপ্তর, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীস্বামীনাথন, নারী সংগঠন, এস. এ. আয়ার প্রচার সচিব,

এছাড়া, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি হলেন—আজিজ আমেদ, এন. এস. ভকত, জে. কে. ভোঁসলে, গুলজারা সিং, এস. জেড্ কিয়ানি ও শাহনাওয়াজ খান প্রভৃতি। এঁরা সবাই লে. কর্নেল। আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হলেন—এ. এন. সরকার এবং সর্বোপরি প্রধান পরামর্শদাতা হলেন—মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ঘোষণা পত্রের শুরুতেই নেতাজি স্মরণ করলেন বাংলার সিরাজউদ্দৌল্লা, মীরমদন ও মোহনলালকে। দক্ষিণ ভারতের

হায়দার আলি, টিপু সুলতান ও ভেলু অম্পিকে। লিখলেন মহারাষ্ট্রের আপ্পাসাহেব ভোঁসলে আর বাজিরাওয়ের কথা। অযোধ্যার বেগমদের, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যামসিং আতারিওয়ালা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপি, ডোমরাওয়েনের মহারাজা কুনাওয়ার সিং, নানাসাহেব প্রভৃতি বীরদেব কথা তাঁর লেখনীতে এসে গেল। স্বাধীনতা লাভের জন্য, ভারতের মঙ্গলের জন্য এবং জগৎ সভায় ভারতের গৌরবময় স্থানলাভের জন্য শপথ নেওয়ার কথা ঘোষণাপত্রে স্থান পেল। বলা হল, অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ ও তার মিত্রদের বিতাড়ন। তারপর স্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। সে কাজ হবে ভারতবাসীর ইচ্ছানুসারে ভারতের মাটিতে। যতদিন তা না হয় ততদিন অস্থায়ী সরকার ভারতীয়দের অছি হিসেবে দেশের শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাবে। আর এই অস্থায়ী সরকাব জন্মলগ্ন থেকেই সকল নাগরিককে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সকল বিষয়ে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হল।

একুশে অক্টোবর ১৯৪৩ সাল। সকাল সাড়ে দশটায় অধিবেশন বসল সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংসে (Cathay Buildings)। গোটা দক্ষিণ এশিয়া ভেঙে সেদিন মানুষ এসেছিল আজাদ হিন্দ সরকাবের প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হতে। তাদের নিজস্ব সরকার এই আজাদ হিন্দ সরকার। আর তার সর্বাধিনায়ক—স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আনন্দে, গর্বে, সবার বুক ফুলে ওঠে—মনে জাগে ইংরেজ বিতাড়নের দুর্জয় সংকল্প।

ওই দিনই সিঙ্গাপুর বেতারে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় বলেন, আজাদ হিন্দ সরকার তার সশস্ত্র জাতীয় বাহিনী নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে ভারতের মাটিতে যেদিন জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবে সেইদিনই দেশজুড়ে সত্যকার বিপ্লব শুরু হবে। আর সেই আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ওই দিনই নেতাজি আরও একটা পৃথক বিবৃতিতে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেন। ব্যাপারটা তাঁর কথাতেই বলি—"গত বাইশ বছর আমার রাজনৈতিক জীবনে, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহের সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে আমি বুঝেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের দুটি বড়ো উপাদানের অভাব রয়েছে। প্রথমটি হল জাতীয় বাহিনী আর দ্বিতীয়টি হল সেনাদল পরিচালনার উপযুক্ত শক্তিশালী একটি জাতীয় সরকারের।" তিনি আরও বলেন—"এই অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে আমরা একদিকে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মনে রেখেছি। আর অপর দিকে ইতিহাসের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছি। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯১৬ সালে আইরিশরা একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) চেক্‌জাতিও একাজ করেছিলেন। আর যুদ্ধের অবসানে মোস্তাফা কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়াতে তুর্কি জাতির অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

এখন প্রশ্ন হতে পারে—নেতাজি বিদেশে ওই অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন কেন? কী তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল?

মনে রাখা দরকার, অস্থায়ী সরকার গঠনের বাস্তবে বহু সুবিধা আছে। প্রথমত, যে কোন নেতা এখন আর পৃথকভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে না। সমস্ত সংগ্রাম সমন্বিত হবে ঐ অস্থায়ী সরকারের পরিচালনায়। শত্রুপক্ষকেও যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে ওই সরকারের সঙ্গে সংগ্রামে। এছাড়াও, ওই সরকার শত্রুর চোখে বেশ কিছুটা মর্যাদা লাভ করবে। অপরাপর বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নানা ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে। যেমন—অর্থ সাহায্য, ও তাদের ভূখণ্ড থেকে যুদ্ধ পরিচালনা। অস্থায়ী সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তখন আর নিছক অন্তর্দ্বন্দ্ব বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। সে সংগ্রাম তখন আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবে। সাময়িকভাবে নিজেদের দেশের সামরিক ঘাঁটিগুলি শত্রু কবলিত হলে বন্ধু রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে সংগ্রাম চালানো যাবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল শত্রু বিতাড়নের পর অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে অস্থায়ী সরকারের সমস্ত ক্ষমতা স্থায়ী সরকারের হাতে সমর্পণ করতে পারা যাবে।

অস্থায়ী সরকার গঠন উপলক্ষ্যে মালয়, জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম, ইন্দোচীন ও হংকং-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারিভাবে নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। ওই রাষ্ট্রগুলি হল—(১) জার্মানি, (২) ক্রোয়েশিয়া, (৩) নানকিং চীন, (৪) মাঞ্চুকুয়ো, (৫) ফিলিপাইন, (৬) ব্রহ্মদেশ, (৭) ইটালি, (৮) জাপান এবং (৯) শ্যাম। এছাড়াও আয়ারল্যান্ডের ডি-ভ্যালেরা নেতাজিকে ব্যাক্তিগতভাবে অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

ইতিহাসের দিক থেকে তাই 'একুশে অক্টোবর' তারিখটাই আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রই ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। আরও একটা কথা। ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ তারিখেই হয়েছিল ভারত ভাগ। ওই ১৫ অগাস্ট তারিখেরই অব্যবহিত আগে ও পরে ইতিহাসের নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় লক্ষ লক্ষ মানুষ নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা ও আত্মীয়হারা হয়েছিল। নারী-নির্যাতন ও ধর্মান্তকরণ যে কত হয়েছিল তার কোনো হিসেব নেই। আসল কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইমারত গড়ে উঠেছিল বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের বলি দিয়ে—অর্থাৎ কিনা বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে। তাই তো স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও আমাদের প্রজন্মের বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের স্বাধীনতা দিবসের অনুভূতি আজও কেমন যেন করুণ ও চোখের জলে ভেজা।

অন্য দিকে ২১-শে অক্টোবর ১৯৪৩-এর স্মৃতি নিয়ে আসে এক বিশুদ্ধ ও অপার আনন্দ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা জাতি, ধর্ম, দল ও মত নির্বিশেষে জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে অখণ্ড স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের অবসান এবং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। অনুগামীদের এভাবে অনুপ্রাণিত করতে বিশ্বের ইতিহাসে আর কোন নেতা পেরেছেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই তো সুভাষচন্দ্র শুধু নেতাই নন—তিনি আমাদের নেতাজি—যে নেতার কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আমাদের স্বাধীনতা এল বাংলা ও পাঞ্জাবকে বলি দিয়ে—দেশ ভাগের মাধ্যমেই। কিন্তু কেন? সে কথাই তো জানাব পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয়দের।

**ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির দূরদৃষ্টি :** ব্রিটেনের ওই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরের বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কামান-বন্দুকের মাধ্যমে আর বেশিদিন ভারত শাসন করা সম্ভব নয়। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে রক্তারক্তির পথে ভারত ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলে ব্রিটেনের কোটি কোটি টাকার লগ্নি বাঁচানো যাবে না। তাই বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব তাঁর ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্টকে বুঝিয়েছিলেন যে ওই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে (প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে) শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতে পারলেই সবদিক থেকে সবকিছু বজায় থাকবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক প্রাধান্য ভারতবর্ষে ঠিকই অব্যাহত থাকবে। এজন্যই ১৯৪৫-৪৬-এর শীতকালে রবার্ট রিচার্ডের One-Man Parliamentary Delegation-এর রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই অ্যাটলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে, যেমন করেই হোক দেশভাগ করেই দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

**জাতীয় নেতাদের ক্ষমতার মোহ ও ব্যর্থতা :** এদিকে কীভাবে যেন রবার্ট রিচার্ড ডেলিগেশনের রিপোর্ট পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জাতীয় নেতারা বুঝে ফেলেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর এবার হচ্ছেই এবং তা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও বিনা রক্তপাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। সুতরাং আর আন্দোলন নয়, সংগ্রাম বা বিপ্লব তো কোন মতেই নয়। জওহরলালের বন্ধু ঐতিহাসিক মাইকেল এডোয়ার্ডস্-এর মতে ঠিক ওই সময় জওহরলাল নেহরুর মনোভাবটা ছিল এই রকম—"Freedom was at hand and it needed only to be negotiated, not bought with blood" (Michel Edwards, *Last Years of British Rule in India.* p. 126)।

সাংবাদিক পবিত্রকুমার ঘোষের সংযোজন—বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নেতাজি-গবেষক পবিত্রকুমার ঘোষ গত একুশে জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে *বর্তমান পত্রিকায়* একটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেন। লেখাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরছি তাঁরই ভাষায়—"নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ঘটে গিয়েছে বেশ কয়েকবার। তাঁর মত ও পথ নিয়ে তথাকথিত কয়েকজন শীর্ষনেতা বার বার তাঁকে আঘাত করেছেন। তাঁর 'দিল্লী চলো' অভিযান সম্পূর্ণ হলে ভারতের চেহারাই পালটে যেত। লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়ত ১৯৪৫ সালেই। সুভাষচন্দ্র ভারতকে স্বাধীন

করার জন্য সমরবাহিনী নিয়ে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ সত্য সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখা হয়েছিল এ দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে। নেতাজি যদি ১৯৪৫ সালে বা তারপর ভারতে ফিরে আসতেন তাহলে ভারতভাগের এই মর্মন্তুদ পরিণাম ঘটত না। তাঁর নেতৃত্বে ভারত নিজ শক্তিতেই স্বাধীনতা অর্জন করত। ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে আমাদের স্বাধীনতা পেতে হত না।"

"গান্ধীজি কোনো মতেই সুভাষচন্দ্রকে স্বমতে আনতে পারেননি। তাই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সে কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু নেতাজি ও তাঁর আই. এন. এ.-র কীর্তিকাহিনী জানার পর গান্ধীজি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুরোনো বিরোধের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর পরম অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জওহরলাল নেহরু আর সর্দার প্যাটেল গান্ধীজির কোন কথা শুনতে আর প্রস্তুত ছিলেন না। গান্ধীজিকে ব্যবহার করেই নেহরু-প্যাটেল ক্ষমতায় আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার কাছাকাছি আসতেই তাঁরা সর্বাগ্রে গান্ধীজিকে ত্যাগ করেছিলেন। শুধু কান্নাই ছিল তখন গান্ধীজির একমাত্র সম্বল আর সুভাষ বিরোধিতার জন্য অনুশোচনার তীব্র জ্বালা।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট তারিখের আগের ও পরের দিনগুলিতে গান্ধীজির বেদনার্ত আত্মা শুধু নেতাজির পথ চেয়েছিল। তিনি বার বার স্বগতোক্তিতে বলতেন—"'আঃ! সে যদি একবার ফিরে আসত।' নেতাজি ফিরে আসবেন বলেই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস ছিল। তাই নেতাজির মৃত্যু সংবাদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।"

## পরিশিষ্ট গ

# ইতিহাসের নিরিখে পনেরোই অগাস্ট ও অগাস্ট মাস

পনেরোই অগাস্ট শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও একটা বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত। কত জাতির অভ্যুদয়-ক্ষণ। কত মনীষীর জন্মলগ্ন। আবার কত মহাজীবনের প্রয়াণ মুহূর্ত।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট। দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। কিন্তু নেতৃত্বের ব্যর্থতায় স্বাধীনতার ইমারত গড়তে হল বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের বুকের রক্তে বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে। তাই তো আমাদের প্রজন্মের বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের কাছে পনেরোই অগাস্টের অনুভূতি কেমন যেন করুণ আর চোখের জলে ভেজা।

স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু একই সঙ্গে হারিয়ে বসেছি গান্ধীজি ও নেতাজির স্বপ্নের ভারতবর্ষকে। অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, এবং আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার বিষাক্ত অভিশাপ।

পনেরোই অগাস্ট কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা দিবস নয়। শুধু ওই দিনটিতেই স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। ভাবত ছাড়াও স্বাধীন হয়েছে রিপাবলিক অব্ নর্থ কোরিয়া, আফ্রিকান কঙ্গো আর লাতিন আমেরিকার প্যারাগুয়ে।

১৪ অগাস্ট স্বাধীন হয়েছে পাকিস্তান ও নরওয়ে। এছাড়াও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আইভরি কোস্ট, জামাইকা, সুইজারল্যান্ড, বলিভিয়া, সাইপ্রাস, ডোমেনিকান রিপাবলিক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সেনেগাল, রুমানিয়া, উরুগুয়ে, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো প্রভৃতি আরও ১৪টি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওই অগাস্ট মাসেই। এজন্যই তো স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাতে আমাদের বৈদেশিক দপ্তরকে অগাস্ট মাসে যেমন ব্যস্ত থাকতে হয় অন্য কোন মাসে তেমনটি হয় না। আসলে অগাস্ট মাসটাই হল স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের মাস। কেমন যেন একটা মুক্তির হাওয়া বয়ে চলে সারা মাস ধরে।

**১৭৬৯ সালের পনেরোই অগাস্ট। ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের। বিশ্ব ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির বাবা ছিলেন পেশায় উকিল। কর্সিকা ওই সময় ছিল ফ্রান্সের শাসনাধীন। তাই স্বদেশের (কর্সিকার) স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ফরাসি বিপ্লবের আদর্শগুলো (Liberty, Equality and Fraternity) বাস্তবে রূপায়িত করতে তিনি কর্সিকা ছেড়ে ফ্রান্সে চলে এসেছিলেন।**

১৭৭১ সালের ১৫ অগাস্ট। স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট। প্রত্যেক বাঙালির অন্তরে ওয়ালটার স্কটের জন্য আছে একটা বিশেষ শ্রদ্ধার আসন। কেননা জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য স্যার স্কটের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। আর এজন্যই তো বাঙালি সেদিন আদরের কৌতুকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাংলার স্কট" বলে অভিহিত করেছিল।

১৮৭২ সালের পনেরোই অগাস্ট। কলকাতার চৌরঙ্গি অঞ্চলের ব্যালার্ডস বিল্ডিংস-এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অগ্রদূত বিপ্লবী ও সাধক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ১৮৯২-এ গ্রিক ও লাতিনে প্রথম স্থান অধিকার করে I.C.S পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত হয়ে যান। কেননা ওই পরীক্ষাটির কদিন আগে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলেন ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তিনি (অরবিন্দ ঘোষ) যেন ব্রিটিশের গোলামি না করে দেশমাতৃকার সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ভারতমাতার যে চারজন সুসন্তান I. C. S.-এর রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজনই ছিলেন বাঙালি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানগুরু শ্রীঅরবিন্দ, এবং কর্মগুরু নেতাজি সুভাষচন্দ্র। চতুর্থ ব্যক্তিটি হলেন সুভাষচন্দ্রেরই অনুগামী সহকর্মী হরিবিষ্ণু কামাথ।

১৬ অগাস্ট, ১৮৮৬ সাল। ওই দিনটিতে দুনিয়ার মানুষ অনাথ হয়ে পড়েছিল যখন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহ রেখেছিলেন।

১৯০৭ সালের ১৩ অগাস্ট। ওই দিনটিতে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে একটি তেরঙ্গা পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন ভারতের বিপ্লববাদের জননী মাদাম রুস্তমজি ভিকাজি কামা। পতাকাটির রং ছিল—লাল, সবুজ ও হলুদ। তার মধ্যে লেখা ছিল—"বন্দে মাতরম্"। এটিকেই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকা বলে গণ্য করা হত। এছাড়াও তিনি ব্রিটেনে "Free India Society" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে ব্রিটিশ শাসকদের দমন ও পীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্যারিসে চলে আসেন এবং সেখান থেকেই ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এর ঠিক দুবছর আগে ১৯০৫ সালের ৮ই অগাস্ট তারিখে টাউন হলে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার শপথ গৃহীত হয়। এরও বহুপূর্বে ১৭৬৫ সালের ১২ অগাস্ট East India Company বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করার পর থেকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়।

১১ অগাস্ট, ১৯০৮ সাল। এই দিনটির কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। কেননা, ওই দিনটিতেই ফাঁসির মঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন অগ্নিযুগের প্রথম দুই বাঙালি শহিদের অন্যতম মৃত্যু-পাগল কিশোর, ক্ষুদিরাম

বসু। ঘটনাটি সারা দেশের মানুষকে কীভাবে যে স্পর্শ করেছিল তা বেশ ভালোভাবেই অনুভব করা যায় কোন এক অখ্যাত পল্লি-কবির লেখা গানটি থেকে—

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।

১৯২৬ সালের ১৬ অগাস্ট। অন্তহীন আশা জাগিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কিন্তু একুশ বছর বয়স পূর্ণ না হতেই সব কিছু অপূর্ণ রেখেই চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে।

১৯২৭ সালের ২৬ অগাস্ট জন্ম হয়েছিল আকাশবাণীর ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান এই কলকাতায়। আবার এই কলকাতাতেই প্রথম প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল দূরদর্শনের ১৯৭৫ সালের ৯ অগাস্ট, তারিখে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মেছিলেন ২ অগাস্ট, ১৮৬১।

সেবার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে সুদূর যুগোস্লাভিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন নোবেলজয়ী মাদার টেরিজা। মাদার টেরিজার জন্ম হয়েছিল ২৬ অগাস্ট, ১৯১০।

১৯৩৯ সালের ১৯ অগাস্ট সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়েছিলেন। তবে ওই ইচ্ছেটা তাঁর মনে গভীরভাবে দানা বেঁধেছিল চার বছর সাত মাস আগেই ১৯৩৪-৩৫ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে। ওই সময় একমাস কাল এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি অবস্থায় থেকে পিতা জানকীনাথ বসুর পারলৌকিক কাজকর্ম শেষ করে ব্রিটিশ শাসকদের হুকুমে আবার তাঁকে নির্বাসনের জন্য ইউরোপ ফিরে যেতে হয়েছিল। ২০ জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া জাহাজে রোমে পৌঁছান এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। একদিন রোমের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখে বেড়ানোর সময় Hall of Martyrs ভবনটি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। এবং তখুনি মনে মনে সংকল্প করেন যে কলকাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে অনুরূপ একটি ভবন অবশ্যই নির্মাণ করাবেন।

মনে পড়ছে লেনিনের সহযোগী এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান নায়ক ট্রটস্কির কথা। গভীর বেদনার সঙ্গে মনে হচ্ছে ১৯৪০ সালের ২১ অগাস্ট তারিখে মেক্সিকোর উপকণ্ঠে তাঁর নিজের বাড়িতে কীভাবে তিনি ফ্রাঙ্ক জনসন নামে এক ফরাসি ইহুদি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১৯ অগাস্ট বিকেলে ট্রটস্কি এই ব্যক্তিকে তাঁর নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকেছিলেন। নিমন্ত্রিত অতিথি বলে প্রহরীরা সেদিন জনসনকে তল্লাশি পর্যন্ত করেনি। এই সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়ে জনসন ট্রটস্কিকে হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। ট্রটস্কির এক দেহরক্ষীর জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে জ্ঞান হারাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ট্রটস্কি বলেছিলেন—"I think Stalin has finished the job he started".

লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ট্রটস্কির মতবিরোধ চরমে পৌঁছে গেলে ১৯২৭ সালে ট্রটস্কিকে দল থেকে বহিষ্কার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। পরে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও বহিষ্কার করা হলে তিনি মেক্সিকোর উপকণ্ঠে চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩। জন্ম ১৮৭৭ সালে। সোভিয়েতের ট্রটস্কি যেন ভারতের সুভাষচন্দ্র।

মনে পড়ছে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বর্ষণমুখর সেই বাইশে শ্রাবণের কথা। কলকাতা, বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবন সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে। সেদিনের সেই রোদনভরা দিনটিরও তারিখ ছিল ১৯৪১-এর ৭ অগাস্ট।

১৯৪২' সালের ৮-৯ অগাস্টের মধ্যরাত্রে গান্ধীজিই ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তবে গান্ধীজি ডাক দিলেও ওই আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার ছিলেন নেতাজি সুভাষ। কেন এবং কীভাবে সেই কথাটাই তো সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

'ভারত ছাড়ো' বা 'কুইট ইন্ডিয়া' কথাটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল হরিপুরা কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের মুখ থেকেই ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে। তখন তিনি বলেছিলেন—"ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো। অবিলম্বে তোমার হাত ওঠাও আমাদের দেশ থেকে।" তারপর ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসের অধিবেশনেও শোনা গিয়েছিল সেই একই কথা—"ইংরেজ বিদেয় হও। মাত্র ছয় মাস সময়। তার মধ্যেই তোমাদের চলে যেতে হবে আমাদের দেশ ছেড়ে। নয়ত শুরু হবে সংগ্রাম।" ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনে এবং ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ের আপস-বিরোধী সম্মেলনেও আবার শোনা গেল সেই একই কথা। আর এ কথা তো কারো অজানা নয় যে ওই ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করার জন্য গান্ধীজির ওপর চাপ সৃষ্টি করায় এবং বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির বিরাগভাজন হয়েছিলেন বলেই তাঁকে (সুভাষচন্দ্রকে) সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। যার শেষ পরিণতি কংগ্রেস দল থেকেই সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার—এমনকি দেশত্যাগেও বাধ্য হওয়া।

কিন্তু ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর গান্ধীজির মধ্যে কেমন যেন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন থেকেই তাঁর দক্ষিণপন্থী অনুগামীদের চাইতে সুভাষচন্দ্রকেই তিনি তাঁর বেশি কাছের মানুষ বলে মনে করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। আর তাঁর ওই সিদ্ধান্তের কথা আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারকেও জানিয়ে দেন।

সুভাষচন্দ্র চার বছর আগে থেকেই বলে আসছিলেন দুটি কথা 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়ো'। চার বছর পরে গান্ধীজি তা গ্রহণ করে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন আরও

দুটি কথা—'Do or Die' বা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞা আর দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল জাতির জনকের আবেগ।

আন্দোলন শুরু হবার আগেই ব্রিটিশ শাসকরা কংগ্রেস দলকে বেআইনি ঘোষণা করে গান্ধীজিসহ কংগ্রেসের সকল প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করলে আন্দোলন বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এমন বেগতিক অবস্থার কথা উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র সুদূর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ রেডিওর মাধ্যমে বিপ্লবীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়ে বিপ্লবের দীপশিখাটি প্রজ্বলিত করে রাখেন। সুতরাং অস্বীকার কবার কোনো উপায় নেই যে সব অর্থেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার। তবে গভীর পরিতাপের বিষয় হল এই যে এই ঐতিহাসিক সত্যটা বর্তমান প্রজন্মের ভারতবাসীদের জানতে দেওয়াই হচ্ছে না। কিন্তু কেন?

তবে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে রহস্যজনক ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তারিখে। কেননা ওই দিনটি থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রধানতম রূপকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন পৃথিবীর বুক থেকে। আজ পর্যন্ত সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ওই রহস্যের বেড়াজাল ভেদ করার কোনো চেষ্টাই হল না। অখণ্ড ভারতবর্ষের জনগণমন অধিনায়কের শেষ পরিণতি কী হল তা জানার কোনো চেষ্টাই হল না। নেতাজির প্রতি এই অকৃতজ্ঞতা এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভারতবাসীদের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার লজ্জা কোনদিনও মুছে ফেলা যাবে না।

তবে এ পর্যন্ত সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট তারিখে। ওই দিন সূর্যোদয়ের কিছু আগে বিদ্রোহী সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

১৯৭৬-এর জুলাই-অগাস্ট মাস। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে বেশ কিছুদিন ঢাকাতে ছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। কিন্তু দেশে ফেরা আর হল না তাঁর। ২৯ অগাস্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেখ মুজিবহীন বাংলাদেশ সরকার কবির মরদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দিল না। শুধুমাত্র এসেছিল ওখানকার কবরের একমুঠো মাটি যা চুরুলিয়ায় কবি পত্নী প্রমীলা ইসলামের কবরের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসেও অগাস্ট মাসের আছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সকলেরই জানা আছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ৪-ঠা অগাস্ট—ইংল্যান্ডের জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। যদিও ২৮ জুন তারিখে সার্বিয়ার রাজধানী সেরাজেভোয় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্দ সস্ত্রীক নিহত হওয়ার পর থেকেই গোটা ইউরোপ একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

দেখাই গেছে যে ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ সন্ধি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। আটদিনের মাথায় (১ সেপ্টেম্বর) জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ওই বারুদে অগ্নিসংযোগ ঘটে যায়। দশদিনের দিন (তেসরা সেপ্টেম্বর) ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আবার ওই সন্ধি-চুক্তিটি ভঙ্গ করে ১৯৪১-এর জুন মাসে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করার পর থেকেই নাৎসি জার্মানি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হারাতে শুরু করে। এরই চরম পরিণতি ঘটে যুদ্ধ শেষে অক্ষশক্তির পরাজয়ে। এই যে অতি-গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি-চুক্তিটি যা একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল এবং পরে ওই যুদ্ধেরই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেটিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৩৯-এর ২৪ অগাস্ট তারিখে।

আরও দেখা গেছে যে ১৯৪৪ সালের ৮ জুন তারিখে মিত্রশক্তিবর্গ ফরাসি মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে একজোট হয়ে ফ্রান্স পুনরুদ্ধারের জন্য যে অভিযান শুরু করেছিল তা সফল হয়েছিল ২৯ অগাস্ট (শুক্রবার) মধ্যরাত্রে নাৎসি জার্মানির শেষ ঘাঁটিটির পতনের পর। পরের দিন—শনিবার (৩০/৮/১৯৪৪) প্যারিস তথা সমগ্র ফ্রান্স আনন্দের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। আলোক সজ্জায় সজ্জিত প্যারিস ও অন্যান্য শহরগুলি যেন রূপকথার রূপ ধরেছিল। বলাবাহুল্য মিত্রশক্তিবর্গের ফ্রান্স পুনরুদ্ধারের এই সফল অভিযানই সুনিশ্চিতভাবে নিশ্চিত করে দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি।

১৯৪৫ সালের অগাস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে দুটি অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারও তারিখ ছিল যথাক্রমে ৬-ই ও ৯-ই অগাস্ট। তাছাড়াও ১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট তারিখেই মিত্রশক্তিবর্গ অনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছিল জাপানের আত্মসমর্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

এই হল অগাস্ট মাস। আপন বৈশিষ্ট্যে অন্য এগারোটি মাসের থেকে একেবারেই আলাদা। পৃথিবীর মানুষকে সে দিয়েছে যত— নিয়েছে বোধহয় তার থেকে অনেক অনেক বেশি। তার এক চোখে আছে সৃষ্টি ও সাফল্যের সুখ ও আনন্দ অন্য চোখে ধ্বংসের আগুন।

পরিশিষ্ট ঘ

# First Proclamation of the Provisional Government of AZAD HIND

(Sonan, 21st October, 1943)

After their first defeat at the hands of the British in 1757 in Bengal, the Indian people fought an uninterrupted series of hard and bitter battles over a stretch of one hundred years. The history of this period teems with examples of unparalleled heroism and self-sacrifice. And, in the pages of that history, the names of Sirajuddoula and Mohanlal of Bengal, Haider Ali, Tipu Sultan and Velu Tampi of South India, Appa Sahib Bhonsle and Peshwa Baji Rao of Maharashtra, the Begums of Oudh, Sardar Shyam Singh Atariwala of Punjab and last, but not least, Rani Laxmibai of Jhansi, Tantia Topi, Maharaj Kunwar Singh of Dumraon and Nana Sahib—among others—the names of all these warriors are for ever engraved in letters of gold.

Unfortunately for us, our forefathers did not at first realise that the British constituted a grave threat to the whole of India and they did not therefore put up a united front against the enemy. Ultimately, when the Indian people were roused to the reality of the situation, they made a concerted move—and under the flag of Bahadur Shah in 1857, they fought their last war as free men. In spite of a series of brilliant victories in the early stages of this war, ill-luck and faulty leadership gradually brought about their final collapse and subjugation. Nevertheless, such heroes as the Rani of Jhansi, Tantia Topi, Kunwar Singh and Nana Sahib live like eternal stars in the nation's memory to inspire us to greater deeds of sacrifice and valour.

Forcibly disarmed by the British after 1857 and subjected to terror and brutality, the Indian people lay prostrate for a while—but with the birth of the Indian National Congress in 1885, there came

a new awakening. From 1885 till the end of the last World War, the Indian people, in their endeavour to recover their lost liberty, tried all possible methods—namely, agitation and propaganda, boycott of British goods, terrorism and sabotage and finally armed revolution. But all these efforts failed for a time. Ultimately, in 1920, when the Indian people, haunted by a sense of failure were groping for a new method, Mahatma Gandhi came forward with the new weapon of non-co-operation and civil disobedience.

For two decades thereafter, the Indian people went through a phase of intense patriotic activity. The message of freedom was carried to every Indian home. Through personal example, people were taught to suffer, to sacrifice and to die in the cause of freedom. From the centre to the remotest villages, the people were knit together into one political organisation. Thus, the Indian people not only recovered their political consciousness, but became a political entity once again. They could now speak with one voice and strive with one will for one common goal. From 1937 to 1939, through the work of the Congress Ministries in eight provinces, they gave proof of their readiness and capacity to administer their own affairs.

Thus, on the eve of the present World War, the stage was set for the final struggle for India's Liberation. During the course of this war, Germany with the help of her allies has dealt shattering blows to our enemy in Europe—while Nippon, with the help of her allies has inflicted a knock-out blow to our enemy in East Asia. Favoured by a most happy combination of circumstances, the Indian people today have a wonderful opportunity for achieving their national emancipation.

For the first time in recent history, Indians abroad have also been politically roused and united in one organisation. They are not only thinking and feeling in tune with their countrymen at home, but are also marching in step with them, along the path to freedom. In East, Asia, in particular, over two million Indians are now organised as one solid phalanx, imspired by the slogan of Total Mobilisation. And in front of them stand the serried ranks of India's Army of Liberation, with the slogan "Onward to Delhi" on their lips.

Having goaded Indians to desperation by its hypocrisy and having driven them to starvation and death by plunder and loot, British rule in India has forfeited the good-will of the Indian people altogether and is now living a precarious existence. It needs but a flame to destroy the last vestige of that unhappy rule. To light that flame is the task of India's Army of Liberation. Assured of the enthusiastic support of the civil population at home and also of a large section of Britain's Indian Army and backed by a gallant and invincible allies abroad—but relying in the first instance on its own strength, India's Army of Liberation is confident of fulfilling its historic role.

Now that the dawn of Freedom is at hand, it is the duty of the Indian people to set up a Provisional Government of their own, and launch the last struggle under the banner of that Government. But with all the Indian leaders in prison, the people at home totally disarmed—it is not possible to set up a Provisional Government within India or to launch an armed struggle under the aegis of that Government. It is, therefore, the duty of the Indian Independence League in East Asia, supported by all patriotic Indians at home and aborad to undertake this task—the task of setting up a Provisional Government of Azad Hind (Free India) and of conducting the last fight for freedom, with the help of the Army of Liberation (that is, the Azad Hind Fauj or the Indian National Army) organised by the League.

Having been constituted as the Provisional Government of Azad Hind by the Indian Independence League in East Asia, we enter upon our duties with a full sense of the responsibility that has devolved on us. We pray that Providence may bless our work and struggle for the emancipation of our Motherland. And we hereby pledge our lives and the lives of our comrades-in-arms to the cause of her freedom, of her welfare, and her exaltation among the naitons of the world.

It will be the task of the Provisional Government to launch and to conduct the struggle that will bring about the expulsion of the British and of their allies from the soil of India. It will then be the task of the Provisional Government to bring about the establishment of a permanent National Government of Azad Hind constituted in accordance with the will of the Indian people and enjoying their confidence. After the British and their allies are overthrown and

until a permanent National Government of Azad Hind is set up on Indian soil, the Provisional Government will administer the affairs of the country in trust for the Indian people.

The Provisional Government is entitled to, and hereby claims, the allegiance of every Indian. It guarantees religious liberty, as well as equal rights and equal opportunities to all its citizens. It declares its firm resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the whole nation equally and transceding all the differences cunningly fostered by an alien Government in the past.

In the name of God, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation and in the name of the dead heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-sacrifice—we call upon the Indian people to rally round our banner and to strike for India's Freedom. We call upon them to launch the final struggle against the British and all their allies in India and to prosecute that struggle with valour and perseverance and with full faith in Final Victory—until the enemy is expelled from Indian soil and the Indian people are once again a Free Nation.

Signed on behalf of the Provisional Government of Azad Hind—

Subhas Chandra Bose, Head of the State, Prime Minister and Minister for War, Minister for Foreign Affaris, Supreme Commander of the Indian National Army.

Capt. Miss Lakshmi (Women's Organisation), S. A. Ayer (Publicity and Propaganda), Lt.-Col. A. C. Chatterjee (Finance), Lt.-Col. Aziz Ahmed, Lt.-Col. N. S. Bhagat, Col. J. K. Bhonsle, Lt.-Col. Gulzara Singh. Lt.-Col. M. Z. Kiani, Lt.-Col. A. D. Loganathan, Lt.-Col Ehsan Qadir, Lt.-Col. Shah Nawaz (Representatives of the Armed Forces); A. M. Sahay, Secretary (with Ministerial Rank); Rash Behari Bose (Supreme Adviser); Karim Gani, Debnath Das, D. M. Khan, A. Yellappa, J. Thivy, Sardar Ishar Sing (Advisers); A. N. Sarkar (Legal Adviser).

*By Courtesy* : **Sri Biswanath Nandy, a well-known social worker and freedom fighter.**

# তথ্যসূত্র


| | |
|---|---|
| অনন্ত সিংহ | *চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ।* |
| ——————, | *অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়।* |
| অন্নপূর্ণা দেবী | *স্বামী বিবেকানন্দ।* |
| ——————, | *ভগিনী নিবেদিতা।* |
| অরিন্দম ঘোষাল | *শতবর্ষে যতীন দাশ* |
| আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত | *চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী।* |
| উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | *নির্বাসিতের আত্মকথা।* |
| কমলা দাশগুপ্তা | *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী।* |
| ——————, | *প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার* (অগ্নিযুগ সংখ্যা-উল্টোরথ) |
| ——————, | *বুড়ী বালামের তীরে।* |
| কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় | *স্বামী বিবেকানন্দ।* |
| চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য | *কবি স্মরণে।* |
| জওহরলাল নেহরু (সম্পাদিত) | *পত্রগুচ্ছ।* |
| ড যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় | *বিপ্লবী জীবনেব স্মৃতিকথা।* |
| নলিনীকিশোর গুহ | *বাংলার বিপ্লববাদ।* |
| নগেন্দ্রকুমার গুহ রায | *শহীদ যুগল।* |
| নগেন্দ্রনাথ সিং | *ভারত ছাড়ো।* |
| নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী | *নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ।* |
| নেপালচন্দ্র মজুমদার | *রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র।* |
| প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | *রবীন্দ্র জীবনী* (চার খণ্ড)। |
| বিজনবিহারী বসু | *কর্মবীর রাসবিহারী।* |
| বিশ্বভারতীর সৌজন্যে | *রবীন্দ্র রচনাবলী।* |
| বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য | *শহীদের রক্তে রাঙা।* |
| ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় | *ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব।* |
| ——————, | *সবার অলক্ষ্যে।* |
| ——————, | *বিপ্লব তীর্থে।* |

মণি বাগচী — *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।*
———, *রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।*
মোহিতলাল মজুমদার — *জয়তু নেতাজী।*
শঙ্করীপ্রসাদ বসু — *রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র।*
শান্তিকুমার মিত্র — *বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী।*
শিশির কুমার বসু — *মহানিষ্ক্রমণ।*
———, *বসুবাড়ি।*
শৈলেশ দে — *আমি সুভাষ বলছি* (তিন খণ্ড)।
শ্রীমতী অপর্ণা রায় — *আমার বাবা চিত্তরঞ্জন।*
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় — *সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী।*
সুপ্রকাশ রায় — *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।*
সুভাষচন্দ্র বসু — *মুক্তি সংগ্রাম।*
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — *ভারতের বিপ্লব কাহিনী।*

**স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী**

আজাহারউদ্দিন খান — *বাংলা সাহিত্যে নজরুল।*
কল্পতরু সেনগুপ্ত — *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম।*
বিশ্বনাথ নন্দী — *নেপথ্য নায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী* (সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সুভ্যেনির)।
———, *শহীদ সন্তোষ কুমার মিত্র* (সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সুভ্যেনির)।
যোগেশচন্দ্র বাগল — *ভারতের মুক্তি সন্ধানী।*
শহীদ যতীন দাশ বঙ্গবাসী কলেজের নথীপত্র এবং কিরণ দাশের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার।
সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — *বিপ্লবী মহানায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।*
Abul Kalam Azad — *India Wins Freedom.*
Bipan Chandra — *Modern India.*
B. C. Datta — *Mutiny of the Innocents.*
Dadabhai Naoroji — *Poverty & Un-British rule in India.*
Dr. R. C. Majumdar — *History of Freedom Movement in India* (Vol. 1-3)
Jawharlal Nehru — *An Autobiography.*

| | |
|---|---|
| Judith Brown | *Gandhi's rise to power.* |
| Leonard A. Gordon | *Brothers against the Raj.* |
| Leonard Mosley | *Last days of the British Raj.* |
| Michael Edwards | *Last Years of British Rule in India.* |
| N. B. Khare | *My Political Memories.* |
| P. C. Neogy | *Life & Times of C. R. Das.* |
| Rajani Palme Datta | *India Today.* |
| Ram Gopal Sannyal | *A general biography of Bengal Celebrities.* |
| Subhas Chandra Bose | *An Indian Pilgrim.* |
| Sumit Sarkar | *Modern India.* |
| ————, | *Swadeshi Movement in Bengal.* |
| Surendranath Banerjee | *A Nation in making (Autobiography).* |
| S. R. Mehrotra | *Towards Indian Freedom & Partition.* |
| Valentine Chirol | *Father of Indian Unrest.* |

ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী, স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর পত্রিকা, বর্তমান পত্রিকা (দৈনিক ও সাপ্তাহিক), দেশ, বসুমতী (দৈনিক ও মাসিক), সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পূজা সুভেনির এবং পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (রাইটার্স প্রকাশিত) ইত্যাদি।